হু কিল্‌ড মুজিব

Who Killed Mujib?

এ.এল.খতিব

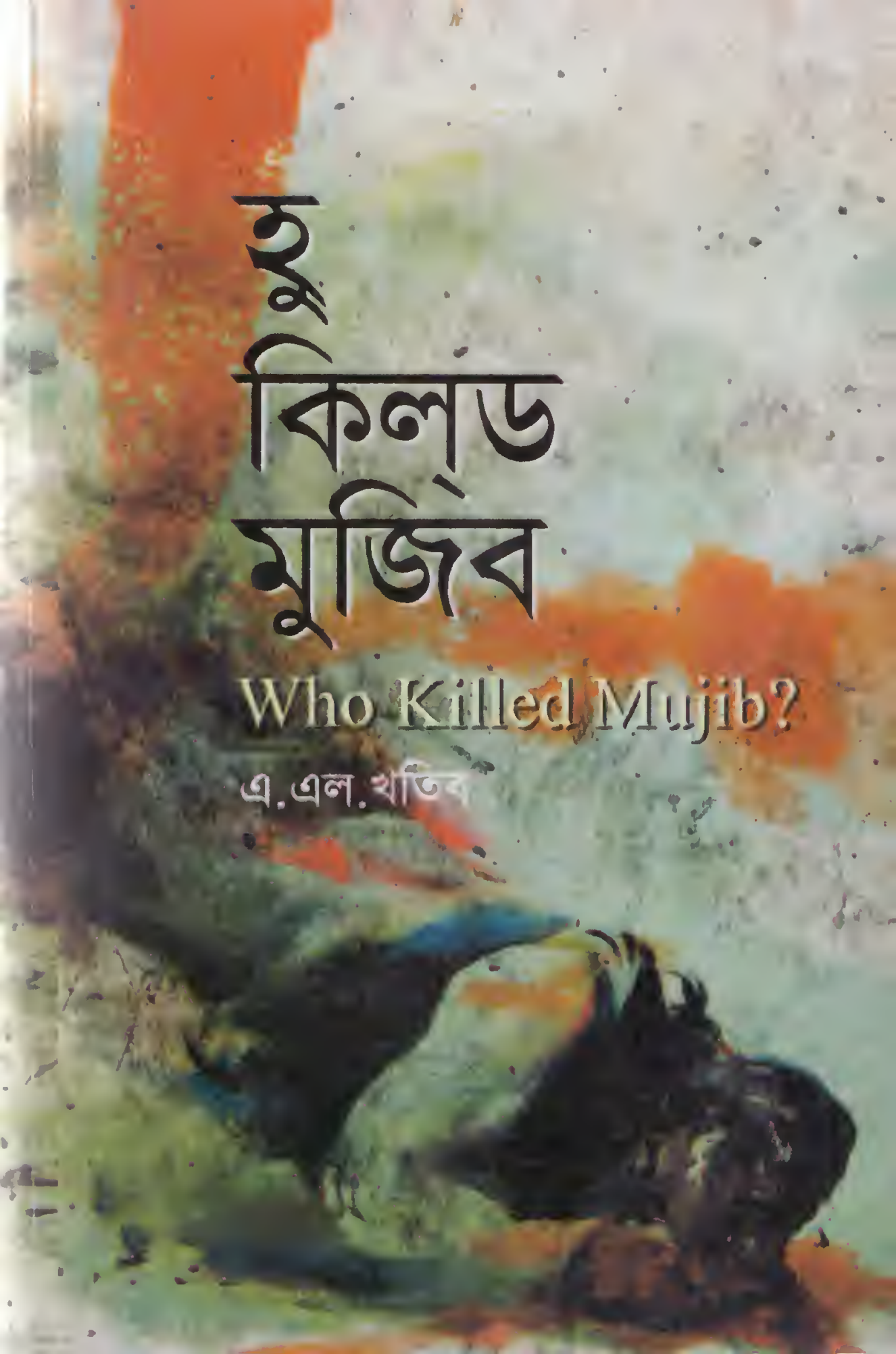

মুক্তিযুদ্ধ ই আর্কাইভ
liberationwarbangladesh.org

উৎসর্গ

হাসিনা ও রেহানা

মুক্তিযুদ্ধ ই-আর্কাইভ ট্রাস্ট
Liberation War eArchive Trust
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস হোক উন্মুক্ত

হু কিল্‌ড মুজিব

লেখক ■ এ.এল. খতিব

অনুবাদ ■ আবিষ্কার অনুবাদ সেল

সম্পাদনা ■ ফরিদ আহমদ দুলাল

প্রচ্ছদ ■ সারা তৌফিকা
প্রখ্যাত শিল্পী শাহাবুদ্দিনের আঁকা ছবি অবলম্বনে

প্রকাশক ■ এসডি আসান
আবিষ্কার
২৫৩-২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

প্রকাশকাল ■ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

© ■ আবিষ্কার

বর্ণবিন্যাস ও অলংকরণ ■ মেঘদূত
২৫৩-২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মুদ্রণ ■ মমিন অফসেট প্রেস
৯ নীলক্ষেত বাবুপুরা, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মূল্য ■ চারশত টাকা

ISBN 978 984 8962 15 2

Who Killed Mujib
by
A.L. Khatib
Edited by FARID AHMED DULAL
Published by ABISHKAR
Concord Emporium Shopping Complex
Kantabon, Dhaka-1205
Phone: +88-02-9674099
E-mail: abishkarpublication@yahoo.com
Price : Tk. 400 Or $ 10.00 only
Printed in Bangladesh

এ এল খতিব

ঢাকা থেকে হঠাৎ একটা চিঠি এল—ইংরেজিতে আধুনিক বাংলা কবিতার একটি সংকলন বার হবে। চিঠির নিচে লেখা এএল খতিব। চিঠি চালাচালি চলতে লাগল বেশ কিছুদিন। এক সময়ে সংকলন গৌণ হয়ে তার জায়গা নিল সৌহার্দ্য। অবশ্য চাক্ষুষ আলাপ তারও পরে। কলকাতায় আমার বাল্যবন্ধু কালীসাধন দাশগুপ্তের বাড়িতে। অনেকদিন পর একবার সেই সংকলনের কথা ওঠায় খতিব দুঃখ করে বলেছিল প্রকাশক না পাওয়ায় ওর গোটা পরিশ্রমটাই মাঠে মারা গেছে।

খতিবের দেশ কোথায়, বাড়িতে কে আছে না আছে, এমন কি বিয়ে করেছে কিনা, হিন্দু না মুসলমান, খৃষ্টান না বৌদ্ধ—এসব জিগ্যেস করার কথাও কোনোদিন মনে হয় নি। আশৈশব কলম্বোয়—শুধু এইটুকুই জানতাম। ও যে মারাঠী, সমুদ্রে কাজের সূত্রে ওর বাবা থাকতেন শ্রীলঙ্কায়—এসব পরে জেনেছি। সেই কবে করাচী থেকে ঢাকায় এসেছিল। তারপর আর পাকিস্তানে ফিরে যায় নি। বাংলা না বললেও একটানা বিশ বছর ধরে বাঙালীর সঙ্গেই ছিল তার সমানে ওঠাবসা।

দীর্ঘদিনের অদর্শনের পর খতিবের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল স্বাধীন বাংলাদেশে। একটা হাফ হাতা বুশ শার্ট, পাৎলুন আর চপ্পল—এই ছিল তার বরাবরের পোশাক। রাত পোহাতেই প্রেস ক্লাবে হানা দিয়ে খতিবকে আমি খুঁজে বার করলাম। ততদিনে খতিব হয়ে গেছে মনে প্রাণে বাঙালী। বাংলা বোঝে কিন্তু ইংরেজি বলে। আমাকে নিয়ে গিয়ে প্রেস ক্লাবের দোতলায় তার সাবেক ঘরটা দেখাল। দেয়ালে প্রকাণ্ড একটা গর্ত। পাক সৈন্যরা ঐ ঘর লক্ষ্য করে গোলা দেগেছিল। ওর দুঃখ, তাতে ওর প্রচুর দামী দামী বই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

এরপর 'বাংলাদেশ অবজার্ভার এর নিজস্ব সংবাদদাতা হয়ে খতিব চলে আসে দিল্লীতে। সাহিত্য আকাদেমির সভায় প্রায়ই তখন আমাকে দিল্লী যেতে হত। দিল্লীতে খতিব যখন যেখানেই থাকুক আমি ঠিক খুঁজে বার করতাম। ঐ কয়েকটা বছরে আমাদের পুরনো বন্ধুত্ব আমরা নতুন করে ঝালিয়ে নিয়েছিলাম। তখন দেখেছি, দিল্লীতে থাকলেও ওর মন পড়ে থাকত ঢাকায়।

আবার একটা ভালো সময় আসবে বাংলাদেশের। খতিব তারই জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাহলেই সে আবার ঢাকায় ফিরে যেতে পারবে। মুজিব যেদিন খুন হল সেদিন আমি দিল্লীতে। খতিবের চোখ থেকে আমি সেই প্রথম আগুন ঠিকরোতে দেখি।

সম্পত্তি বলতে খতিবের ছিল শুধু বই। পাকিস্তানী গোলায় একটা বড় অংশ পুড়ে গেলেও, ঢাকা থেকে চলে যাওয়ার সময় নিজেকে ফতুর করে বিমানভাড়া দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ছ'টা স্টিলের ট্রাঙ্ক ভর্তি বই।

জাহাজের ক্যাপ্টেন হয়ে দরিয়ায় ভেসে বেড়ানো ছিল খতিবের ছেলেবেলার স্বপ্ন। অদৃষ্টের ফেরে হল স্থলবন্দী কলম-ঠেলা সাংবাদিক, কিন্তু সারাটা জীবন সে ছিল লেখক হওয়ার অপেক্ষায়। যখন ওর প্রথম বই ছাপা হয় তখন ওর ষোল বছর বয়স। কবিতার বই। নাম 'হুইসপারিং স্টারস্।' সাঁইত্রিশ বছর পর সেই বই আবার সে নতুন করে ছাপিয়েছিল বোধহয় এটাই জানাতে যে, সাহিত্যই তার জীবনের পাটরাণী। শীঘ্র প্রকাশিতব্যের তালিকায় ছিল তার আরও তিনটি ইংরিজি বই। 'যেখানে শাপলা হাসে' (প্রবন্ধ সংকলন), 'ধুলোর আলপনা' আর 'কালবৈশাখী' (উপন্যাস)। সঞ্জীব দত্তের কাছে খতিবের অপ্রকাশিত আরও পাণ্ডুলিপির খবর মিলবে।

হঠাৎ হৈ হৈ করে বেরিয়ে গেল 'হু কিল্ড মুজিব'। তিন মাস বেস্টসেলারের কোঠায় থাকতে থাকতে অতর্কিতে সে বই বেপাত্তা হয়ে গেল। পাকিস্তানে বেরিয়ে গেল তার অননুমোদিত উর্দু সংস্করণ। কপাল পুড়ল খতিবের। ন্যায্য পয়সার কিছুই সে পেল না। বাংলা তর্জমার অনুমতিই মিলল না। এর পরের বই তৈরি হচ্ছিল—হু কিল্ড জিয়া'। তারও শেষরক্ষা হল না।

সাংবাদিক, কবি এএল খতিব এর জন্ম ভারতের মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলায়। কেউ বলেন কলম্বো। কেউবা বলেন মারাঠী। তিনি তার সাংবাদিকতার জীবনও শুরু করেন কলম্বোতেই ১৯৪০-এ। 'শিলং ডেইলি নিউজ' পত্রিকায় কিছু কাজ করার জন্য তিনি যুক্ত হন টাইম অব শিলং'-এর সাথে। ১৯৫৫তে তিনি পাকিস্তানের করাচীতে 'ডেইলি অবজারভার' পত্রিকার উপসম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন। করাচী থেকে তিনি বদলি হয়ে চলে আসেন বাংলাদেশে (তৎকালীন পূর্বপাকিস্তানে)। পরবর্তী সময়ে এএল খতীব 'দি ডেইলি মর্নিং নিউজ' পত্রিকায় কাজ করেন এবং ১৯৮০তে একই পত্রিকা থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯৮০-তে অবসর গ্রহণের পর বাংলাদেশ অবজারভার পত্রিকার প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে।

তার সাংবাদিকতা জীবনে অভিজ্ঞতার আলোতেই এএল খতীব রচনা করেন 'হু কিল্ড মুজিব' গ্রন্থটি। এএল খতীব-এর শেষ জীবন কাটে অর্থকষ্টে। অকৃতদার সাংবাদিক এএল খতীব ১৯৮৪তে দিল্লীতে মৃত্যুবরণ করেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

বাঙালি জাতির অবিসম্বাদিত নেতা, যিনি গোটা জাতিকে দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমে চেতনার সেই শীর্ষবিন্দুতে নিয়ে যান, যে শীর্ষবিন্দুতে দাঁড়িয়ে বাঙালি জাতি স্বাধীনতা-ভিন্ন বিকল্প কিছুর চিন্তাও করেনি; যে চেতনা নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র যুদ্ধে প্রাণিত করেছিলো এবং নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে ত্রিশলক্ষ প্রাণ, দুইলক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম ও গোটা জাতির সীমাহীন দুর্ভোগের মূল্যে কেনা বিজয়ের গৌরবে ভাস্বর করে তুলেছিলো; তারই মহানায়ক জাতিরজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান বিজয়ের মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী উচ্চাভিলাসী সেনাকর্মকর্তার হাতে সপরিবারে শহীদ হন। আপাতদৃষ্টিতে ১৯৭৫-এর ১৫ই আগস্টের দুর্ঘটনাটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা হলেও এর সাথে নানান আন্তর্জাতিক চক্রান্ত-ষড়যন্ত্র ক্রিয়াশীল ছিলো বলেই জানা যায়। বাঙালি জাতি যে চেতনায় ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলো, ১৫ই আগস্টের সেই পৈশাচিক ঘটনার পর জাতি যেন হঠাৎ কক্ষচ্যুত হয়ে পড়লো, হঠাৎ যেন বিপরীত স্রোতে এগিয়ে যেতে চাইলো; চললো স্বার্থোদ্ধার আর ক্ষমতালিপ্সার নানা ষড়যন্ত্র, চললো ইতিহাস বিকৃতির অপসংস্কৃতির কৌশল; কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা ভুলে গিয়েছিলো, ইতিহাস তার নিজের নিয়মেই চলে এবং যা ইতিহাসের অনুষঙ্গ তা কোথাও না কোথাও অবিকৃত অবস্থায়ই থেকে যায়। অনুসন্ধানী মানুষ তাকে ঠিক খুঁজে পায়।

১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে এর পূর্বাংশের মানুষের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রেক্ষাপটে এ অংশের মানুষের আন্দোলন-সংগ্রাম, বিশেষত আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্ব, ৬ দফা দাবী উপস্থাপন, ১১ দফার সাথে সংহতি, আইয়ুব খান-এর সামরিক শাসন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ৬৯-এর গণ আন্দোলন, ৭০-এর নির্বাচন, আওয়ামী লীগ-এর নিরঙ্কুশ বিজয়, ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়া খানের গড়িমসি, ৭ই মার্চে রেসকোর্সের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ২৫ শে মার্চের কালো রাতে পাকিস্তানী বর্বর বাহিনীর পৈশাচিক হামলা, বিপ্লবী সরকার গঠন, পাকিস্তানে কারাগারের অন্ধকার সেল-এ বঙ্গবন্ধুর অপেক্ষা, বিজয়ীর বেশে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন, রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ, ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে ষড়যন্ত্র, ১৫ই আগস্টের নির্মমতা, ১৫ই আগস্ট পরবর্তী খন্দকার মোস্তাকের সরকার, স্বঘোষিত খুনিদের প্রতি নানান কৌশলে সহানুভূতি প্রদর্শন, ৩রা নভেম্বর জেলখানার নিরাপদ প্রহরায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা, খালেদ মোশাররফের বিদ্রোহ, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানার বিদেশে অবস্থান এবং প্রাণে বেঁচে যাওয়া, কর্নেল তাহেরের বিচারের প্রহসন, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মহলের বিভিন্ন পক্ষ অবলম্বন, ভারত-বাংলাদেশ-রাশিয়া-চীন সম্পর্কের টানাপোড়েন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ-এর রাজনৈতিক অঙ্গনে টিকে থাকার সংগ্রাম, ১৯৮১-তে শেখ হাসিনার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন এবং আওয়ামী

লীগ-এর দায়িত্ব গ্রহণ ইত্যাদি নানান প্রসঙ্গ বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত এবং ঐতিহাসিক ঘটনার আলোকে তুলে ধরেছেন কলম্বোর সাংবাদিক, এ.এল খতীব তাঁর 'হু কিল্ড মুজিব' শিরোনামের বিশ্লেষণধর্মী গ্রন্থে । এ.এল খতীব রচিত গ্রন্থটি নয়া দিল্লীর ভিক এস পাবলিকেশন হাউস থেকে ১৯৮১-তে প্রকাশিত হয়।

নয়াদিল্লী থেকে প্রকাশিত এ.এল খতীবকৃত ইংরেজি বইটিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতির সংগ্রামের ইতিহাস যেমন বর্ণিত হয়েছে, তেমনি ইতিহাসের সড়ক-মহাসড়কের পাশাপাশি অলিগলির সন্ধানও রয়েছে, রয়েছে ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত গ্রন্থটি সাধারণ বাঙালি পাঠকের সামনে তুলে ধরতেই আবিষ্কার প্রকাশন এর অনুবাদ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। অনুবাদ কর্মে 'আবিষ্কার অনুবাদ সেল' যেমন যথার্থই আন্তরিক এবং সৎ থাকতে সচেষ্ট থেকেছে, সম্পাদনা কর্মে বঙ্গানুবাদকৃত পাণ্ডুলিপিটির মূল বক্তব্য ঠিক রেখে ভাষা বিন্যাস এবং বানানরীতিতে অভিন্নতা রাখতে আমি তেমনি সচেষ্ট থেকেছি মাত্র। সে প্রেক্ষিতে অনুবাদকর্মের ভূমিকা থাকলেও সম্পাদনাকর্মের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই, তারপরও বাংলাদেশের ইতিহাস, বঙ্গবন্ধুর অবদান ও সংগ্রাম, বাঙালি জাতির প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং আত্মোৎসর্গের লিখিত এই দলিলের সাথে নিজের নামের সম্পৃক্তিও কম গুরুত্বের নয়, সেই প্রতীতিতে আত্মপ্রসাদ লাভ করছি।

এ.এল খতীবকৃত 'হু কিল্ড মুজিব' গ্রন্থের অনুবাদ যখন প্রকাশিত হচ্ছে ততদিনে মুজিব হত্যা মামলার বিচারকার্য সম্পন্ন হয়েছে, কারা এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষে যুক্ত ছিলেন তা-ও আজ প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত। যদিও দণ্ডপ্রাপ্ত বেশ ক'জন পলাতক থাকার কারণে তাদের দণ্ড কার্যকর করা যায় নি; কেউ কেউ বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করায় রেহাই পেয়েছেন; তারপরও প্রকাশিত দীর্ঘ রায় থেকে জানা যায় এ.এল খতীব তার গ্রন্থে সরাসরি না হলেও যাদের কথা ইঙ্গিত করেছিলেন তারাই বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন।

গ্রন্থ প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সম্পৃক্ত থেকে সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক ও প্রাবন্ধিক ওবেইদ জাগীরদার আমাদের এ উদ্যোগের শুভ সূচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন; তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা। বাংলাদেশের পাঠকের কাছে বইটি সমাদর পেলে মূল্যবান এ তথ্যবহুল গ্রন্থ প্রকাশনার সাথে নিজেদের অকিঞ্চিত শ্রমকে মহার্ঘ বিবেচনা করবো। আগামী দিনের সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নপূরণের অঙ্গিকার; সেই প্রত্যাশায়–

বিনীত

ফরিদ আহমদ দুলাল

সূচিপত্র

ক্রান্তিকাল ১১
মোস্তাকের প্রস্তাব ২৮
পাকিস্তানি সুর ৪৫
একটি পারিবারিক বিষয় ৬০
এমন লোকেরা বিপদজনক ৭৯
জয় বাংলা! ৯৪
ক্ষমতা ও ভণ্ডামী ১১৪
বিজয়ীর প্রত্যাবর্তন ১২৪
প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড ১৩৮
আমার ভালোবাসা নিও ১৪৯
একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ১৬২
রাজনীতির কবি ১৬৯
একটি বিশেষ সম্পর্ক ১৭৯
রাজনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগীরা ১৮৯
মাওবাদী মাওলানা ১৯৮
একটি নতুন বিশ্ব ২০৮
অন্তর্জাতিক ছায়া ২১৫
দ্বিতীয় বিপ্লব ২৩৬
বিভৎস ২৪৫
পরিশিষ্ট ২৪৮

ক্রান্তিকাল

আগস্ট ১৯৭৫ ছিল বাংলাদেশের জন্য ক্রান্তিকাল। শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল করছিলেন এবং এমন সব পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন যা সমাজে গুরুতর প্রভাব রাখছিল। দেশে তখন একটি মাত্র রাজনৈতিক দল ছিল- বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)। বাকশালে সেনাবাহিনী, পুলিশসহ দেশের সর্বস্তরের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং বাকশাল দেশের প্রশাসনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হতে যাচ্ছিল। ১৯৭৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ থেকে দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নরবৃন্দ নিজ নিজ জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করলে আমলাদের গুরুত্ব কমে আসবে। সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করে দেশের জেলা পর্যায়ে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত করার পরিকল্পনা ছিল। এটি ছিল একটি বিপ্লবী পদক্ষেপ।

১৪ আগস্ট ১৯৭৫ এর সন্ধ্যাটি অন্যান্য দিনের চেয়ে আলাদা মনে হয়নি।

পরদিন শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনা দেয়ার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তুতি চলছিল।

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করার দাবিতে একটি কালো পতাকা মিছিলে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পরের বছর শেখ মুজিবকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নস্তরের কর্মচারিদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দেয়ার অপরাধে। যখন তিনি মুক্ত হন তখন তিনি জানতে পারেন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

পরদিন সেই বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি উপস্থিত হবেন চ্যান্সেলর হিসেবে।

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি গ্রেনেড ফোটার প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবকে আগমনের সময় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫/২৬ মার্চে রাতে বাঙালিদের উপর পাক বাহিনীর আক্রমণের পর থেকেই গ্রেনেড হামলা আর বোমা বিস্ফোরণ ঢাকাবাসীর জন্য নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এ কারণে কারোই ঘুমের ব্যাঘাত ঘটত না। তবুও অনেক ধরণের গুজব শোনা যাচ্ছিল...।

রাত সাড়ে আটটার দিকে শেখ মুজিবকে গণভবন থেকে তার নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন।

শেখ মুজিবের দশ বছর বয়সী পুত্র রাসেল খুবই উত্তেজিত ছিল। ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুলের প্রিন্সিপাল পরদিন সকালে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানানোর জন্য যে ছয়জন স্কুল ছাত্রকে বাছাই করেছেন তার মধ্যে রাসেল একজন।

কাদের সিদ্দিকী, যাকে মুক্তিযুদ্ধে অসম সাহসিকতার জন্য বাঘা সিদ্দিকী নামে ডাকা হতো, তিনি ছিলেন বিভিন্ন জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত গভর্নরদের মধ্যে একজন। ১৪ আগস্ট সন্ধ্যায় তিনি যখন তার অসুস্থ মাকে দেখতে পি জি হসপিটালে যান

তখন কারওয়ান বাজার এলাকায় একটি ট্যাঙ্ক দেখতে পান। রেডিও স্টেশনের প্রায় বিপরীত দিকে হসপিটালের কাছে আরও একটি ট্যাঙ্ক ছিল। মাকে দেখার পর কাদের সিদ্দিকী গাড়ি চালিয়ে মতিঝিলে যান। সেখানেও একটি ট্যাঙ্ক দেখতে পান: এক কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে তিন তিনটি ট্যাঙ্ক। তিনি ফিরে যেতে শুরু করেন, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের কাছে আরও একটি ট্যাঙ্ক অবস্থান করছিল, যা হাসপাতাল থেকে বড় জোড় ২০০ মিটার দূরে। তখন রাত ১১ টা বেজে একটু বেশি। কাদের সিদ্দিকী গাড়ী নিয়ে শের-এ-বাংলা নগরে গণভবনের কাছে রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে যান। রক্ষীবাহিনীর উপ-পরিচালক আনোয়ারুল আলম শহীদ তাকে জানান বেঙ্গল ল্যান্সারকে তিনটি ট্যাঙ্ক বের করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে ঢাকার রাস্তায় চারটি ট্যাঙ্ক কেন দেখা যাচ্ছে। জবাবে শহীদ জানান, "আপনি হয়ত একটি ট্যাঙ্ক দুবার দেখেছেন।" হতে পারে। শহীদ একজন সাবেক ছাত্রনেতা এবং তিনি মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। তার কথায় সন্দেহ করার কোন অবকাশ ছিল না।

প্রতি বৃহস্পতিবার রাতেই রুটিন করে ট্যাঙ্ক মহড়া অনুষ্ঠিত হতো এবং মাসে দুবার বেঙ্গল ল্যান্সার ও সেকেন্ড আর্টিলারি যৌথ মহড়া করত।

কাদের সিদ্দিকীর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে যায়। তিনি তার বোনকে সকালে তাকে ঘুম থেকে ডাকতে নিষেধ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই গভর্নরদের ট্রেনিংয়ের জন্য তিনি খুব ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পরদিন এক মধ্যাহ্ন ভোজের মধ্য দিয়ে এই ট্রেনিং প্রোগ্রাম সমাপ্ত হবার কথা, যে অনুষ্ঠানে সব মন্ত্রীদের উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

কাজেই পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠার কোন প্রয়োজন ছিল না।

রাষ্ট্রপতির নিরাপত্তাপ্রধান ব্রিগেডিয়ার জামিল সেদিন একটি বিশ্রামহীন রাত কাটান। তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন আর এর মধ্যেই পরদিন সকালে তাকে রাষ্ট্রপতিকে প্রহরা দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যেতে হবে। এটি তার জন্য নতুন কোন দায়িত্ব ছিল না, তবুও তিনি বেশ অস্বস্তিতে ছিলেন। তাকে মাঠ পর্যায়ের গোয়েন্দা ইউনিটের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কোন কারণে তখন পর্যন্ত তার কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়নি। জামিলের স্ত্রী তাকে ঘুমাতে বলেন। জবাবে জামিল বলেন 'আমি ঘুমাতে পারছি না।'

খন্দকার মোস্তাক আহমেদও সেদিন নির্ঘুম রাত কাটান। পুরোনো ঢাকার ৫৪ আগামসি লেনে তার বাসায় সেদিন অনেক দর্শনার্থী এসেছিলেন। আগত দর্শনার্থীদের একজন ছিলেন তার ভাতিজা মেজর রশিদ।

সে রাতে তাহের উদ্দীন ঠাকুরও প্রচণ্ড উত্তেজিত ছিলেন। যে কোন ফোন কল আসা মাত্রই তিনি আঁতকে উঠছিলেন। নামায পরে তিনি নিজের স্নায়ু ঠাণ্ডা রাখার

চেষ্টা করছিলেন। রাতে গোসল করে তিনি প্রস্তুত হয়েছিলেন, যেন ঐ অসময়েই তার কোন একটি বৈঠকে যাওয়ার কথা রয়েছে। বাড়িতে আসা একজন অতিথি তার এহেন উত্তেজিত অবস্থা দেখে বেশ অবাক হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ মুজিবকে স্বাগত জানানোর সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছিল, সেখান থেকে শেখ মুজিবের পুত্র কামালের ফিরে আসতে মধ্যরাত পার হয়ে যায়।

একই সময়ে ঢাকা সেনানিবাসেও একটি ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সর্বশেষ প্রস্তুতি চলছিল।

রাতের অন্ধকার থাকতেই কর্নেল ফারুক বেঙ্গল ল্যান্সারের জওয়ানদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন, এসব জওয়ানদের খুনিদের ছোট দল হিসেবে শিকারে যাবার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তিনি নিজে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত কালো পোষাকে ঢাকা বেঙ্গল ল্যান্সারের জওয়ানদের দেখতে লাগছিল মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট এর শয়তানের দঙ্গলের মত।

ফারুক জওয়ানদের মধ্যে আগুন আর বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। তিনি জওয়ানদের বলেন শেখ মুজিব বিদেশী শক্তির কাছে দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন এবং সেনা বাহিনী ও ল্যান্সার ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করছেন। তিনি জওয়ানদের ভীতিকে কাজে লাগান এবং তাদের ইসলামের দোহাই দিয়ে উদ্বুদ্ধ করেন।

তখন চূড়ান্ত-আঘাত হানার সময় এসে গিয়েছিল।

তারা তিনটি সারিতে বিভক্ত হয়ে পথে নামে। তাদের ল্যবস্থ দুই কিলোমিটারেরও কম দূরত্বে ছিল।

ভোর হওয়ার ঠিক আগে আগে রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা তাড়াহুড়া করে শের-এ-বাংলা নগরে এমএনএ হোস্টেলের বাইরে অবস্থান নেয়। তাদের অধিকাংশের পরনে ছিল লুঙ্গি আর পা ছিল খালি। আশে পাশের এলাকায় বসবাসকারিরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের সরিয়ে দেয়া হয়। এয়ারপোর্টের রানওয়ে ধরে খুব দ্রুত একটি ট্যাঙ্ক এগিয়ে আসে, একটি দেয়াল ভেঙ্গে দেয় এবং ট্যাঙ্কের কামানটি ক্যাম্পের দিকে তাক করা থাকে।

সর্বমোট ত্রিশটি ট্যাঙ্ক সেদিন ঢাকার বিভিন্ন কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মোতায়েন করা হয়েছিল।

শেখ মুজিব, তার ভগ্নিপতি আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং তার ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণির বাস ভবন সে রাতে একই সঙ্গে ঘিরে ফেলা হয়।

সেনা সদস্যরা শেখ মুজিবের বাড়ির চারদিক থেকে গুলি ছুড়তে শুরু করে। নিচ তলায় জানালার কাচ ভেঙ্গে গুলি ঢুকছিল ঘরের মধ্যে, সব কটি শোবার ঘর ছিল নিচতলাতেই। একটি বুলেট মুজিবের ছোট ভাই শেখ নাসেরের হাতে আঘাত করে।

বাড়ির সবাই শেখ মুজিবের ড্রেসিং রুমে আশ্রয় নিয়েছিলেন, কারণ ঐ কটিই তখন তুলনামূলক নিরাপদ ছিল। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাকসেনাদের এ বাড়ি ঘেরাও করার ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটছিল।

মুজিব কয়েকজন কর্মকর্তাকে ফোন করেন।

বেগম মুজিব তার একটি শাড়ি ছিঁড়ে তাই দিয়ে নাসেরের হাতে ব্যান্ডেজ করে দেন।

কামাল নিচে নেমে আসেন এবং বাড়ির নিরাপত্তা রক্ষীদের প্রতিরোধ করার নির্দেশ দেন, কিন্তু তাদের আগেই নিরস্ত্র করা হয়েছিল। যখন কামাল নিরাপত্তা রীদের প্রতিরোধ করতে বাধ্য করার চেষ্টা করছিলেন সে সময় মেজর হুদা বাড়িতে প্রবেশ করেন। নিরাপত্তা রক্ষীরা তাকে স্যালুট করে।

মেজর হুদার সাথে থাকা লোকদের একজন কামালকে গুলি করে।

ইতিমধ্যে ব্রিগেডিয়ার জামিল দ্রুত শেখ মুজিবের বাসভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন । তাকে বহনকারি জিপটি যখন মুজিবের বাড়ি থেকে মাত্র কয়েকশো মিটার দূরে ছিলো তখন সোবহানবাগ মসজিদের কাছে কয়েকজন জওয়ান চিৎকার করে তাদের থামতে বলে 'হল্ট'। জামিল তার পরিচয় দেন। জওয়ানরা আগে থেকেই তাকে চিনতে পেরেছিল। জামিলকে থামানোর জন্যই তাদের সেখানে রাখা হয়েছিল। তারা হুমকির সুরে জামিলকে জানায় 'এ পথে যে যাবার চেষ্টা করবে তাকে গুলি করার নির্দেশ আছে আমাদের উপর।' তাদের হুমকি উপেক্ষা করে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে জওয়ানরা তাকে গুলি করে।

ততক্ষণে সেনা সদস্যরা মুজিবের বাড়িতে তছনছ শুরু করে দিয়েছে। তারা আবিষ্কার করে একটি কক্ষ চারদিক থেকে বন্ধ- এটি ছিল শেখ রেহানার শোবার ঘর। সেনারা দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে, ফলে একটি আলমারি ভর্তি জিনিস ঘরের মেঝেতে ঝনঝনিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ রাতে যেমন করেছিলেন সেভাবেই মুজিব ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন আর বলেন "ওরা কি চায় আমাকে দেখতে দাও।" সে রাতে তিনি পাকিস্তানি সেনাদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। আজ সামনে তার নিজের দেশের সেনারা।

মুজিব একটি চেক লুঙ্গি আর সাদা ফতুয়া পরে ছিলেন।

সিঁড়িতে মুজিবের সঙ্গে হুদার দেখা হয়। তিনি বলেন 'তাহলে তুমিই এসব করছ। কি চাও তুমি?' 'আমরা আপনাকে নিতে এসেছি', জবাব আসে। মুজিব বাজ খাঁই কণ্ঠে বলেন 'তুমি কি আমার সাথে কৌতুক করছ? আমি কখনোই এদেশকে ধ্বংস হতে দিবনা।' হুদা বিব্রত হয়ে পড়েন। একজন গৃহকর্মী চিৎকার করে বলে ওঠে 'কামাল ভাই আর নেই।' এ সময় হাবিলদার মোসলেহ উদ্দীন টেরেস থেকে নেমে

আসছিলেন, তিনি গালাগাল করেন এবং পেছন থেকে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দিয়ে মুজিবের ওপর গুলি চালান।

জওয়ানরা যা পাচ্ছিল তাই কুড়িয়ে নিচ্ছিল। বেগম মুজিব মিনতি করেন "তোমাদের যা ইচ্ছা নিয়ে যাও, শুধু আমাদের প্রাণে মেরো না।" কিন্তু গুলির শব্দ শুনে তিনি বেরিয়ে আসেন। তিনি বলেন "তোমরা তাকে হত্যা করেছ, আমাকেও হত্যা কর।" তাকে চিরতরে নিস্তব্ধ করে দেয়া হয়।

শেখ জামাল, তার স্ত্রী রোজী এবং কামালের স্ত্রী সুলতানা তখনও ড্রেসিং রুমের ভেতরে ছিলেন। স্টেন গানের এক ঝাঁকগুলিতে তারা তিনজনও নিহত হলেন।

বন্দুকধারীরা বাথরুমে নাসেরকে খুঁজে পায় এবং গুলি করে হত্যা করে।

রাসেল এক কোণায় ভয়ে কুঁকড়ে ছিল। "আমাকে আমার মার কাছে নিয়ে যাও" বলে সে কেঁদে ওঠে। নৃশংস খুনিদের একজন বলে "আমরা তোমাকে তোমার মার কাছেই পাঠাবো"। একজন পুলিশ অফিসার অনুনয় করেন রাসেলের জন্য "ও তো একটা বাচ্চা মাত্র"। সেই পুলিশ অফিসারও মারা যান। গুলিতে একটি হাত উড়ে যাওয়ার পরও রাসেল অনুনয় করছিল "আমাকে মেরোনা, আমাকে মেরোনা।" উত্তরে এসেছিল একটি বুলেট।

রাসেলের মৃতদেহ পড়ে ছিল তার মার পাশেই।

মুজিবের বাসভবনে পৌঁছাতে ফারুক ও রশিদের দেরি হয়ে গিয়েছিল। সবাই নিহত হয়েছেন এটা নিশ্চিত হবার জন্য ফারুক বাড়ির উপরে উঠেছিলেন। তিনি কাউকে ফোনে সংবাদ জানান।

শেখ মণি সাহায্যের জন্য এখানে সেখানে ফোন করছিলেন। কিন্তু কোন সাহায্যই আসছিল না।

মণি বসার ঘরে আসলেন সেনা সদস্যদের সাথে দেখা করতে, যারা ইতিমধ্যেই গায়ের জোড়ে তার বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল। মণির উপর গুলি চালানোর ঠিক আগের মুহূর্তে তার স্ত্রী ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে তার সামনে দাঁড়ান। "সরে পড়ুন" চিৎকার করে বলল একজন জওয়ান আর গুলি চালানো হল।

স্বামী-স্ত্রীর মৃতদেহ রক্তের গঙ্গার মধ্যে পড়ে রইল।

মণি সাথে সাথে মারা গেলেও, আরজুর দেহে তখনও প্রাণ ছিল। তিনি বললেন "আমাকে পানি দাও"। তার তিন বছর বয়সী ছেলে শেখ ফজলে নূর তাপস তাকে জিজ্ঞেস করল "মা তুমি আর বাবা মেঝেতে শুয়ে আছো কেন?" কোন উত্তর আসল না। বিস্ময়ে ভয়ে বিমূঢ় হয়ে ছোট ছেলেটি বলে উঠল "তুমি কথা বলছ না কেন?" আরজুর মধ্যকার মাতৃসত্ত্বা জেগে উঠল। তিনি শেষবারের মত বললেন "আমাকে হাসপাতালে নিয়ে যাও। আমাকে বাঁচাও। আমার দু'টি ছোট বাচ্চা আছে।"

তখন আরজুর গর্ভে ছিল তার তৃতীয় সন্তান।

যখন সেরনিয়াবাত বুঝতে পারলেন সেনারা তার বাড়িটি ঘিরে ফেলেছে তিনি শেখ মুজিব কে ফোন করলেন। মুজিব জানালেন তিনি কিছুক্ষণ পর তাকে ফোন করবেন। তিনি তার জামাতা শেখ মণিকেও ফোন করলেন। ফোন বাজলেও শেখ মণির বাসা থেকে কেউ ফোন তুলছিলেন না।

সেরনিয়াবাত নিচে বসার ঘরে নেমে এলেন। তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যারা, ভাগ্নে শহীদ, বাড়িতে আগত অতিথিরা এবং কাজের লোকেরা সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়ে ছিলেন। সবাই ছিলেন শুধু তার পুত্র হাসানাত বাদে। হাসানাত ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা, তিনি বাড়ির সামনের দরজায় ব্যারিকেড দিয়ে ছিলেন এবং সময় ক্ষেপণের চেষ্টায় বাড়ির দিকে যেই এগিয়ে আসবে তাকেই গুলি করার হুমকি দিচ্ছিলেন। তিনি পেছনের জানালা দিয়ে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সব জায়গাই সেনাসদস্যরা ছিল। তিনি ফাঁদে আটকা পড়েছিলেন। তিনি একটা ড্রেসিং রুমে আটকা পড়েছিলেন, তার হাতে একটি রিভলবার ছিল এবং মারা যাবার আগে অন্তত একজন খুনিকে হত্যা করতে তিনি বদ্ধ পরিকর ছিলেন।

মেজর শাহরিয়ার এবং হুদার (যারা তখন সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন না) নেতৃত্বে একটি দল সেরনিয়াবাতের বাড়িতে প্রবেশ করে। সেরনিয়াবাত বলেন "আমাকে তোমাদের কমান্ডিং অফিসারের সাথে কথা বলতে দাও"। "আমাদের কোন কমান্ডিং অফিসার নেই। কিন্তু আপনি কে?" প্রশ্ন করেন মেজর শাহরিয়ার। যখন শাহরিয়ার সেরনিয়াবাতের পরিচয় জানতে পারেন তখন তার মুখে বাঁকা হাসি খেলে যায়। পর মুহূর্তেই সেরনিয়াবাত বুলেটের আঘাত নিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন। তার কন্যা হামিদা গগনবিদারি চিৎকার করে তার বাবাকে আড়াল করতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। বুলেট তার দেহের নিম্নাংশে ও পায়ে আঘাত হানে। হাসানাতের শিশু পুত্র বাবু ভয়ে কেঁদে ওঠে। শহীদ তাকে কোলে তুলে নেয়। তারা দুজনেই গুলিবিদ্ধ হন। সে সময় ভয়ঙ্কর গোলাগুলি হয়। আরও যারা সেরনিয়াবাতের বাসভবনে নিহত হন তারা হলেন তার ১৪ বছর বয়সী কন্যা বেবি, তার ৯ বছর বয়সী পুত্র আরিফ এবং তিন জন অতিথি।

সেরনিয়াবাতের স্ত্রী আমিনা, কন্যা হামিদা ও পুত্র খোকন গুলিতে আহত হন।

মেজর হুদার ভাই নুরুল ইসলাম মন্‌জুর সারা বাড়ি খুঁজে দেখেন। তিনি জানতে চান "হাসানাত কোথায়?"

খুনিরা সেরনিয়াবাতের ভাগ্নে শহীদকে তার পুত্র হাসানাত ভেবে ভুল করে।

তখন হাসানাতকে খোঁজা শুরু হয়।

রমনা থানার ওসি বেগম সেরনিয়াবাত, হামিদা ও খোকনকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান।

গোলাগুলির শব্দে ধানমণ্ডি এলাকায় বসবাসকারি জনৈক ভারতীয় কূটনীতিক তার বাড়ির ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ান। তার চেয়ে কয়েক ফুট দূরে তার এক প্রতিবেশী যিনি একজন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী, চিন্তিত ভঙ্গিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন।

তখন একটি রকেট ছোড়া হল। এর মাধ্যমে সংকেত দেয়া হল বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মিশন সফল হয়েছে।

সাবেক মুক্তিযোদ্ধা এবং বর্তমানে ব্যবসায়ী এমনভাবে মাথা ঝাকালেন যেন কেউ তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। কূটনীতিকের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি হেসে বললেন "সব শেষ হয়েছে। আপনার রেডিওটি চালু করুন।"

তখন সকাল ছয়টা বেজে এক মিনিট।

ঢাকা রেডিও থেকে ঘোষণা করা হচ্ছিল সেনাবাহিনী শেখ মুজিব সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করেছে। বার্তা ঘোষক নিজেকে মেজর ডালিম হিসেবে পরিচয় দেন এবং বলেন "খন্দকার মোস্তাক আহমদের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শেখ মুজিবকে বন্দী করা হয়েছে এবং তার সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে।"

পরে আর একটি ঘোষণায় জানানো হয় "পদচ্যুত রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান সকালে সেনাবাহিনী কর্তৃক তার বাসভবনের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার সময় নিহত হন।"

প্রকৃত খবর ধীরে ধীরে প্রকাশ করা হচ্ছিল।

ঘোষণাটির একটি সংশোধিত রূপে জানানো হয় শেখ মুজিবের বাসভবন থেকে প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়।

মোহম্মদপুরে বস্তি এলাকায় একটি রকেট বিস্ফোরণে ৮ জন নিহত হয়। ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণের শব্দে এলাকাবাসীর ঘুম ভাঙ্গে। আলি আকসাদ এটিকে আরও একটি অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা মনে করে শেখ মুজিবকে ফোন করেন। ফোন বাজলেও ওপাশ থেকে কেউ ধরছিল না। তখন আলি আকসাদ শেখ মণিকে ফোন করেন। সেখানেও একই অবস্থা। তিনি তখন মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদসহ আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে ফোন করে খবর দেন। তারাও তাঁকে জানান শেখ মুজিবের বাড়িতে কেউ ফোন ধরছে না।

আকসাদ রেডিও চালু করলেন। রেডিও তখন শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার খবর প্রচার করছিল। প্রচণ্ড ভয় আকসাদকে গ্রাস করল। দেশটা কি আরেকটা ইন্দোনেশিয়া হয়ে যাবে?

"তুমি কি খবর শুনেছ?" একজন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রশ্ন করেন আকসাদকে। জবাব আসে "হ্যাঁ।" ঐ শুভাকাঙ্ক্ষী আকসাদকে বলেন "এক্ষুণি পালিয়ে যাও" এবং ফোন কেটে দেন।

আকসাদকে এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার ছিল না। তিনি খুব দ্রুত তার স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েন। বাচ্চারা প্রশ্ন করলে তিনি তাদের বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন বলে সান্তনা দেন।

তিনি দ্বিতীয়বারের মত ভয়াবহ আতঙ্কে দেশত্যাগ করছিলেন।

"ওঠো!" কাদেরের বোন চিৎকার করে তাকে ডাকলেন। "তোমার ফোন এসেছে।" তার আরেক বোন তাঁকে ফোন করেছেন। তিনি বললেন "দেশে অভ্যুত্থান হয়েছে।" কাদের কিছু না বুঝেই প্রশ্ন করলেন "অভ্যুত্থান?" তার বোন তাঁকে বললেন "যত দ্রুত পার পালিয়ে যাও। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছে। ওরা তোমাকেও খুঁজতে আসবে।" বেতারে প্রচারিত ঘোষণাটা ফোনে পরিষ্কার শোনা গেল।

একটি হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে কাদের সিদ্দিকী বাড়ি ছাড়লেন। তার ড্রাইভার তাঁকে নিয়ে বের হতে রাজি হলো না। কাদের ভাবলেন দীর্ঘ তিন বছর ধরে বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করে আসা ড্রাইভারও এই বিপদের সময় তার কথা শুনছিল না। তিনি ড্রাইভারকে বললেন "আমাকে গাড়ির চাবি দাও।" ড্রাইভার কোন উত্তর দিল না, কিছুক্ষণ পর সে এক প্রতিবেশীর গাড়ি নিয়ে এল এবং প্রায় হুকুমের সুরে বলল "গাড়িতে উঠুন।"

রেডক্রসের প্রধান গাজী গোলাম মোস্তফা বাড়ির দেয়াল টপকে একটি গোয়াল ঘরে লুকিয়ে থাকলেন। তিনি একদম ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তার প্রতিবেশীরা দয়া করে তাকে ধরিয়ে দেননি, কিন্তু তাঁকে বাড়িতে আশ্রয় দেয়াটাও তাদের জন্য বিপদজনক ছিল।

মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন বস্টারের সহকারীরা মুজিব হত্যার সংবাদ তাঁকে জানানোর জন্য হন্যে হয়ে খুঁজছিলেন; কিন্তু রাষ্ট্রদূত তার বাসভবনে বা সাধারণত যেসব জায়গায় তাঁকে পাওয়া যায় তার কোন জায়গায়ই ছিলেন না । ভোর ছয়টার সময় তিনি কোথায় ছিলেন?

মিশন সফল হওয়ার খবর রশিদ তার চাচা মোস্তাক'কে সাথে সাথেই জানিয়ে দেন। তবুও যখন রশিদ কিছু সৈন্য নিয়ে মোস্তাক'কে রেডিও স্টেশনে নিতে যান, তখন মোস্তাক বার বার জিজ্ঞেস করছিলেন "তুমি কি নিশ্চিত বঙ্গবন্ধু মৃত?"

পদ্মার এক মাঝি তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেন "কোন বাপের বেটাই বঙ্গবন্ধুরে খুন করতে পারবো না।"

মোস্তাকের মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা তার স্ত্রীকে বলেছিলেন "তুমি কি মোস্তাকের চোখগুলো লক্ষ করেছ? তার চোখগুলো ঠিক সাপের মত। এমন মানুষ নিজের স্বার্থের জন্য খুন করতে পারে। ওর আশে পাশে আমি সব সময়ই অস্বস্তি বোধ করি।

কর্মকর্তার স্ত্রী তার ভীতির কথা শুনে হেসেছিলেন। কিন্তু সেই মোস্তাক এখন দেশের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন। এখন এদেশের কি হবে?

সাপেরা দাঁতে শান দিচ্ছিল।

১৩ আগস্ট থেকে মাহবুবুল আলম চাষী কুমিল্লা থেকে নিখোঁজ হন। কুমিল্লা একাডেমীতে তার সহকর্মীরা কাউকে কিছু না জানিয়ে তার চলে যাওয়া নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। তিনি হঠাৎ উদয় হন ১৫ আগস্ট সকালে ঢাকা রেডিও স্টেশনে, তার সাথে ছিলেন মোস্তাক এবং তাহেরউদ্দীন ঠাকুর।

এই দুষ্ট ত্রয়ী ১৯৭১ সালে দেশের স্বাধীনতার পথ বন্ধ করতে চেয়েছিলেন, অবশেষে তারা সফলতার মুখ দেখেছেন।

দিল্লিতে লাল কেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজে ভাষণ দিতে যাওয়ার আগে আগে ইন্দিরা গান্ধী মুজিব হত্যার খবর জানতে পারেন। খবর পেয়ে তিনি হতবাক হয়ে যান।

তিনি আগেই মুজিবকে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তার জীবন হুমকির মুখে রয়েছে; কিন্তু মুজিব এই আশঙ্কা হেসে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন "ওরা আমার সন্তানের মত।"

ঢাকা রেডিও থেকে এই বাণীটি নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকল "দুর্নীতি, অবিচার এবং স্বৈরতন্ত্রের অবসানের পর এখন দেশের মানুষের সামনে দেশসেবা করার প্রকৃত সুযোগ তৈরি হয়েছে। আসুন আমরা এই সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করি।"

"ধুর" বলে নিজের রেডিওটিতে বিরক্তিতে ঘুষি বসিয়ে দিলেন আশরাফ, একজন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা। "সুযোগ! সুযোগ! মোস্তাকের চক্রান্ত অবশেষে বাস্তবায়িত হয়েছে। সব বিশ্বাসঘাতকেরা এখন আবার বেরিয়ে আসবে। আমাদের আবার ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।"

আশরাফের স্ত্রী কাঁদছিলেন।

অনেক নারীই প্রকাশ্যে মুজিবের জন্য কেঁদেছিলেন।

একজন সাংবাদিক খুব আনন্দের সাথে তার প্রতিবেশীকে জানালেন "মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।" বলেই তার মনে হল হয়তো তিনি একটু বেশি আগেই আনন্দ উদ্‌যাপন করে ফেলছেন। তিনি ভাবলেন "যদি মুজিব সত্যিই নিহত না হয়ে থাকেন?" মনে সন্দেহ নিয়ে সাংবাদিক তার রেডিওটি চালু করলেন খবরটি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য। রেডিওর খবর শুনে তার ভয় কেটে গেল, এই মুহূর্তে ভয়ের কিছু নেই।

এই সাংবাদিকটি ছিলেন মুসলিম লীগ সমর্থক। কিন্তু শেখ মুজিবের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মধ্যে অনেকেই তার জন্য সেদিন শোক করেছিলেন।

ঢাকা থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে সাভারে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে কেউ কেউ প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বললেও অনেকেই মেজরদের সাথে সংঘাতে যেতে ভয় পাচ্ছিলেন। তারা বলছিলেন "আমাদের তো কোন ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান নেই।" রক্ষীবাহিনীর মহাপরিচালক নুরুজ্জামান ঐ মুহূর্তে লন্ডনে ছিলেন, সিদ্ধান্ত নেয়ার মত কেউ সাভারে ছিলেন না।

রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা শেখ মুজিবের বিশ্বস্ত রাজনৈতিক সহযোগী তোফায়েল আহমেদের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তোফায়েল শোকে এতটাই কাতর ছিলেন যে লড়াইয়ের আদেশ দেয়ার অবস্থা তাঁর ছিল না।

ঢাকায় অবস্থানকারী একজন ভারতীয় সাংবাদিকের স্ত্রী তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বললেন "তাড়াতাড়ি ওঠো। কিছু একটা ঘটেছে। কারফিউ দেয়া হয়েছে। রেডিওতে খবর শোন।" তার স্ত্রী তাকে মুজিব হত্যার খবরটি সরাসরি দেননি।

ঢাকা রেডিও থেকে বার বার জানানো হচ্ছিল শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন এবং খন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন।

সাংবাদিক তার রিপোর্ট লিখলেন এবং সচকিত ভাব নিয়ে কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাফ অফিসের দিকে এগিয়ে গেলেন। স্টেডিয়ামের কাছে একটি ট্যাঙ্ক অবস্থান করছিল। এখানে ওখানে লোকজনের ছোট ছোট জটলা দেখা যাচ্ছিল।

টেলিগ্রাফ অফিসের একজন কর্মকর্তা বললেন "আপনি আপনার টেলিগ্রাম এখানে রেখে যেতে পারেন, কিন্তু এটি পাঠানো হবে না। আমাদের কোন টেলিগ্রাম না পাঠানোর নির্দেশ দেয়া আছে।" টেলিগ্রাম অফিসে ইতিমধ্যেই একজন সামরিক কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

একজন রেডিও কর্মকর্তা নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছিলেন। টেলিফোনের শব্দে তার ঘুম ভাঙলেও অলসতার কারণে তিনি ফোনটি ধরছিলেন না। তার স্ত্রী তাকে জানালেন "তোমাকে জরুরী ভিত্তিতে রেডিও স্টেশনে হাজির হতে বলা হয়েছে।" তিনি ফোন ধরলে ওপাশ থেকে হুকুম আসল "এখনই আসুন।" কি ঘটছে তা তিনি বোঝার চেষ্টা করছিলেন। রেডিওতে দিনের প্রথম সম্প্রচারের সময় তখনও হয়নি। তবুও অভ্যাসবশত তিনি রেডিওটি চালু করলেন খবর শোনার জন্য। ও খোদা! ভয়ঙ্কর; ভয়ঙ্কর!

রেডিও স্টেশনে পৌছে তিনি আবিষ্কার করলেন মেজর শাহরিয়ার স্টেশনের দায়িত্বে আছেন। তার সামনে টেবিলে একটি স্টেনগান রাখা ছিল। একজন অফিসার অনুগত সুরে বললেন "সবাই কাজ করছে।" শাহরিয়ার টেবিলে রাখা অস্ত্রটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন "যতক্ষণ এটি এখানে থাকবে ততক্ষণ সবাই কাজ করবে।"

একই রকম ঔদ্ধত্য পাকিস্তানি সেনারা দেখিয়েছিল ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর যখন পাকিস্তানে সেনা শাসন কায়েম করা হয়েছিল।

একজন কর্নেল যখন কাজে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন তার সহকর্মী তাকে ফোন করলেন। সহকর্মীটি তাকে বললেন "তুমি কি রেডিওতে খবর শুনেছ?" যখন তিনি জানালেন যে খবর শোনা হয়নি, তখন ওপাশ থেকে তাকে বলা হল "তাহলে এখনই শোন।"

একটি মার্কিন সংবাদ সংস্থার রিপোর্টার অভ্যুত্থান হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মুজিব হত্যার খবর রিপোর্ট করেন। রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশ একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। সম্পূর্ণ উল্টো পথে যাত্রা।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি কূটনৈতিক সূত্রের বরাত দিয়ে রেডিও পাকিস্তানেও প্রচার করা হয় যে বাংলাদেশ এখন একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র।

তাৎক্ষণিকভাবে এ সংবাদটি নিশ্চিত বা অস্বীকার করা হয়নি। যখন চক্রান্তের মাধ্যমে মোস্তাক আহমেদ ক্ষমতা গ্রহণ করেছেন সে মুহূর্তে এই খবরটি গুরুত্বহীন। ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ বেতারের নাম বদলে হয়েছে রেডিও বাংলাদেশ।

পশ্চিম ইউরোপে কোন একটি দেশে বাংলাদেশের একজন রাষ্ট্রদূত এই অভ্যুত্থানে ভুট্টোর কি ভূমিকা থাকতে পারে তা ভেবে দেখছিলেন। এই রাষ্ট্রদূত যখন পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরে কাজ করতেন তখন ভুট্টো পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন। সে সময় একবার ইরানের রাজধানীতে ভুট্টোর কোন একজন পরিচিতের কাছ থেকে একটি প্যাকেট সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তাকে। সংগ্রহ করার পর ঐ প্যাকেটটি তরুণ কূটনীতিকের কক্ষ থেকে হারিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত এই পুরো কাজটিকে একটি স্বাভাবিক কাজ মনে হয়েছিল।

১১ থেকে ১৪ আগস্ট সময়ে মুজিবের দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানা ব্রাসেলসে ছিলেন। রেহানা ছুটি দীর্ঘায়িত না করে বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। ১২ আগস্টে তিনি হাসিনাকে বলেন "আমি ভয়ঙ্কর সব স্বপ্ন দেখছি। আমি দেখেছি দেশের মানুষ আবার ভয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। আমার খুব ভয় করছে। আমি বাড়ি ফিরে যেতে চাই।

যা হোক, ১৪ আগস্ট বিকেলে হাসিনা ও রেহানা দুজনেই খুব উৎফুল্ল ছিলেন।

একটি অনুষ্ঠান থেকে তারা দুজনে অনেক রাত করে বাড়ি ফিরেছিলেন। পরদিন সকালে তাদের ফ্রান্সে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা রাষ্ট্রদূত সানাউল হকের কন্যাদের সাথে গল্প করছিলেন। হাসিনার মনে হঠাৎ কুসংস্কার কাজ করতে শুরু করল, তিনি বললেন "আমরা অনেক বেশি হাসছি। ভাবছি সামনে আমাদের অনেক কাঁদতে হবে কি না।"

পরদিন সকালে বন থেকে হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদের জন্য একটি ফোন আসে। তিনি তার স্ত্রীকে ফোনটি ধরতে বলেন, কিন্তু ওপাশ থেকে ড.

ওয়াজেদকেই চাওয়া হয়। ওয়াজেদ বুঝলেন নিশ্চয়ই খারাপ কিছু ঘটেছে। ফোনে ড. ওয়াজেদকে বলা হল "এখনই বন এ চলে আসুন।"

যখন হাসিনাকে জানানো হল দেশে একটি অভ্যুত্থান হয়েছে, তার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল "কেউ বেঁচে নেই!"

সেনা সদরে উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা অভ্যুত্থানকারী মেজরদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া যায় তা ভাবছিলেন। এই মেজররা শুধু একটি অভ্যুত্থানই করেননি, তারা আগে পিছে না ভেবে ঘোষণা করেছেন দেশের ক্ষমতা এখন সেনাবাহিনীর হাতে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভ্যুত্থানের রাজনৈতিক ফলাফল উপেক্ষা করলেও সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা নিয়ে ভাবিত না হয়ে পারছিলেন না। মেজরদের মধ্যে কেউ কেউ বাহিনী থেকে অব্যহতি পেলেও অনেকেই তখনও বাহিনীতে ছিলেন। এদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়া হলে সেনাবাহিনীর 'চেইন অফ কমান্ড' বলতে কিছু থাকবে না। তখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবস্থান কি হবে?

উর্ধ্বতন সামরিক কর্তাদের কেউ কেউ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়ার কথা বললেও, অনেকে দ্বিমত পোষণ করেন এবং পরিস্থিতি আরও পরিষ্কার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরামর্শ দেন। যতক্ষণ তাদের নিজ নিজ চাকুরী বহাল আছে ততক্ষণ অপ্রোয়জনীয় ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী?

মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ ছিলেন সেনাবাহিনীর প্রধান, কিন্তু তিনি ছিলেন একজন উদ্যোগহীন ব্যক্তি এবং তার কর্তৃত্ব সব সময়ই তার সহকারী মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের চ্যালেঞ্জের মুখে ছিল।

যখন উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা অভ্যুত্থানকারী মেজরদের বিষয়ে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে তা নিয়ে তর্ক করছিলেন তখন মেজর ডালিম একটি জিপ চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের দ্রুত মনস্থির করতে বলেন। ষড়যন্ত্রকারীরা সে সময় সবকিছুর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ততক্ষণে সকাল দশটা বেজে গেছে। চার ঘন্টা সময় নষ্ট হয়ে গেছে। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কোন ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছা থাকলে তারা এর মধ্যেই কোন পদক্ষেপ নিতেন।

সকল বাহিনীর প্রধানরাই নতুন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেন।

দ্বিতীয় আর্টিলারি রেজিমেন্টের একজন অফিসার কর্নেল আবু তাহেরকে সকালে ফোন করে জানান যে মেজর রশিদ তাকে বাংলাদেশ বেতারে থাকতে বলেছেন। ঐ অফিসারটি তাহেরকে শেখ মুজিবের নিহত হওয়ার খবরও জানান।

শেখ মুজিবের নিহত হবার এবং মোস্তাকের ক্ষমতা গ্রহণের খবরে কর্নেল তাহের হতবাক হয়ে যান। তিনি বলেন "আমি ভাবছিলাম এর ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হবে এবং এমনকি আমরা আমাদের স্বাধীনতাও হারাতে পারি।"

তাহের আরও জানান "বেলা সাড় এগারোটায় প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা নিয়ে আমি বাংলাদেশ বেতার ছেড়ে আসি। আমি অনুভব করছিলাম জাতির জনকের হত্যার পেছনে বিদেশী শক্তির হাত থাকতে পারে।" ঐ মুহূর্তে তিনি যা অনুভব করছিলেন দিন দুয়েক পর তা একটি অভিযোগ আকারে সামনে আসে।

মোস্তাক এবং তাহের উদ্দীন ঠাকুর বাংলাদেশ বেতার থেকে বেরিয়ে বায়তুল মোকাররম মসজিদে আসেন। তাদের গাড়ির সামনে একটি ট্যাঙ্ক এবং পেছনে দুটি সাঁজোয়া যান ছিল। মোস্তাকের চোখ দুটি বন্ধ ছিল যেন তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছিলেন। তাহের উদ্দীন চিন্তিতভাবে পাশের মসজিদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মোস্তাকের গাড়িটি যখন প্রেসক্লাব এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল অনেক সাংবাদিক তার দিকে এগিয়ে যান। একজন কবি চিৎকার করে প্রশ্ন করেন "আপনার কি কোন লজ্জা নেই? গতকালও আপনি শেখ মুজিবের নামে জয়ধ্বনি দিয়েছেন।"

কেউ তার প্রশ্নের জবাব দেননি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান সরকারের পক্ষে কাজ করেছেন এমন একজন সাংবাদিক মোস্তাককে তার সাফল্যে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন "আমি রেডিওতে ঘোষণার জন্য আতঙ্ক নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। ভাগ্যিস অভ্যুত্থান সফল হয়েছে। অন্যথায় আমি বিপদে পড়ে যেতাম।"

এমনি আরও কেউ কেউ ছিলেন যারা আনন্দিত হয়েছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার মানুষ সে সময় শোকে ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

ক্ষমতা গ্রহণের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মোস্তাক মোহাম্মদুল্লাহকে উপরাষ্ট্রপতি করেন। শেখ মুজিবের সর্বশেষ মন্ত্রী সভায় দুজন সাবেক রাষ্ট্রপতি ছিলেন আবু সাইয়িদ চৌধুরী এবং মোহাম্মদুল্লাহ। মোস্তাকের সরকারে দুজনেরই স্থান হয়েছিল। আবু সাইয়িদ চৌধুরীকে কামাল হোসেনের পরিবর্তে নতুন পররাষ্ট্র মন্ত্রী করা হয়।

১৯৭১ সালে তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান এবং মোস্তাক এই কজন মিলে প্রবাসী সরকার গঠন করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সহকর্মীদের না জানিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে সমঝোতা করার চেষ্টা করায় মোস্তাক একা হয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মোস্তাক সামনে চলে এসেছেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে তাজউদ্দীন আহমেদ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন। দলে বা সরকারে তার কোন পদ ছিল না। যুদ্ধকালীন সময়ের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি খুব উদ্যোমী ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি একজন ভেঙ্গে পড়া মানুষ।

যখন সৈনিকেরা তাজউদ্দীনের বাড়িতে গিয়েছিল তিনি তাদের বলেন "তোমরা আমার নেতাকে খুন করেছ, আমাকেও খুন করে ফেল।" তার আশঙ্কা তখন সত্যি

হয়েছে, তার চরম শত্রু এখন ক্ষমতায়। পরিস্থিতি অন্য রকম হলে তিনি হয়ত লড়াই করতেন, কিন্তু তখন তার কিছুই করার ছিল না ।

সংবিধান অনুসারে শেখ মুজিবের মৃত্যুর পর সৈয়দ নজরুল ইসলামের দেশের রাষ্ট্রপতি হওয়ার কথা। কিন্তু সাহসী সিদ্ধান্ত নেয়ার মত ব্যক্তিত্ব তার ছিল না। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে উদ্যোগ নিতে বললেও, তিনি এতোটাই আতঙ্কগ্রস্থ ছিলেন যে সামনে কি হবে তাই তিনি ভাবতে পারছিলেন না।

এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান একজন চমৎকার কিন্তু নির্বিরোধ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাকে প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতা হিসেবে কল্পনা করাও কঠিন ছিল।

মুজিব সরকারের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলী জনতেন তার নির্দেশ কেউ মানবেনা, তারপরও আত্মসমর্পণ না করে তিনি পালিয়ে যান। কিন্তু দুদিন পর তার বাসভবনের কাছেই কলাবাগান এলাকা থেকে সেনা সদস্যরা তাকে গ্রেপ্তার করে।

বেলগ্রেড থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের কথা জানতে পারেন ড. কামাল হোসেন। তার স্ত্রী হামিদা এর কিছুদিন আগেই দেশে ফিরেছেন, কিন্তু ঐ মুহূর্তে দেশে ফেরত আসা তার জন্য বিপদজনক ছিল। তিনি বন এ থেকে যান।

কোন অবস্থাতেই তিনি মোস্তাক সরকারে যোগ দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বন্ধুদের ড. কামাল বলেন "আমরা সম্মানের সাথে বাঁচবো অথবা মরবো" শেখ মুজিবের মন্ত্রণালয়ের কিছু সংখ্যক মন্ত্রী ইতিমধ্যেই মোস্তাক সরকারের সাথে সমঝোতা করেছিলেন এবং কেউ কেউ সমঝোতা করার জন্য উদগ্রীব ছিলেন। কিন্তু অবশিষ্টদের বিকেলে নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সেনা সদস্য দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ফণীভূষণ মজুমদার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পি.জি. হাসপাতালে ভর্তি হয়ে ছিলেন। যখন সেনা সদস্যরা তাকে বঙ্গভবনে নিয়ে যেতে আসে তখন আরেকজন রোগী কবি জসিমউদ্দীন তাকে শক্ত করে ধরে রাখেন আর সেনা সদস্যদের কাছে আবেদন করেন "উনি একজন ভাল মানুষ তাকে নিয়ে যেও না।"

বিকেলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এ. ই. মোহাম্মদ হোসাইন বঙ্গভবনে দশজন মন্ত্রী ও ছয়জন প্রতিমন্ত্রী নিয়ে ষোলজনের মন্ত্রিসভাকে শপথ পাঠ করান।

দশজন মন্ত্রীর মধ্যে দুজন ছিলেন ফণীভূষণ মজুমদার এবং মনোরঞ্জন ধর, এ দুজনকে মোস্তাকের প্রয়োজন ছিল। মোস্তাক প্রাণপণে চাইছিলেন এটা প্রমাণ করতে যে মুজিবের জায়গায় তার রাষ্ট্রপতি হওয়া ছাড়া তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে তাহের উদ্দীন ঠাকুর এতোটাই লজ্জা পাচ্ছিলেন যে নারীদের অনেকে তাকে 'দুলা মিয়া' বলছিলেন। তিনি এখন মোস্তাকের প্রধান সহযোগী।

তিনি একজন প্রতিমন্ত্রী হলেও এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না যে নতুন সরকারে তিনি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি।

বাংলাদেশে রক্তপাতের ঘটনায় ভারতের প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে সংশয়ে থাকা নতুন সরকার ভারতের সাথে যোগাযোগ রাখছিল। তাহের উদ্দীন ঠাকুর তার প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে জোড়ের সাথে বলেন যে তারা ভারতের সাথে যোগাযোগ রাখছেন, যদিও পাকিস্তান বিষয়ে তিনি কিছু বলেননি। সংবাদ সম্মেলনে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নাম ভুলে যান, এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞেস করেন "মার্কিন রাষ্ট্রদূতের নামটা যেন কি?" তখন একজন সাংবাদিক তাঁকে মনে করিয়ে দিলে তিনি নামটি ঠিক মত বলেন।

কর্নেল জামিলের মৃতদেহ সৎকারের জন্য যেন ছেড়ে দেয়া হয় তা বলার জন্য ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ কর্নেল ফারুককে ফোন করেন। কর্নেল জামিলকে ঢাকায় কবর দেয়া হবে এই শর্তে ফারুক মৃতদেহ হস্তান্তরে রাজি হন।

ঢাকাস্থ বনানী কবরস্থানে মুজিবের স্ত্রী, তিন পুত্র এবং দুই পুত্রবধুকে তাঁদের রক্তাক্ত জামা-কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই কবর দেয়া হয়। তাঁদের সৎকারের সময় কোন ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ পালন করা হয়নি এবং কবরের গায়ে কোন নাম ফলকও ছিল না।

রেডিও স্টেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে মোস্তাকের ভাষণের লিখিত কপি বিতরণ করা হয়। তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধান মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ নিজের অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিলেন, তিনি মোস্তাকের ভাষণের কপিটি পড়ে তার প্রশংসা করেন। জবাবে মোস্তাক বলেন "আপনার কি মনে হয় এই ভাষণটি একদিনে লিখা হয়েছে", প্রথমবারের মত মোস্তাক তার উচ্ছ্বাস লুকাতে ব্যর্থ হন।

তার প্রথম ভাষণে মোস্তাক খুনীদের 'সূর্য সন্তান' এবং 'ভয়হীন হৃদয়ের অধিকারী' বীর বলে সম্বোধন করেন। কিন্তু বিজয়ের মুহূর্তে মোস্তাক ভয় পাচ্ছিলেন। তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছিলেন যে 'এ দায়িত্ব তিনি বাধ্য হয়ে কাঁধে তুলে নিয়েছেন' এবং 'জাতির বৃহত্তর স্বার্থ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতির ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা ভেবেই তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন'। তিনি ভাষণে আরও বলেন "আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বন্ধু রাষ্ট্রের অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছে" তিনি ভারতের নাম উল্লেখ করেননি। তিনি 'ত্রিশ লাখ শহীদের রক্ত ও দুই লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা'র কথাও বলেন। তবুও তিনি ভাষণের শেষ করেন 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' দিয়ে; প্রতিরোধের স্লোগান, বিজয়ের স্লোগান 'জয় বাংলা' কে তিনি বা তার সঙ্গী ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের স্লোগান মনে করতে পারেননি।

বাংলাদেশে রক্তপাতের ঘটনায় ভুট্টোর প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়াটি ছিল সঠিক ও সময়োচিত, যদিও এটি ছিল সম্পূর্ণ অনুভূতিশূন্য। তিনি বলেন "শেখ মুজিব ও তার পরিবারের করুণ পরিণতিতে আমি শোকাহত।" যদিও ১৫ আগস্টে ভুট্টো

শুধু পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং অন্যান্য তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে বিশেষ করে ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোকেও আহবান জানান যেন তারা বাংলাদেশের নতুন সরকারকে স্বীকৃতি দেন। তিনি বলেন, "এই আহবান জানানোর মূলে রয়েছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কারণে আমাদের দেশটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাওয়ার ঘটনার ব্যথা ভরা অভিজ্ঞতা"।

ঢাকায় এই হত্যাযজ্ঞের দিনে বাংলাদেশের জনগণের জন্য একটি উপহারের ঘোষণাও দেন। তিনি বলেন "বাংলাদেশের ভ্রাতৃসুলভ জনতার জন্য বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পাকিস্তান সরকার ৫০,০০০ মেট্রিক টন চাল, ১০ মিলিয়ন গজ থান কাপড় এবং ৫ মিলিয়ন গজ সুতি কাপড় পাঠাবে।" তিনি আরও প্রতিশ্রুতি দেন যে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের ক্ষমতা অনুসারে আরও বড় আকারের সাহায্য দেয়া হবে।

মুজিবকে হত্যা করার কারণেই কি এ উপহার?

১৬ আগস্ট, হত্যাযজ্ঞের পরদিন একজন মেজর এবং একজন লেফটেন্যান্ট কিছু সৈন্যসহ টুঙ্গিপাড়ায় হেলিকপ্টারে অবতরণ করেন। তারা গ্রামের পেশ ইমামকে ডেকে পাঠান এবং তাকে প্রশ্ন করেন গ্রামের মানুষ শেখ মুজিবের কবর দিতে চায় কি না। উত্তর আসে যে মুজিবের লাশ তাদের কাছে হস্তান্তর করা হলে তারা তার সৎকার করতে রাজি আছে।

গ্রামের মানুষকে বলা হয় তাদের দশ থেকে বারোটি কবর খুঁড়তে হতে পারে, তবে তখনকার মত একটি কবর প্রস্তুত করাই দরকার।

দুপুর আড়াইটায় সৈনিকেরা শেখ মুজিবুর রহমানের লাশ নিয়ে আসে। ইতিমধ্যেই গোপালগঞ্জের উপ-বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশের একটি শক্তিশালী দল নিয়ে সেখানে হাজির হন।

একজন মেজর লাশটি কবরে নামিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ কাজটি ইসলাম বিরোধী হত। "আমাদের অবশ্যই মৃতদেহ দেখতে দিতে হবে" গ্রামের মানুষ জোড়ের সঙ্গে দাবি জানায়। মেজর তাদের কাছে জানতে চান "আপনারা কি লাশ না দেখে কবর দিতে পারেন না?" তখন গ্রামের পেশ ইমাম মৌলভী শেখ আব্দুল হালিম বলেন "আমরা সেটা করতে পারি যদি আপনারা তাকে শহীদের মর্যাদা দেন"। মেজরের কাছে এ কথার কোন জবাব ছিল না। "আপনারা কি তাকে ইসলামী রীতি অনুসারে দাফন কাফন করাতে চান না?" আবার প্রশ্ন করেন মৌলভী।

এবারও কোন জবাব আসল না।

মুহূর্তটি ছিল খুব উত্তেজনাকর। সেনা কর্মকর্তারা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলেন। তাদের উপর পরিষ্কার নির্দেশ ছিল গ্রামবাসী যেন কোন অবস্থাতেই শেখ মুজিবের মৃতদেহ দেখতে না পায়। কিন্তু একজন মুসলমানকে তার ধর্মীয় অধিকার থেকে

বঞ্চিত করলে অন্য মুসলিমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে পারে। শেষ পর্যন্ত মেজর দাফন এবং কাফন সম্পন্ন করতে রাজি হন, কিন্তু এগুলো করতে হবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে।

কফিনটি খোলা হল।

মুজিবের দেহ ছিল বুলেটে ক্ষত বিক্ষত এবং বরফ ভরা কফিনটি ছিল রক্তস্নাত।

বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গ্রামবাসী কফিনটি ঘিরে দাঁড়িয়েছিল।

এই নিস্তব্ধতা ছিল ভয়ঙ্কর। প্রতি মুহূর্তেই আশে পাশের গ্রামগুলো থেকে শত শত মানুষ ভিড় করছিল। তাদেরকে বাধা দিয়ে দূরে রাখা হচ্ছিল, কিন্তু যে কোন সময় তারা বাধা ভেঙ্গে চলে আসতে পারে। লেফটেনেন্ট চিৎকার করে উঠলেন "জলদি করুন। কি হলো? আমাদের ফিরে যেতে হবে।" "আপনাদের পাঁচ মিনিট সময় দেয়া হল" হুঙ্কার করলেন মেজর।

মুজিবের দেহটি তার গ্রামের বাড়ির বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হল। তারা শরীরে মোট ২৯ টি বুলেটের ক্ষত ছিল। একটি ক্ষত, যা সম্ভবত অটোমেটিক রিভলবারের গুলিতে হয়েছে, ছিল তার পিঠে।

তার কুর্তার এক পকেটে ছিল তার পাইপ আর ভাঙ্গা চশমা।

মুজিবের গ্রামের বাড়িতে কেউ ছিল না এবং আশে পাশের দোকানপাট সব বন্ধ ছিল। কেউ একজন একটি সাবান নিয়ে এল। শেষ গোসল করানোর জন্য পানি গরম করার সময় ছিল না। এমন কি সমস্ত রক্তের দাগ পরিষ্কার হওয়ার আগেই মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন "জলদি করুন। আপনাদের আর কত সময় লাগবে।"

মুজিবের মা সায়রা খাতুনের নামে প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল থেকে চারটি শাড়ি নিয়ে আসা হল। কিন্তু মেজর কাফনের কাপড় সেলাই করার সময়টুকুও তাঁদের দিতে রাজি ছিলেন না।

যখন জানতে চাওয়া হল মৃতের জানাজার নামায হবে কি না, তখন মেজর জানালেন তা হবে। মেজর একজন পুলিশ সদস্যকে জিজ্ঞেস করলেন তারা জানাজায় অংশ নিতে চায় কি না। পুলিশ সদস্যটি জানালেন তাদের অযু করা থাকলে তারা জানাজায় অংশ নিতেন। তারা জানাজায় অংশ নেন নি।

মুজিবকে তার বাবার কবরের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হল।

মোস্তাকের প্রস্তাব

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় শেখ মুজিব যখন তার দুই কন্যা হাসিনা ও রেহানাকে পাকিস্তানি সেনারা হানা দেয়ার আগে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে বলেন তখন রেহানা তার বাবাকে আকড়ে ধরে থাকেন আর কাঁদতে কাঁদতে বলেন "আমি যাব না। আমাদের যদি মরতেই হয় তাহলে একসাথে মরব।" তাঁকে জোড় করে তার বাবার কাছ থেকে আলাদা করতে হয়েছিল।.

কিন্তু এখন রেহানা বিদেশের মাটিতে।

অভ্যুত্থানের খবর শোনার পর শেখ হাসিনার প্রথম প্রতিক্রিয়া ছিল "কেউ বেঁচে নেই।" কিন্তু কিছু উড়ো খবর শোনা যাচ্ছিল যে তার মা ও ছোট ভাই রাসেল তখন জীবিত আছেন। তিনি এই বিশ্বাস আকড়ে ধরে ছিলেন।

মুজিবের মেয়ের জামাই ওয়াজেদের কাছে ১৬ আগস্ট ঢাকা থেকে একটি ফোন আসে। ফোন করেছিলেন মিসেস আবু সাইয়িদ চৌধুরী, তিনি হাসিনা ও রেহানাকে নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। তিনি হাসিনা ও রেহানাকে সব ধরণের সাহায্য করার আশ্বাস দেন এবং ড. ওয়াজেদকে তারা যেখানে আছেন সেখানেই থাকার উপদেশ দেন। তিনি আরও বলেন সাইয়িদ চৌধুরী লিমাতে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যাওয়ার সময় তাদের সাথে দেখা করবেন। "আমরা তোমাদের পাশে থাকবো" তিনি বলেন।

তাদের দিশেহারা অবস্থার মধ্যেও এই ফোন আসায় তাঁরা অবাক হয়েছিলেন। আবু সাইয়িদ চৌধুরী তাঁদের কোন নিকটজন ছিলেন না । সর্বোপরি তিনি মোস্তাক সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েও তাদের সহায়তা করার কথা বলছিলেন। এই ফোন নিশ্চয়ই নতুন সরকারের পরামর্শে করা হয়েছে অথবা অন্তত নতুন সরকারের অনুমোদন নিয়ে করা হয়েছে। তাঁদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছিল। তারা ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন। যখন একটি মাত্র বাক্য লিখে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন তখন ওয়াজেদের হাত কাঁপছিল।

রাজধানী বন-এ অবস্থান করা আর নিরাপদ মনে হচ্ছিল না। ঢাকা থেকে এখানে কেউ চলে আসতে পারে। কার্লরুহ-তে ওয়াজেদের একটি ফ্ল্যাট ছিল; আশ্রয় প্রার্থনা করে লেখা চিঠির জবাব আসা পর্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হল।

ঢাকায় পত্রিকা বিলি করে এমন একটি ছেলে মুজিব হত্যার পরদিন মুজিবের জন্য অনেক কাঁদছিল। এক ভারতীয় সাংবাদিক তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন "তুমি তো মুজিবের অনেক সমালোচনা করতে।" ছেলেটি কাঁদতে কাঁদতেই জবাব দিল "ভালো বা মন্দ যাই হোক, তিনিই ছিলেন আমাদের একমাত্র নেতা; তার নিন্দা করতাম কারণ দোষারোপ করার মত আর কেউ আমাদের নেই।"

এই ছেলেটির মত আরও অনেকেই নিজেদেরকে এতিম মনে করছিলেন।

দেশের মানুষের মনের অবস্থা বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপের মতোই গুরুগম্ভীর ও বিস্ফোরণমুখী ছিল; যে কোন মুহূর্তেই এটি একটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপান্তরিত হয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে পারতো।

পুরো পরিস্থিতি বুঝতে পেরে মোস্তাক হত্যাযজ্ঞের সাথে নিজের সম্পৃক্ততা মুছে ফেলতে মরিয়া ছিলেন। গণরোষের শিকার যদি কেউ হয় তা মেজররা হোক।

মোস্তাকের কিছু বন্ধু ও সহযোগী সে সময় এটা প্রমাণ করতে ব্যস্ত ছিলেন যে মেজররা নিজেরাই এই অভ্যুত্থান করেছেন এবং এ সম্পর্কে মোস্তাক আগে কিছুই জানতেন না। মোস্তাকের এক বন্ধু বলেন "যখন একজন মেজর কিছু সৈন্য নিয়ে তাকে নিতে আসে তখন তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন যে ওরা তাকেও হত্যা করবে।" কিন্তু যখন বোঝা গেল যে কেউ এই গল্প বিশ্বাস করছে না তখন মোস্তাকের বন্ধুরা বলতে লাগলেন যে মোস্তাককে বলা হয়েছিল অভ্যুত্থানটি হবে রক্তপাতহীন। প্রমাণ হিসেবে তারা বলছিলেন যে যখন মোস্তাক হত্যাযজ্ঞের কথা জানতে পারেন তখন তিনি বলেছিলেন "এমন তো কোন কথা ছিল না।"

তাদের মতানুসারে মুজিবের কবর টুঙ্গিপাড়ায় দিয়ে মোস্তাক মুজিবের ইচ্ছার প্রতি সম্মান দেখিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন এও বলেন যে, "মোস্তাক ভাই একজন আল্লাহভক্ত মুসলমান, যিনি দিনে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন।"

প্রার্থনারত পতঙ্গ?

ষড়যন্ত্রকারীরা বুঝতে পেরেছিল 'মুজিবকে সরিয়ে দিতে হবে'। মোস্তাকের ভাতিজা মেজর রশিদ যে তার চাচার চেয়ে কম ভণ্ড, তার ভাষ্যমতে "শেখ মুজিবকে নির্বাসিত করা বা তাকে জেলে পাঠানো সম্ভব ছিল না। কারণ তিনি খুবই ধূর্ত এবং ক্ষমতাধর ছিলেন। তাকে হত্যা করাই ছিল একমাত্র উপায়।"

মুজিব এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাকে নির্বাসিত বা কারাবন্দি করা সম্ভব ছিল না। তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর একমাত্র উপায় ছিল তাঁকে হত্যা করা।

খুব অল্প লোকই মোস্তাকের সহযোগীদের গল্প বিশ্বাস করেছিলেন, অনেকেই বিশ্বাস করেন ১৩ বা ১৪ আগস্টে যে ভারতীয় হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছিল তা মূলত শেখ মুজিবকে উদ্ধার করার মিশন নিয়ে আসছিল।

ভারতীয় হেলিকপ্টার নিয়ে কোন রহস্য ছিল না। কিছু কিছু ভারতীয় হেলিকপ্টার সত্যিই পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারী করত। ১৪ আগস্ট তারিখে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার প্রেসনোট শেখ মুজিব অনুমোদন করেছিলেন, যা পরদিন পাঠানোর কথা ছিল।

ভারতেও অনেকে বিশ্বাস করেন যে ঐ হেলিকপ্টারটি উদ্ধার করার জন্যই পাঠানো হয়েছিল।

হেলিকপ্টারটি বিধ্বস্ত হয়েছিল অভ্যুত্থানের একদিন আগে, তারপরও শেখ মুজিব 'উদ্ধার তৎপরতা' সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। যে সেনাসদস্যরা ১৫ আগস্ট ভোরে মুজিবের বাড়ি ঘেরাও করেছিল তারা তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে যায়।

আর বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত সমর সেন সে সময় ছিলেন দিল্লীতে।

মুজিবের শেষ বার্তা ছিল স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ফখরুদ্দিন আলি আহমেদ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে পাঠানো বাণী।

তাহের উদ্দীন ঠাকুরের প্রেস ব্রিফিংয়ের জন্য ১৬ আগস্ট সাংবাদিকরা বঙ্গভবনে অপেক্ষা করছিলেন। দু'জন মেজর উত্তেজিত হয়ে হাঁটাহাঁটি করছিলেন। তাহের ক্রাচে ভর দিয়ে চলাফেরা করছিলেন। হুদা আত্মনিমগ্ন হয়ে একা একা হাঁটছিলেন। কেউ তাকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তিনি অন্যমনস্ক থেকেই জবাব দিচ্ছিলেন। ফারুক সাংবাদিকদের দিকে এগিয়ে গিয়ে বললেন "বন্ধুরা আমি কি আপনাদের জন্য কিছু করতে পারি?"

এরকম মিষ্টি সুরেই কি এই লোকটি হত্যাযজ্ঞের পরিকল্পনা করেছিলেন? অবাক হয়ে এ কথাই ভাবছিলেন এক সাংবাদিক।

মুজিবের মৃত্যু সংবাদে ভারতে শোক নেমে আসে। কেউ কেউ হয়ত ভাবছিলেন মুজিব নিজেই এর জন্য দায়ী, কিন্তু বেশির ভাগই মুজিব ও তার পরিবারের মৃত্যুতে শোকাহত ছিলেন। তিনি একজন মহৎ দেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে প্রশংসিত ছিলেন।

ভারত সরকারের একজন মুখপাত্র শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন। তিনি বলেন "আমাদের সময়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম হওয়ায় আমরা তাকে সব সময়ই সম্মান করে এসেছি।" এই অভ্যুত্থান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও 'প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রভাব' ভারতেও পড়বে।

যুগোস্লাভিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী তার বার্তায় বলেন "যুগোস্লাভিয়ার সর্বস্তরের মানুষ বাঙালীর অবিসংবাদিত নেতার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাচ্ছে। তার মৃত্যুতে বিশ্ব একজন জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতাকে হারালো; আর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন হারালো জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে।"

মুজিব হত্যার ঘটনায় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আব্দুল রাজ্জাক শোকাহত হন। কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শেখ সালাহও শোক প্রকাশ করেন ।

শেখ মুজিবের প্রগতিশীল অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছুড়ে ফেলায় নিউইয়র্ক টাইমস গভীর দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে। কিন্তু মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে অসাম্প্রদায়িকতা হল ধর্মদ্রোহীতার নিকৃষ্ট উদাহরণ। করাচি থেকে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় পাঠানো খবরে এস. আর. গৌরি লেখেন "মুজিব বাংলাদেশকে ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে পাকিস্তানের জনগণকে হতাশ করেছেন।"

লন্ডনের টাইমস পত্রিকা যা কুখ্যাত ছিল উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়নের জন্য সেনা শাসনকে সমাধান হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য; লিখেছিল "সেনাশাসন দেশটির জন্য প্রয়োজনীয় এবং ফলদায়ক; এর ফলে দেশে নিরস্ত্রীকরণ ঘটবে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ঝুঁকিও কমবে।" গার্ডিয়ানের কূটনৈতিক সংবাদদাতা আশা প্রকাশ করেন যে নতুন সরকার মুজিবের সাম্প্রতিক 'বামপন্থীনীতি' গুলো থেকে সরে আসবে।

সুদানের রাষ্ট্রপতি গাফ্ফার নামিরি ১৬ আগস্ট চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে রিয়াদ আসেন। একই দিনে সৌদি আরব ও সুদান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
সৌদি আরবের রাজা খালেদ মোস্তাকের প্রতি বার্তায় বলেন "আমার প্রিয় ভাই, আমি আমার নিজের ও সমগ্র সৌদি আরবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতা গ্রহণ উপলক্ষে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন। স্রষ্টার কাছে আমাদের প্রার্থনা থাকবে আপনি যেন আপনার গৃহীত উদ্যোগে সাফল্য অর্জন করেন এবং ইসলামের স্বার্থ রক্ষার্থে এবং বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করে যেতে পারেন।"

সৌদী আরবের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বশর্ত ছিল দেশটিকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা। স্বাধীনতা যুদ্ধের চেতনাকে ছুড়ে না ফেলে বাংলাদেশের পক্ষে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়া সম্ভব ছিল না। মুজিব ভাবতেই পারতেন না যে কেউ তাঁকে বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করার প্রস্তাব দিতে পারে।

ভুট্টো ১৯৭৫ সালের ১৮ এপ্রিল কাবুলে পাকিস্তান মিলিটারি একাডেমীতে তার ভাষণে বলেন, "১৯৭২ সালে আমি সিমলায় গিয়েছিলাম কারণ তখন আমাদের শান্তি দরকার ছিল। কিন্তু এখন পাকিস্তানের চেয়ে ভারতেরই বেশি শান্তি দরকার। পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্বাভাবিক রাখা এখন ভারত ও বাংলাদেশের নিজেদের স্বার্থের জন্যই দরকার।" তিনি আরও বলেন, "শিগগিরই এ অঞ্চলে কিছু বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটতে যাচ্ছে।" ভুট্টো ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশে সেনা অভ্যুত্থানের ইঙ্গিত এখানে দিয়েছিলেন ভাবলে সেটা হয়তো একটু বেশিই দূরদর্শিতা হয়ে যাবে, তবুও অনেকেই এমন দাবি করেছেন। যাই হোক তিনি শুধু ভুট্টো সরকারকে খুব দ্রুত স্বীকৃতি দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং এ সরকারকে শক্তিশালী করতে তার পক্ষে যা করা সম্ভব তার সবই করেছেন।

১৯৭৪ সালের জুন মাসে ভুট্টোর ঢাকা সফরে যে ১০৭ সদস্য বিশিষ্ট দল আসে তার মধ্যে থাকা এক সাংবাদিক সফর শেষে করাচীর 'ডেইলী নিউজ' পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদলের সম্ভাবনার কথা লিখেন। তার কাছে এ সম্ভাবনাকে চমৎকার মনে হয়েছিল। কেউ ভাবতে পারেন একজন পাকিস্তানির পক্ষে হয়ত সেনা অভ্যুত্থান ছাড়া ক্ষমতার পালা বদলের অন্য কোন উপায় ভাবা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক ঘটনায় যারা এক ধরণের অসুস্থ আনন্দ পেয়েছিলেন এমন অনেক পাকিস্তানিই সেটি লুকিয়ে রাখতে পারেননি। পাকিস্তানিদের মধ্যে যারা তখনও ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে পাক সেনার আত্মসমর্পণের অপমান ভুলতে পারেননি তারা ভাবছিলেন এ রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেয়া হয়েছে।

কিছু কিছু পাকিস্তানি সংবাদপত্র শেখ মুজিবকে একজন 'বিশ্বাসঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তার মর্মান্তিক মৃত্যুকে বলে 'পাপের শাস্তি'।

জেড. এ. সুলেরী'র মত পাকিস্তানের তখনকার শীর্ষ পর্যায়ের সকলেই পাকিস্তানকে ভেঙ্গে দুই টুকরা করার জন্য দায়ী বিশ্বাসঘাতক মুজিবের মৃত্যুতে সন্তুষ্ট ছিলেন। লাহোরের একটি দৈনিকে তিনি মত প্রকাশ করেন যে 'যতোক্ষণ মুজিব জীবিত থাকবেন' ততোক্ষণ পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক হবে না। তার মতে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির আগেই বিনাশর্তে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়াটা ছিল একটি ভুল। পাঞ্জাব শেখ মুজিবের বিনাশর্তে মুক্তি মেনে নিতে পারেনি।

সুলেরী'র মতে শেখ মুজিব না থাকলে বাংলাদেশ কোনদিন দাঁড়াতে পারতো না।

হংকংভিত্তিক ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ-এর ইসলামাবাদ প্রতিনিধি সালামাত আলী বলেন, "মুজিবের পক্ষে ভারতীয় চাপ মোকাবেলার লক্ষ্যে পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি মনে করতেন এর ফলে দেশের মধ্যে থাকা পাকিস্তানপন্থীরা উৎসাহিত হবে এবং তার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে যাবে।"

মোস্তাক এমনটি ছিলেন না।

বাংলাদেশের ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার ঘোষণার পরে আর কোন পরিবর্তন আসেনি। ঢাকাকে তার অবস্থান পরিষ্কার করার জন্য ইসলামাবাদ চাপ দিতে থাকে। সাপ্তাহিক ছুটির দিনে দুই রাজধানীর মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে বার্তা আদান-প্রদান ঘটে। ধারণা করা যায় ঢাকা থেকে যে ব্যাখ্যা আর নিশ্চয়তা দেয়া হয় তাতে ইসলামাবাদ সন্তুষ্ট হয়েছিল।

মোস্তাকের হাত শক্তিশালী করা প্রয়োজনীয় ছিল। যদিও তিনি প্রথমে বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করার ঘোষণা দিয়ে পিছিয়ে আসেন, তারপরও তিনিই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের সম্পর্ক উষ্ণতর করতে পারবেন বলে ভাবা হচ্ছিল। কি হতো যদি মোস্তাক ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল সভা, যে সভায় দলের নাম থেকে "মুসলিম" শব্দটি বাদ দেয়ার সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সে সভা, ত্যাগ করে বেরিয়ে না যেতেন। এর ১৬ বছর পর ১৯৭১ সালে যখন তার সংগ্রামী সতীর্থরা দেশের স্বাধীনতা ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারছিলেন না, তখন এই মোস্তাক পাকিস্তানের সাথে আলাপের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের চেষ্টা করছিলেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার প্রথম ভাষণেই তিনি 'জয় বাংলা' স্লোগানটি বাদ দেন।

মুস্তাক আহমেদ নামের একজন শীর্ষ পাকিস্তানি সাংবাদিক বলেন, "বাংলাদেশ নিজেকে ইসলামিক রাষ্ট্র ঘোষণা করুক বা না করুক, দেশটি ইসলামিক বলয়ের মধ্যেই থাকবে।" তিনি আরও যোগ করেন, "মোস্তাকের চিন্তায় পাকিস্তানের নামই সবার আগে আসা উচিৎ।"

দেশটি তখন যেন 'মুসলিম বাংলা' হয়ে গিয়েছে। এই শব্দটির কথা ভাবায় অনেক পাকিস্তানিই ভুট্টোর প্রশংসা করেন।

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের জামায়াতে ইসলামীর প্রধান অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের নতুন সরকারকে সমর্থন দেয়ার জন্য সকল মুসলিম দেশকে অনুরোধ করেন।

ঢাকা স্বাধীন হওয়ার ঠিক আগে আগে বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য দায়ী যে আল-বদর বাহিনী, সে বাহিনীর সদস্যদের জামায়াতে ইসলামী থেকে বেছে নেয়া হয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই জামায়াতে ইসলামী নামের দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

ভুট্টোকে তার কর্মকাণ্ডের জন্য ভূঁয়সী প্রশংসা করে খাজা খায়েরুদ্দীন বলেন, "এটি যেন মাত্র শুরু হয়। আল্লাহ যেন বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে দেশটিকে ইসলামী শাসনের উজ্জ্বল উদাহরণ করার মত ক্ষমতা খোন্দকার মোস্তাক আহমেদকে দেন।"

মুক্তিযোদ্ধাদের মোকাবেলা করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের এ দেশীয় দোসররা যে শান্তি কমিটি করে তার কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ছিলেন এই খাজা খায়েরুদ্দীন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর খাজা খায়েরুদ্দীনকে শেখ মুজিব একটি পাসপোর্ট দেন যাতে করে তিনি লন্ডনের উদ্দেশে যাত্রা করতে পারেন। কিন্তু খায়েরুদ্দীনের গন্তব্য সংগত কারণেই ছিল ইসলামাবাদ, কিন্তু মুজিবের পক্ষে একজন পুরোনো বন্ধুর করা অনুরোধ না রেখে থাকা সম্ভব ছিল না।

কট্টর ডানপন্থী এমন পাকিস্তানি রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিকরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে নিয়ে একত্রে একটি 'কনফেডারেশন' গঠন করার সম্ভাবনাটিকে একেবারে উড়িয়ে দেননি।

এর পাশাপাশি এমন অনেক পাকিস্তানিও ছিলেন যারা শেখ মুজিবের মৃত্যুতে শোকাহত ছিলেন।

করাচী থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আল ফাত্তাহ-এর সম্পাদক ওয়াহাব সিদ্দিকী বলেন, "তিনি (মুজিব) তার দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু হায় তার নিজের লোকেরাই তাঁকে হত্যা করল। তাঁকে হত্যা করা ছাড়া নতুন সরকারের আর কোন উপায় ছিল না কারণ তিনি এতটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তাকে জেলে বা নির্বাসনে পাঠালে জনরোষের কারণে সরকারকে বিপদে পড়তে হত।"

এ বক্তব্য এমন একটি সাপ্তাহিকের পক্ষ থেকে এসেছিল যেটি ছিল চীনপন্থী এবং এটি ভুট্টোকে সমর্থন দিয়েছিল।

অনেকেই এই অভ্যুত্থানের পেছনে সিআইএর হাত ছিল বলে সন্দেহ করেছিলেন এবং এ ঘটনার সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করার যোগসূত্র স্থাপন করেছিলেন। ওয়াহাব সিদ্দিকী আরও এগিয়ে গিয়ে মতামত দেন, "বর্তমানে যা ঘটেছে তা সিআইএ ১৯৬৯ সাল থেকে যে পরিকল্পনা করে আসছে তার ধারাবাহিকতা ছাড়া কিছু নয়।"

রেডিওতে প্রচারিত অভ্যুত্থানের প্রথম ঘোষণায় খন্দকার মোস্তাকের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করেছে বলা হলেও, মোস্তাক চাইছিলেন প্রমাণ করতে যে সেনাবাহিনীই স্বপ্রণোদিত হয়ে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে। ১৫ আগস্টে তার ভাষণে মোস্তাক বলেন 'সেনাবাহিনীকে বাধ্য হয়েই ক্ষমতা দখল করতে হয়েছে।' কিন্তু মাত্র ৬ জন নিম্ন পর্যায়ের সেনা কর্মকর্তা যাদের মধ্যে অনেকেই তখন আর সেনাবাহিনীতে নেই আর দুই থেকে তিনশ সেনা সদস্য এই অভ্যুত্থানটি ঘটিয়ে ছিলেন। সৈনিকদের মধ্যে অল্প কয়েক জনই শুধু শেখ মুজিবকে হত্যা করার পরিকল্পনার কথা জানতেন। এবং মেজররা নিজেদের যাই ভেবে থাকুন না কেন, প্রকৃত অর্থে তারা ছিলেন ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহযোগী মাত্র।

অভ্যুত্থানের ফলে খুব ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর মুখোশ উন্মোচিত হয়ে গিয়েছিল, যাদের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল ক্ষমতা কুক্ষিগত করা। মোস্তাক ছিলেন ধূর্ত, আর মেজররা ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও রোমাঞ্চপ্রবণ তরুণ। তাদের কোন রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল না এবং তারা জানতেন যে তাদের পক্ষে বৃহত্তর জনতার সমর্থন আদায় করা সম্ভব ছিল না। তারপরও মোস্তাককে একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ জনপ্রিয় নেতা এবং অভ্যুত্থানকারী মেজরদের আদর্শবাদী তরুণ হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা হয়েছিল।

জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৭ আগস্ট তার প্রিজন ডায়রীতে লিখেন যখন মোস্তাক ভারতে এসেছিলেন তাকে 'অন্যান্য নেতাদের মতোই মুজিবের অনুরাগী ভক্ত' মনে হয়েছিল। কিন্তু জয়প্রকাশের বিশেষ সহযোগী এ. সি. সেন বাংলাদেশ থেকে যখন ভারতে ফেরত যান তখন জয়প্রকাশকে জানান যে 'মোস্তাক এখন মুজিবের থেকে দূরে সরে গেছেন' এবং 'এ মুহূর্তে আওয়ামীলীগে সর্বোপরি সারাদেশে মুজিবের নেতৃত্বকে হুমকির মুখে ফেলার মত যদি কেউ থাকে, তবে সেটা মোস্তাক।'

জয়প্রকাশ আরও লেখেন, "কে জানত মোস্তাক এমন নির্মম প্রক্রিয়ায় মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করবেন এবং সফলতা লাভ করবেন?" প্রকৃত অর্থে এটি কোন চ্যালেঞ্জ ছিল না- বরং এটি ছিল একটি চক্রান্ত।

জয়প্রকাশ এরপর লিখেন, "শেষ কথা এটাই: মোস্তাক সম্পর্কে আমার মনে দুইটি ধারণা তৈরি হয়েছিল, তাকে অন্যদের তুলনায় বেশি পশ্চিমাপন্থী আর একটু বেশি মুসলিম চেতনার অধিকারী মনে হয়েছিল।" জয় প্রকাশ আসলে ভদ্রতা করেই একটু কমিয়ে বলছিলেন।

এ. সি. সেন ঢাকায় অবস্থান কালে মোস্তাকের লোকজনের সাথেই বেশি সময় কাটিয়েছিলেন এবং মোস্তাকের সাথে তার উষ্ণ সম্পর্ক ছিল, তারপরও মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার যোগ্যতা মোস্তাকের ছিল এটা ভাবাটা তার পক্ষে নির্বুদ্ধিতা ছিল। এটা কি ইচ্ছা প্রসুত কল্পনা ছিল না কি সেন ইচ্ছাকৃতভাবেই জয়প্রকাশকে ভুল পথে চালিত করছিলেন।

কর্নেল তাহের তার বক্তব্যে সঠিক কথাটি বলেছেন, "এটা স্পষ্ট ছিল জনগণের মধ্যে মোস্তাকের কোন ভিত্তিই ছিল না। সেনাবাহিনীর একটি ক্ষুদ্র অংশ বাদে পুরো সেনাবাহিনীতে তার কোন সমর্থক ছিল না, ঠিক যেমন জনগণের মধ্যেও তার জন্য কোন সমর্থন ছিল না।"

পুরো দেশ তো দূরের কথা, মোস্তাক তার নিজের নির্বাচনী এলাকাতেও জনপ্রিয় ছিলেন না। ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি অল্পের জন্য হারেননি। তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর তার যে জীবনবৃত্তান্ত সরকার প্রকাশ করে তা ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তার ভয়াবহ ফলের লজ্জা কিছুটা ঢেকে দেয়। ঐ জীবন বৃত্তান্তে লেখা হয় "১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে মোস্তাক কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি-হোমনা নির্বাচনি এলাকা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হন এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের একজন সাবেক মন্ত্রী ঐ নির্বাচনে তার জামানত হারান।" কিন্তু ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের বিষয়ে জীবন বৃত্তান্তে শুধু মোস্তাকের পুনর্বার নির্বাচিত হওয়ার কথাটাই লেখা হয়।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে ৩০০ সংসদীয় এলাকার মধ্যে ২৯১টি তে শতকরা ৭২ ভাগের বেশি ভোট পেয়ে আওয়ামী লীগ জয় লাভ করে। এর মধ্যেও মোস্তাক মাত্র ৭০০ ভোটের ব্যবধানে জয় পান।

পরাজয়ের ভয়ে তিনি মুজিবকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে নির্বাচনের আগে তার নির্বাচনি এলাকা সফর না করালে হয়তো তিনি নির্বাচনে হেরেই যেতেন।

যখন মুজিবকে একজন বন্ধু জিজ্ঞেস করেছিলেন, "মোস্তাককে নির্বাচনে জেতাতে সাহায্য করা কি আপনার জন্য খুব জরুরী ছিল?" তখন জবাবে একটু হেসে মুজিব বলেছিলেন, "সে আমার একজন পুরোনো সহকর্মী।"

মোস্তাকের নির্বাচনী জয়ে সাহায্য করতে পেরে মুজিব নিজের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। কিন্তু মোস্তাক মুজিবের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত ছিলেন, এবং তিনি যে অল্পের জন্য নির্বাচনে হারেননি তা নিয়েও তার ক্ষোভ ছিল। খুব কাছের বন্ধুদের সাথে আলাপকালে মোস্তাক প্রায়ই ক্ষোভের সাথে বলতেন, "এত জনপ্রিয় হওয়ার মত এমন কি করেছেন শেখ মুজিব? আমিও তো আওয়ামী লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি সাত বছর কারাবন্দীও ছিলাম।"

ক্ষমতার সাথে সাথে নতুন নতুন বন্ধু আর ভক্ত জুটে যায়, কিন্তু মোস্তাকের খুব কম বন্ধু আর ভক্ত ছিল, এমন কি তিনি রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও পরিস্থিতি খুব বদলায়নি। মোস্তাক ক্ষমতা গ্রহণের এক সপ্তাহ পর একজন মধ্যবয়স্ক লোক দাউদকান্দি সেতুর কাছে মোস্তাকের প্রশংসা করার ভুল করে বসেন। সাথে সাথেই কিছু তরুণ তার উপর চড়াও হন। এটা মোস্তাকের নিজের নির্বাচনী এলাকা ছিল, কিন্তু তার পক্ষে কথা বলার মত লোক সেখানে কেউ ছিল না । মধ্যবয়স্ক ঐ লোকটি কোন মতে ক্ষমা প্রার্থনা করে পাড় পেয়ে যান।

যে মেজররা বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়েছিলেন তাদের হাবভাব এমন ছিল যেন তারা পাকিস্তানের সামরিক জান্তার উত্তরাধিকারী। তারা ক্ষমতার দম্ভে উন্মত্ত আচরণ করছিলেন আর সবার কাছেই বিরক্তিকর হয়ে উঠছিলেন। তারা তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং আরও কয়েকজন মন্ত্রীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন, যাদেরকেই তাদের অপছন্দ হচ্ছিল তাদের গ্রেফতার করছিলেন, কিছু কিছু ব্যবসায়ীর কাছ থেকে বলপ্রয়োগ করে অর্থ আদায় করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এমন কি রাষ্ট্রপতির আদেশও লঙ্ঘন করছিলেন। তারপরও এই মেজরদের মনে হচ্ছিল তাদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তারা বাকিদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যকার বিভেদ তাদের সেই অনুভূতিকে চাপা দিচ্ছিল। এসব হতাশা থেকে এই মেজরদের মধ্যে কেউ কেউ প্রায়ই লাথি দিয়ে রাষ্ট্রপতি মোস্তাকের কক্ষে ঢুকে পড়ে তার সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়ছিলেন। তারা আরও রাজনীতিবিদকে হত্যার হুমকি দিচ্ছিলেন। জনরোষের কথা ভেবে মোস্তাক তাদের নিবৃত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাদের রক্ত পিপাসা তখন বেড়ে গিয়েছে, ক্ষুব্ধভাবে অফিসারদের মধ্যে একজন বলে উঠেছিলেন, "আমরা

যদি মুজিবকে হত্যা করতে পারি, তবে অন্য যে কাউকেই হত্যা করা আমাদের দ্বারা সম্ভব। তার বক্তব্যের ইঙ্গিতটি স্পষ্ট ছিল। কিন্তু রাষ্ট্রপতির ছত্রছায়ায় না থাকলে এই মেজরদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার ঝুঁকি ছিল, অন্যদিকে এই মেজরদের ছাড়া মোস্তাকও অসহায় হয়ে পড়তেন। কাজেই ভাল লাগুক বা না লাগুক মোস্তাক আর মেজরদের নিরুপায় হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতেই হয়েছিল।

একদিকে মোস্তাক সেনা অফিসারদের শান্ত রাখার চেষ্টা করছিলেন, অন্যদিকে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। রাজনীতিবিদদের সাথে আলোচনায় তিনি দাবি করতেন যে তিনি না থাকলে সেনাবাহিনী সম্পূর্ণভাবেই ক্ষমতা দখল করে নিত।

অভ্যুত্থানের কয়েকদিন পর মোস্তাক ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এর মোজাফফর আহমদকে বলেছিলেন, "যখন আমরা রেডিও স্টেশনে ছিলাম তখন মেজররা আমাকে বারবার বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করার জন্য চাপ দিচ্ছিল। আমি তাদের বলেছিলাম, "বাবা, এতো তাড়াহুড়ো করা যাবে না। এই এখন এখানে বসেও আমি দেখতে পাচ্ছি আওয়ামী লীগের সমর্থকদের একটি মিছিল আমাদের দিকে অর্থাৎ রেডিও স্টেশনের দিকে এগিয়ে আসছে।"

বাংলাদেশকে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হবার আশঙ্কা না থাকলে মোস্তাক হয়তো ঘোষণাটি দিয়েই ফেলতেন। তার কোন জনসমর্থন ছিল না, সেনাবাহিনীর একটা খুব ছোট অংশ শুধু তার সাথে ছিল। তাকে আগে ক্ষমতায় ঠিকমত বসতে হবে, তিনি ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।

আওয়ামী লীগের সাংসদদের সাথে আলোচনার সময় মোস্তাক শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' বলে সম্বোধন করছিলেন। তিনি বলেন যখন পরিবারের কর্তাব্যক্তির মৃত্যু হয়, তখন পরিবারের সদস্যরা শোকগ্রস্ত থাকেন, কিন্তু তাদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বগুলোও পালন করে যেতে হয়। তিনি বঙ্গবন্ধুর জন্য শোকাহত ছিলেন, কিন্তু দেশ পরিচালনার গুরু দায়িত্বগুলোও তাকে পালন করে যেতে হচ্ছে বলে মোস্তাক দাবি করছিলেন। মেজররা তাকে সংসদ বিলুপ্ত করার জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। এতোদিন তিনি তাদেরকে দমিয়ে রাখতে পারলেও, তার দলীয় সতীর্থরা তাকে সহায়তা না করলে তার পক্ষে এটা আর বেশি দিন চালিয়ে নেয়া সম্ভব ছিল না।

আওয়ামী লীগের অধিকাংশ সাংসদই মোস্তাকের এই সহায়তা প্রত্যাশাকে ঘৃণার চোখে দেখেছিলেন। যখন তাদের সমর্থন পেতে মোস্তাক ব্যর্থ হলেন তখন তিনি অন্যদের দারস্থ হন যাতে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করা যায়।

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদনা পর্ষদের সভাপতি মইনুল হোসেন হঠাৎ আবিষ্কার করেন যে তার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। রাজনৈতিকভাবে মোস্তাকের অনেক

কাছের লোক হওয়ায় এ সময় পর্দার আড়ালে থেকে মোস্তাকের জন্য সমর্থন আদায়ের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন।

স্বাভাবিক কারণেই সবাই জানতো, নতুন সরকার সব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে তাদের পছন্দের লোক বসাবে। শফিউল আযমকে বিশেষভাবে সন্তুষ্ট করতে সেক্রেটারি জেনারেল পদ দেয়া হয়, এবং মাহবুবুল আলম চাষীকে রাষ্ট্রপতির প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়। তবারক হোসেনকে নতুন সরকারের পররাষ্ট্র সচিব করা হয়। এই তিনজনই পাকিস্তানপন্থী ছিলেন এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে নানাভাবে পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছিলেন। নতুন সরকারের চরিত্রটা এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পাকিস্তানের পক্ষ থেকেও নিশ্চয়ই এ উদ্যোগগুলো লক্ষ করা হয়েছিল।

১৯৭১ সালের দুর্ভাগ্যজনক সেই মার্চ মাসে শফিউল আযম ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব। এই পদে তিনিই প্রথম বাঙালী ছিলেন না যেমনটি অনেক সাংবাদিক ধারণা করে থাকেন। এর দশ বছর আগে আইয়ুব খানের সেনা শাসনামলে কাজী আনোয়ারুল হক, যিনি আই পি এস ক্যাডার থেকে এসেছিলেন তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। হক একজন ভদ্র ও রুচিশীল ব্যক্তি ছিলেন, যার সঙ্গীত ও সাহিত্যপ্রীতি সবার জানা ছিল। যাই হোক পাকিস্তানি সেনা গোয়েন্দারা বিশ্বাস করে না এমন কোন বাঙালীকেই কখনো পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব করা হয়নি।
এই কাজী আনোয়ারুল হক ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর আবার দৃশ্যপটে হাজির হন, প্রথমে সেনা সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে এবং পরে একজন মন্ত্রী হিসেবে।

১৯৭১ সালের মার্চের ২ তারিখে যখন মুজিব অসহযোগের ডাক দেন তখন প্রায় সর্বস্তর থেকেই সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। সরকারী কর্মকর্তারা মুজিবকে সমর্থন দিয়েছিলেন, এমন কি ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে শপথ পাঠ করাতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু শফিউল আযম তার পদ আকড়ে ছিলেন, এমনকি ২৫ ও ২৬ মার্চে গণহত্যার পরও বেশ কিছু সময় তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

শামসুদ্দীন নামের একজন তরুণ সিএসপি অফিসার ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে সিরাজগঞ্জে উপবিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। পাকবাহিনী যখন সিরাজগঞ্জ দখল করে তখন এই তরুণ জাতীয়তাবাদী সিরাজগঞ্জবাসীকে সাথে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। শফিউল আযম বৈবাহিক সম্পর্কে এই শামসুদ্দীনের আত্মীয় ছিলেন; তিনি শামসুদ্দীনকে ঢাকায় আসতে সম্মত করান এবং তাকে সেনা কর্তৃপক্ষের কাছে নিয়ে যান।
শফিউল আযম তার বন্ধু জেনারেল রাও ফরমান আলী তাকে শামসুদ্দীনের কোন

ক্ষতি না করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা বিশ্বাস করেছিলেন। কিন্তু মিষ্টভাষী ফরমান আলী রূঢ়ভাষী 'ব্যাঘ্র' জেনারেল নিয়াজীর চেয়েও ভয়ঙ্কর লোক ছিলেন।

শামসুদ্দীনকে প্রচণ্ড অত্যাচার করে হত্যা করা হয়, এবং এমন কি কবর দেয়ার জন্য তার লাশটিও তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়নি।

এ ঘটনায় শফিউল আযম যদি মর্মাহত হয়েও থাকেন, তা তিনি প্রকাশ করেননি। তিনি তার দায়িত্ব পালন করেছেন বলে ভেবেছেন এবং এর ফলে পাকিস্তানি সরকারকে তার সেবা দেয়ার যে ইতিহাস তা থেকে একটি কলঙ্ক মুছে গেল বলে ভেবেছিলেন।

পরে শফিউল আযমকে পাকিস্তানে বদলী করা হয়। এটা তার জন্য ভালোই হয়েছিল, কারণ ঢাকায় থাকলে তাকে নিরন্তর মৃত্যুভয়ের মধ্যে বেঁচে থাকতে হত এবং হয়তো পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক গভর্নর মোনেম খানের মত তাকেও মুক্তিবাহিনী হত্যা করত।

১৯৭৩ সালে শফিউল আযম বাংলাদেশে ফিরে আসেন। অনেকেই তার পক্ষে সাফাই গেয়েছিলেন, তারা তার একাডেমিক সাফল্য আর প্রশাসনিক কাজে দক্ষতার উপর বিশেষভাবে জোড় দিয়েছিলেন। কিন্তু মুজিব তাকে মেনে নিতে পারেননি।

মাহবুবুল আলম চাষী একজন বেশ রুচিশীল এবং মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব ছিলেন। শফিউল আযমের সাথে তার পার্থক্য ছিল যে তিনি সহজেই লোকের সাথে মিশতে পারতেন। পঞ্চাশের দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানি দূতাবাসে কর্মরত থাকা অবস্থায় মার্কিন প্রশাসন ও একাডেমিক বলয়ে যেসব লোকের সাথে তার পরিচয় হয়েছিল তিনি তাদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন।

তিনি ১৯৬৭ সালে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে অব্যাহতি নেন এবং কৃষি কাজে নিয়োজিত হন। তিনি কূটনীতিক হিসেবে তার প্রতিশ্রুতিশীল ক্যারিয়ার ফেলে চাষাবাদে মন দিচ্ছিলেন। অনেকে তাকে একজন আদর্শবাদী লোক ভাবতেন, অনেকে তার এ কাজকে পাগলামী মনে করছিলেন। কিন্তু সত্য ছিল এটাই যে তাকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের পর পর জেনারেল আইয়ুব খান যে নীতি নিয়েছিলেন যেটাকে পাকিস্তানি প্রচারকরা 'একটি নিরপেক্ষ নীতি' বলতে ভালবাসতেন, সেই নীতি বাস্তবায়নের জন্য এই অত্যন্ত মার্কিনপন্থী কূটনীতিককে বহাল রাখা সমস্যাকর মনে করছিল তখনকার সরকার। মাহবুবুল আলমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ থাকলেও সে সময়কার পররাষ্ট্র সচিব আজিজ আহমদ খানের বদান্যতায় সে অভিযোগগুলো তদন্ত হয়নি (ঘটনাচক্রে ১৯৭৫

সালের আগস্টে যখন অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তখন আজিজ আহমেদ পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন)।

সারাবিশ্বে যখন 'সবুজ বিপ্লব'কে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সকল সমস্যার সহজ সমাধান হিসেবে প্রচারণা চালানো হচ্ছিল সে সময়টাতে মাহবুবুল আলম কৃষিকাজ শুরু করেন। আন্তর্জাতিক মহল থেকে তিনি বিভিন্ন সুবিধা পেয়েছিলেন এ কারণে।

'চাষী' বলতে বোঝায় এমন ব্যক্তি যিনি তার নিজের অথবা অন্যের কাছ থেকে বর্গা নেয়া ক্ষুদ্র এক খণ্ড জমিতে কৃষিকাজ করেন। মাহবুবুল আলম ছিলেন একজন ভদ্রলোক কৃষক, কিন্তু পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য এই জায়গায় যে এখানে বিত্তশালী হলে সেটা রাজনীতি করার জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। এখানকার সব রাজনৈতিক নেতারাই হয় মধ্যবিত্ত অথবা কৃষক পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে যথেষ্ট ভালো জানতেন বলেই নিজেকে একজন চাষী হিসেবে উপস্থাপন করছিলেন। প্রথমদিকে তার বন্ধুরা তাকে কৃষক হিসেবে অবজ্ঞার চোখে দেখলেও, তিনি তার নতুন ভূমিকায় এত ভালভাবে মানিয়ে নিয়েছিলেন যে ক্রমে সবাই তাকে মাহবুবুল আলম চাষী নামে ডাকতে লাগল।

১৯৭১ সালের ২৫ ও ২৬ মার্চে পাক বাহিনী যখন বাঙালীর উপর চড়াও হল তখন মাহবুবুল আলম সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি কয়েকদিনের জন্য কৃষিকাজ বন্ধ রাখবেন। তিনি বুঝেছিলেন ঐ সময়টাতে তিনি তার কূটনৈতিক দক্ষতা ও যোগাযোগগুলো কাজে লাগাতে পারবেন। শফিউল আযম যখন পূর্ব পাকিস্তানে তার পদ আঁকড়ে থাকলেন, সে সময়টাতে মাহবুবুল আলম সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে গেলেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে তাদের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না।

১৯৭১ সালের এপ্রিলে যখন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠিত হল তখন মোস্তাক বেশ নির্লিপ্তভাবেই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব নেন, কারণ তিনি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেন যে পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে তিনি কিছু বিশেষ সুবিধা পেতে পারেন। মাহবুবুল আলম চাষী ছিলেন তখন পররাষ্ট্র সচিব। মোস্তাক ও মাহবুবুল আলম চাষীর জুটিটি হয়েছিল চমৎকার।

মোস্তাক তার সহযোদ্ধাদের না জানিয়ে পাকিস্তান সরকারের সাথে আঁতাত করতে অধীর ছিলেন, আর মার্কিন সরকারও তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা রুখে দিতে চাইছিল; এই দুয়ের মধ্যে একজন আদর্শ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করছিলেন মাহবুবুল আলম চাষী।

মুক্তিযুদ্ধ যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন তাদের চক্রান্ত ফাঁস হয়ে যায়। মাহবুবুল আলম চাষীকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। মোস্তাক তখনও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু তাকে ক্ষমতাহীন করে রাখা হয়েছিল।

ষড়যন্ত্রকারী ও তাদের সহযোগীদের জন্য এটি ছিল একটা বিশাল আঘাত। তারা তখন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

১৯৫৮ এর অক্টোবরে যখন আইয়ুব খান সেনা শাসন জারি করেন তখন পাকিস্তানের আমলারা বেশ বিপদে পড়ে যান, কিন্তু আমলাদের সহযোগিতা আইয়ুব খানের প্রয়োজন ছিল এবং খুব দ্রুতই আমলারা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হয়ে উঠলেন।

বাংলাদেশে যারা অভ্যুত্থান সংঘটিত করেছিল তাদের কোন ক্ষমতার ভিত্তি ছিল না এবং তাদের কর্তৃত্বকে কেউ সরাসরি চ্যালেঞ্জ না করলেও সেটি প্রশ্নের সম্মুখীন ছিল; ফলে তাদের আমলাতন্ত্রের উপর অনেকখানি নির্ভর করতে হচ্ছিল।

নতুন সরকার সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতেও নিজেদের পছন্দের লোক বসাচ্ছিল। অক্টোবরের ২৪ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়, এবং মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর জায়গায় মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান করা হয়।

আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে ওসমানী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে তিনি বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতি ছিলেন এবং মুজিব সরকারের একজন মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যখন দেশে শুধু একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকবে এমন সিদ্ধান্ত সংসদে নেয়া হয় তখন তিনি সংসদ সদস্যের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। কারও পরামর্শে নয়, এটি তিনি করেছিলেন নিজ দায়িত্বেই। তিনি একজন দৃঢ়চেতা এবং সৎ ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু রাজনীতির ময়দানে তিনি এতটাই অদূরদর্শী ছিলেন যে তার কারণে তার বন্ধুদের মাঝে মাঝেই লজ্জায় পড়তে হত।

তার ন্যূনতম বিবেচনাবোধ থাকলে তিনি বুঝতে পারতেন যে ষড়যন্ত্রকারীরা শুধু তার নামটিই ব্যবহার করতে চাইছে এবং তিনি তাদের প্রস্তাবিত পদটি গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতেন। রাষ্ট্রপতির প্রতিরক্ষা উপদেষ্টার পদ গ্রহণ করে তিনি জনমনে দ্বিধা তৈরি করেছিলেন এবং একটি আপোষ করেছিলেন। কিছু সময় পর তিনি ঐ পদ থেকে পদত্যাগ করলেও ততক্ষণে যে ক্ষতি হওয়ার তা হয়ে গেছে।

জিয়া সেনা প্রধান হতে যাচ্ছেন এটা সবাই জানতেন। জিয়া ও শফিউল্লাহ একই ব্যাচের হলেও 'অর্ডার অফ মেরিট' অনুসারে জিয়া নিজের জেষ্ঠ্যতা দাবি করতে পারেন।

এরশাদের উত্থান বেশ কৌতুহলোদ্দীপক হলেও, এটা সবার দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। সেনা কর্মকর্তাদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তারা খুব দ্রুত পদোন্নতি পেয়ে যান এবং কিছু মেজর দুই তিন বছরের মধ্যেই মেজর জেনারেল হয়ে যান। কিন্তু এরশাদকে পাকিস্তান থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ পরে ১৯৭৩ সালে ফিরিয়ে আনা হয়। এছাড়াও তিনি অফিসার ট্রেনিং স্কুল থেকে পাশ করেছিলেন, কোন মিলিটারি একাডেমী থেকে নয়। মোট কথা এরশাদ সেনাবাহিনীর এলিটদের মধ্যে ছিলেন না। এরপরও ১৯৭৫ সালে ভারতে প্রশিক্ষণরত অবস্থায় তাকে তিন মাসের মধ্যে দুইবার পদোন্নতি দেয়া হয়: জুন মাসে তাকে প্রথমে ব্রিগেডিয়ার পদে এবং আগস্ট মাসে তাকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেয়া হয়। এমনকি বাংলাদেশে যখন চারপাশেই খুব দ্রুত অনেকের পদোন্নতি হচ্ছে তখনও এরশাদের উপরে ওঠার গতি ছিল চমকে দেবার মত।

এয়ার ভাইস মার্শাল তওয়াবকে জার্মানী থেকে ফিরিয়ে এনে অক্টোবরের ১৬ তারিখে বিমান বাহিনীর প্রধান করা হয়। তিনি ন্যাটো এয়ারফোর্স স্কুলে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালনের পর তার জার্মান স্ত্রীকে নিয়ে জার্মানীতেই বসবাস করছিলেন।

১৫ আগস্ট সকালে রেডিওতে বাংলাদেশ এখন সেনা শাসনের অধীনে আছে বলে যে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল তার কোন সত্যতা ছিল না। কেউই সেনা শাসন জারির ঘোষণা দেয়নি।

২০ আগস্ট মোস্তাক নিজেকে সেনা শাসন জারি করার, সেনা আইন বহাল করার এবং বিশেষ আদালত চালু করার ক্ষমতায় ক্ষমতায়িত করে নেন।
দুই দিন পর সরকারের মনে হয় যে কিছু বিষয় পরিষ্কার করা দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, "সংবিধান এখনও বলবৎ আছে, এবং সংবিধানে উল্লিখিত রাষ্ট্রের চারটি প্রধান নীতি- জাতীয়তাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র-অপরিবর্তিতই আছে। এমন কি জাতীয় সংসদও বিলুপ্ত করা হয়নি ।"

১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকারে মোস্তাকের সহকর্মী ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচ কামরুজ্জামান; মোস্তাক এদেরকে তার সরকারে যোগ দেয়ার জন্য রাজি করানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তারা এ ফাঁদে পা দেননি । যখন মিষ্টি কথায় কাজ হয়নি, তখন মোস্তাক তাদের হুমকি দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হয়নি।

এই চারজনসহ আরও কয়েকজন নেতাকে ১৯৭৫ সালের ২৩ আগস্ট সেনা আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়।

একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক সন্তোষের সাথে উল্লেখ করেন যে মোস্তাক মুজিব নগর সরকারে তার চারজন সহযোগীকে গ্রেফতার করেছেন যারা সবাই ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন।

ভারতের নাম উল্লেখ করতে মোস্তাকের ভীষণ অস্বস্তি ছিল, এমন কি তার ১৫ আগস্টের ভাষণে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রতিবেশী দেশের নাগরিকদের জীবন দেয়ার কথা বলেছিলেন তখনও তিনি ভারতের নাম উল্লেখ করেননি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ভারতের প্রশংসা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি মাত্রায় করেছিলেন। তিনি ভারতকে 'খুব ভাল বন্ধু', সোভিয়েত ইউনিয়নকে 'ভাল বন্ধু' আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে 'বন্ধু' বলে আখ্যা দেন, যখন ২০ আগস্ট এ তিনটি দেশ থেকে আগত প্রতিনিধিদের স্বাগত জানান।

তিনি একই ধারা বজায় রাখেন ২৫ আগস্টে ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা চিঠিতে। তিনি বলেন, "আমাদের দুই দেশের মধ্যকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের মূলে রয়েছে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যৌথভাবে যে সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করেছি সেগুলো। বাংলাদেশের সরকার এবং জনগণের কাছে দুই দেশের মধ্যে যে বন্ধুত্ব রয়েছে তা অমূল্য।" দুই দেশের মধ্যে যে সমস্ত দ্বিপক্ষীয় চুক্তি ও সমঝোতা রয়েছে সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিজ্ঞা তিনি পুনর্ব্যক্ত করেন। পরিশেষে তিনি বলেন, "কোন ধরণের দ্বন্দ্ব এবং সংঘাত ছাড়া আমাদের দুই দেশের সরকারগুলো নিজেদের মধ্যকার বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তি বজায় রাখতে একে অপরকে সহায়তা করবে বলে আমার যে আত্মবিশ্বাস রয়েছে তা আপনার কাছে বিনীতভাবে প্রকাশ করছি।"

মোস্তাক দেশের মধ্যেই বিভিন্ন দিক থেকে চাপে ছিলেন। এর মধ্যে সীমান্তে যেকোন ধরণের উত্তেজনা তার অবস্থানকে আরও কঠিন করে তুলত।
ইন্দিরা গান্ধী তার জবাবে জানান তিনিও বিশ্বাস করেন যে ভারত ও বাংলাদেশ 'এ অঞ্চলের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একসাথে কাজ করে যাবে' বলে তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি আরও বলেন 'আমরা আমাদের যৌথ ত্যাগের কথা অবশ্যই মনে রাখবো।' ইন্দিরা গান্ধীর এই সঠিক কিন্তু নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়া বাংলাদেশের সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার করা হয় এবং এমনকি একজন রেডিওতে বলে বসেন যে এটি বাংলাদেশে পট পরিবর্তনে ভারতের সম্মতির লক্ষণ।

যদিও চীন ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের পথে বাধা হয়ে ছিল, কিন্তু তারা এটা জোড় দিয়েই বলছিল যে মুজিবের বিরুদ্ধে তাদের কোন বিদ্বেষ নেই। কিন্তু মুজিব হত্যার মাত্র ১৬ দিনের মাথায় ৩১ আগস্ট চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

চীনের স্বীকৃতি লাভ বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলোতে ব্যাপক প্রশংসিত হয়। এই সংবাদপত্রগুলো চীনকে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে দেখত। ঢাকার একটি

সংবাদপত্রে প্রথম পাতায় সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব' এখন নিরাপদ।

আগের জাতীয় পোষাকে এখন আর চলছিল না। এখন দরকার হয়ে পড়ল আরেকটু বেশি 'ইসলামিক' কোন কিছুর।

যখন মন্ত্রীসভায় নতুন জাতীয় পোষাক কি হতে পারে তা নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন মোস্তাক তার মাথার টুপি খুলে টেবিলের উপর রাখেন। এই ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরে একজন মন্ত্রী প্রস্তাব করেন গলাবন্ধ একটি লম্বা কোট এবং মাথায় টুপি হওয়া উচিৎ নতুন জাতীয় পোষাক। এ প্রস্তাবটি সর্ব সম্মতভাবে মন্ত্রী সভায় পাশ হয়ে যায়।

এটি ছিল আসলে পাকিস্তানের জাতীয় পোষাক। মোস্তাক শুধু জিন্নাহ টুপিটি বদলিয়ে দেন।

কোথা থেকে তারা অতি অল্প সময়ে এতগুলো 'মোস্তাক টুপি' জোগাড় করেছিল? এগুলো ভারত থেকে অর্ডার দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল।

সকল রাষ্ট্রীয় প্রকাশনায় মোস্তাক টুপি বিশেষভাবে দেখানো হত। মতা নিয়ে এক ধরণের লড়াই তখন চলছিল, কেউ নিশ্চিত ছিলেন না আসলে তখন কে দেশ চালাচ্ছিল। অভ্যুত্থানকারী মেজররা রাষ্ট্রপতির আদেশ অমান্য করছিলেন, সেন সদর দপ্তর রাষ্ট্রপতি আর এই মেজরদের মতাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করছিলেন।

সরকারি বার্তা সংস্থা বাসস এ সেনা সদর দপ্তর থেকে একজন অফিসার ফোন করে নির্দিষ্ট কিছু খবর প্রকাশ করার নির্দেশ কে দিয়েছেন সেটা জানতে চান। জবাব আসে এই খবরগুলো প্রকাশের নির্দেশ এসেছে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিবের কাছ থেকে। খবরগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দেন ঐ অফিসার।

কার নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে?

একজন মুসলিমের জন্য যে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া বাধ্যতামূলক, মোস্তাক তার চেয়ে বেশি নামায পড়তে লাগলেন।

পাকিস্তানি সুর

পাকিস্তান আমলে সেনা বাহিনী কর্তৃক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে প্রতিটি বেসামরিক সরকার উৎখাতের পেছনে অজুহাত হিসেবে দেখানো হত 'গৃহযুদ্ধ'কে।

অজুহাত হিসেবে তার চেয়েও বেশি শোনা গেছে 'ইসলাম হুমকির মুখে' এরকম অজুহাত। দেশ বিভাগের পর একদম শুরু থেকেই এই অজুহাত এত বেশি ব্যবহৃত হয়ে এসেছে যে একবার তুরস্কের রাজা ফারুক বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে পাকিস্তানিরা মনে করে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ইসলাম বলতে কিছু ছিল না। ঢাকার একজন সম্পাদক ফারুকের কথাই একটু অন্যভাবে লিখেছিলেন "মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর সহায়তায় ব্রিটিশরা পাকিস্তান তৈরি করার আগে ইসলাম কখনোই এতোটা বিপন্ন ছিল না।"

পাকিস্তান শুরু থেকেই একটি 'বাফার স্টেট' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছিল, এবং আগে বা পরে সেনাবহিনী সেখানে মতা দখল করতই; সর্বোপরি পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরু থেকেই 'ইসলাম হুমকির মুখে' এই সুরের সাথে তাল মিলিয়ে চলা হয়েছে।

জেনারেল জিয়াউল হক বেশ গর্বের সাথেই বলেছেন, "শান্তিপূর্ণ অভ্যুত্থানের একটি ঐতিহ্য আমরা গড়ে তুলেছি।"

অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার উৎখাত করার ঐতিহ্য!

অন্যদিকে বাংলাদেশের মানুষের ছিল দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস এবং যে সমস্ত রাজনীতিবিদ ও সেনানায়ক সাম্প্রদায়িকতা লালন করতেন তাদের এদেশের মানুষ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখান করেছিল। তারপরও যেদিন মুজিবকে হত্যা করা হয়েছিল সেদিন এবং তার পরেও এদেশে 'গৃহযুদ্ধ' আর 'হুমকির মুখে থাকা ইসলাম' এমন সব পাকিস্তানি সুর বাজানো হয়েছিল।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই এদেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং মুজিবের বিরুদ্ধে যারা ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাদের কেউ কেউ এ চক্রান্তে যুক্ত ছিলেন। তারা ভেতরে থেকেই চক্রান্ত করছিলেন; তারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন বলে যে সাধারণ বিশ্বাস ছিল তা তাদের কাজ সহজ করে দিয়েছিল। এদের বদলে যারা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন তারা অভ্যুত্থান করতেন তাহলে সাথে সাথেই এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে উঠত।

১৫ আগস্টের তিনটি আক্রমণকারী দলের নেতৃত্বে যে মেজররা ছিলেন তারা সবাই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তৈরি এবং অধিকাংশ পাকসেনা অফিসারদের মতই তারাও মনে করতেন তাদের জন্ম হয়েছে শাসন করার জন্য এবং নিজেদের মহৎ মনে করার বিভ্রমে আক্রান্ত ছিলেন তারা মেজর ফারুক ছিলেন এদের মধ্যে সবার আগে।

এই মেজরদের মধ্যে কয়েকজন পাকিস্তানের 'অপারেশান ফনিক্স'র অংশ ছিলেন।

ইসলামের নামে পাক দখলদার বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে এত বেশি অপকর্ম সংঘটিত করেছিল যে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে এমন কি 'ইনশাআল্লাহ' বা 'আসসালামুআলাইকুম' এর মত নিত্যদিনের সম্ভাষণ শুনলেও অনেক মুক্তিযোদ্ধা ক্ষোভে ফেটে পড়তেন। এসব মুক্তিযোদ্ধাদের ভাইদের পাকিস্তানিরা হত্যা করেছিল এবং বোনদের সম্ভ্রমহানী করেছিল; আর এই শব্দগুলো শুনলে তাদের সেসব পাকিস্তানিদের কথা মনে পড়ে যেত।

এসব অপকর্ম এস মাসুদুর রহমান নামে একজন শীর্ষস্থানীয় পাকিস্তানি সাংবাদিকের কাছে এতটাই খারাপ লেগেছিল যে তিনি পাকসেনাদের খুনী, লুটেরা ও ধর্ষক বলেছিলেন।

কিন্তু পাকসেনারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের অপকর্ম নিয়ে গর্বিত ছিল। পাক সেনাদের মনে এমন ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে তারা বাঙালীর আরও হাজার বছর শাসন করবেন। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে যখন পাক সেনারা ধরে নিয়েছিল যে বাঙালীর স্বাধীনতার চেতনাকে চিরতরে গুড়িয়ে দিতে সম হয়েছেন, তখন পাক বাহিনীর একজন কর্নেল বলেছিলেন, "এই ভূখণ্ডটি এখন আর কায়েদ এ আজমের পাকিস্তানের অংশ নয়, বরং এটি আমাদের বিজিত ভূমি । বাঙালীরা এতদিন ঔপনিবেশিকতার কথা বলেছে, এখন তারা ঔপনিবেশিকতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবে । তারা আর কখনো এমন কি স্বাধীনতার স্বপ্নও দেখবে না।"

১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে একজন পাকিস্তানি মেজর ডের স্পেইগেল কে বলেন "তাদের মধ্যে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করতে হবে যেন বাঙালীর তৃতীয় প্রজন্মও এটা মনে রাখে।"

এরপরও চার বছরের মধ্যেই ফারুক এবং রশিদ পাক বাহিনী ইসলামের নামে এদেশের মানুষের উপর যে নির্যাতন চালিয়েছিল তা ভুলে যান।

সানডে টাইমসে ৩০ মে ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ফারুক বলেন, "মুজিব তার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিলেন। ইসলাম হল এদেশের মানুষের ধর্ম, আর এই একটি জিনিসই সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনা দিতে পারে।"

ফারুক আরও বলেন, "মাত্র সাড়ে চার বছর সময়ের মধ্যেই মুজিব বাংলাদেশকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেন" তার মতে ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন প্রায় ২০ লক্ষ লোকের প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। প্রকৃত সংখ্যাটি ৩০ লক্ষ, ২০ লক্ষ নয়।

কিন্তু ফারুক তার বক্তব্যে ভুলক্রমে শেখ মুজিবের শাসন আমল এক বছর বেশি বলেছিলেন, যা তার পক্ষে বেশ বেমানান ছিল। খুব সম্ভবত তিনি ১৯৭২ সালের

১০ জানুয়ারি যে দিন মুজিব তার পাকিস্তানে বন্দী দশা শেষ করে ঢাকায় ফেরত আসেন তার পরিবর্তে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ থেকে মুজিবের শাসনামল হিসেবে গণনা করেছিলেন। ঐ তারিখে মুজিব 'এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঐতিহাসিক ঘোষণা দিয়েছিলেন।

এমন কি হতে পারে যে ফারুকও ইয়াহিয়া খানের মতোই মনে করেন মুক্তি সংগ্রামের সময় বাঙালী জাতিকে যে দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তার জন্য মুজিব দায়ী, যদিও এ কথা তার সরাসরি বলার সাহস ছিল না?"

ফারুক সেই সব অতি ব্যবহৃত রাজনৈতিক ফাঁকা বুলি ব্যবহার করেছিলেন যা সাধারণত সুযোগ সন্ধানীরা ধর্মকে তাদের নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ে ব্যবহার করে থাকেন। এমন কি পাকিস্তানের সবচেয়ে পথভ্রষ্ট জেনারেলের এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট রাজনীতিকরাও একথা বলতেন যে বাঙালী নেতারা প্রকৃত মুসলিম নন।

কুয়েতের দৈনিক আল রাই আল আমানকে তাহেরউদ্দীন ঠাকুর বলেন, "শেখ মুজিবের মৃত্যুর ফলে দেশ গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা পেয়েছে।"

তাদের দয়া দেখাবার জন্যই নিষ্ঠুর হতে হয়েছে, এমন কি নারী ও শিশুদেরকেও তারা হত্যা করেছিলেন দেশ কে বাঁচাবার জন্যই।

গর্বের সাথে ঠাকুর আরও যোগ করেন, "আমরা অভ্যুত্থানের স্বীকৃতিও চাইনি, শুধু সরকারে পরিবর্তন এনেছি।" আর কিছুই না।

এটা একটি ব্যতিক্রমী অভ্যুত্থান ছিল; এখানে পরিবর্তনের চেয়ে ধারাবাহিকতার উপর জোড় বেশি দেয়া হয়েছিল। ষড়যন্ত্রকারীরা সবাইকে এটাই বোঝাতে চেয়েছিল যে তারা যদি কোন ধরণের প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা না করে তাহলে তাদের কোন তি তো হবেই না বরং এ থেকে তাদের লাভ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

রশিদ বলেন তার এমন একজন মুখপাত্রের দরকার ছিল যে জনগণকে এটা ভাবতে বাধ্য করবে-"আমাদের ধৈর্য ধরে দেখা উচিৎ শেষ পর্যন্ত কি হয়।" জনগণ একটু দ্বিধান্বিত থাকলেই অল্প সময়ের মধ্যে তারা এই অভ্যুত্থানকে নিজেদের নিয়তি বলে মেনে নিবে এবং অভ্যুত্থানকারীরা নিরাপদে সরে যেতে পারবে।

১৫ আগস্ট সকালে যখন মেজররা একটু দ্বিধায় ছিলেন যে শেখ মুজিবের মৃত্যুর খবর প্রচার করা হবে কি না, তখন তাহের উদ্দীন ঠাকুর তাদের খবরটি প্রচারে চাপ দিয়ে বাধ্য করেন। ঠাকুরের মতে শেখ মুজিবের মৃত্যুর খরব প্রচারে কিছু ঝুঁকি রয়েছে ঠিকই, কিন্তু যদি জনতা ভাবতে শুরু করে মুজিব জীবিত তাহলে বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি। মুজিব জীবিত এমন ধারণা জনমনে থাকলে জনগণ সেনা আইন ভঙ্গ করে ১৯৭১ সালের মত রাস্তায় নেমে আসতে পারে।

ঠাকুরের সিদ্ধান্তই ঠিক ছিল: মুজিবের হত্যার সংবাদে সবাই হতবাক হয়ে পড়ে, প্রতিবাদ করতে পারে এমন ব্যক্তিরা এতটাই হতাশ হয়ে পড়েন যে দুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবাই বাড়িতেই থেকে যান, যদিও তারা জানতেন যে তাদেরও হত্যা করা হতে পারে।

এদের মধ্যেই একজনকে আগস্টের হত্যাযজ্ঞের অনেক পরে যখন শুভাকাঙ্ক্ষীরা তার 'ইস্পাতের মত দৃঢ় স্নায়ু'র জন্য প্রশংসা করেন তখন তিনি বলেন, "সেই সকালে আমি এতটাই বিহবল হয়ে পড়েছিলাম, যেন আমার স্নায়ুগুলো ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছিল যেখানে মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে সেখানে আমার জীবনের পরোয়া করে কোন লাভ নেই। সবকিছুকেই তখন নিষ্ফল আর অর্থহীন লাগছিল।"

অভ্যুত্থানের কিছু সময় পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাকের তরুণ সম্পাদক আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু) বলেন, "এই অভ্যুত্থান আমাকে একটুও অবাক করেনি। কূটনৈতিক মহলে বেশ কিছুদিন ধরেই এ নিয়ে গুঞ্জন ছিল। জুলাই মাসে একজন কূটনীতিক আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন আসন্ন অভ্যুত্থানটি কারা করবে, কট্টর ডানপন্থীরা না কি কট্টর বামপন্থীরা।

কট্টর ডান বা বাম গোষ্ঠীর মধ্য থেকে ছাড়া আর কারও অভ্যুত্থান করার সম্ভাবনা ছিল না।

এ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যগুলো এতোটাই অস্পষ্ট যার সাথে তুলনা করা যায় দুটি দেশের যার মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে এমন একটি নদী যা প্রায়শই পথ পরিবর্তন করে।"

একটু থেমে মঞ্জু আরও যোগ করেন, "শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যে তার পক্ষে পুরো দেশের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নয়, তিনি নিজেও তাই আর বাঁচতে চাননি।"

মুজিব প্রায়ই মৃত্যুর কথা বলতেন। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত যে বিশাল সমাবেশে তিনি ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন সেখানে তিনি বলেছিলেন, "মনে রাখবে আমি কখনোই দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিবনা, এমন কি এজন্য মৃত্যুর মুখে পড়তে হলেও না।" তার দৃঢ় বিশ্বাসের এটি ছিল এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

আবার মুজিব যখন ইয়াহিয়া খানের সাথে ১৭ মার্চ ১৯৭০ সালে আলোচনা চালাচ্ছিলেন তখন কিছু সাংবাদিক তাকে তার জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালে তিনি গম্ভীর ভাবে জবাব দেন, "আমার জন্মদিন বা মৃত্যুদিনের কি গুরুত্ব আছে? আমি আমার জনগণের সাথে আছি। আমার জনগণের কোন নিরাপত্তা নেই। তারা মারা পড়ছে।"

এসময় কয়েকজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে পরামর্শ দেন যে ইয়াহিয়া খানের সাথে তার আলোচনা ব্যর্থ হলে তার আত্মগোপন করা উচিৎ। জবাবে মুজিব বলেছিলেন, "আমাকে খুঁজে না পেলে তারা পুরো ঢাকা তছনছ করে ফেলবে।" এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। মুজিবের একজন বিশ্বস্ত রাজনৈতিক বন্ধু তাকে বলেছিলেন, "এবার তারা আপনাকে হত্যা করতে পারে।" জবাবে মুজিব বলেছিলেন, "আমি আমার দেশের স্বাধীনতার জন্য মরতে রাজি আছি।" তিনি তার মনস্থির করে ফেলেছিলেন। তার বন্ধুদের আর কিছুই করার ছিল না ।

তার দেশের মানুষের স্বপ্নভঙ্গের চেয়ে মৃত্যু মুজিবের কাছে শ্রেয়তর ছিল। কিন্তু তার জীবন এতোটাই পরিপূর্ণ ছিল যে মৃত্যু নিয়ে দ্বিধা তার মধ্যে ছিল না। তিনি একজন প্রকৃত যোদ্ধা ছিলেন, পরাজয়ের ভয় তার ছিল না। তার মনে যে বৈপ্লবিক স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়নের পথের ঝুঁকিগুলো তার জানা ছিল। একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে সতর্ক করে বলেছিলেন তিনি যে সমস্ত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের কথা ভাবছিলেন সে কারণে এমনকি তার কিছু সহকর্মীও তার বিরুদ্ধে চলে যেতে পারেন। "পরিবর্তনের হওয়ায় তারা উড়ে যাবে" মুজিবের জবাব ছিল। ঐ শুভাকাঙ্ক্ষীটি তারপরও বলে গেলেন, "কিন্তু তারা এ জন্য আপনাকে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে ।" এর জবাবে মুজিব বলেন, "আমি জানি আমার জীবন হুমকির মুখে আছে, কিন্তু একটি জাতি হিসেবে টিকতে হলে আমাদের কিছু একটা করতেই হবে।"

"যত যাই হোক" তিনি এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

মুজিবের আর বেঁচে থাকার ইচ্ছা ছিল না বলে তাকে ট্র্যাজেডির নায়ক নয় বরং একজন হতাশ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। এটা সবচেয়ে নির্দয় কাজগুলোর একটি।

তোফাজ্জল হোসেন মানিক যাকে সবাই চিনত মানিক মিয়া নামে তার দ্বিতীয় পুত্র আনোয়ার হোসেন (মঞ্জু)। মঞ্জু দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ছাত্রলীগের একজন জঙ্গী সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে যখন আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলন তুঙ্গে ছিল তখন মাঝে মাঝে শেখ কামালের সাথে সেনানিবাসের ভেতরে ঢুকে পড়তেন দেয়ালে স্লোগান লেখার বা পোস্টার সাঁটানোর জন্য।

মঞ্জু শেখ মুজিবকে চাচা ডাকতেন এবং প্রায়ই তার বাড়িতে যেতেন সেখানে তাকে পরিবারের অন্যতম সদস্য হিসেবেই দেখা হত।

যাই হোক ১২ আগস্টে কোলকাতা সফর শেষে মঞ্জু যখন ঢাকা এলেন তখন মুজিবের রাজনৈতিক সহযোগী তোফায়েল আহমেদ তাকে বলেন, "বঙ্গবন্ধু তোমার উপর ক্ষেপে আছেন। তোমার দ্রুতই তার সাথে দেখা করা উচিৎ।"

পরদিন মঞ্জু গণভবনে গেলেন। মুজিব তখন তাহের উদ্দীন ঠাকুরকে সাথে নিয়ে লনে পায়চারী করছিলেন। মুজিব তখন তার হাতের লাঠিটি নিয়ে মঞ্জুর দিকে

এমনভাবে তেড়ে যান যেন এটি দিয়ে তিনি মঞ্জুকে আঘাত করবেন এবং বলেন, "তোমার বন্ধুদের বলে দিও আমি মোটেও ভয় পাইনি।"

যে বাঁশ বেঁকে যায় তা ভাঙেনা, মুজিব ভাঙবেন কিন্তু মচকাবেন না।

এটি অভ্যুত্থানের মাত্র দুদিন আগে ১৩ আগস্টের ঘটনা।

১৩ আগস্টে ফারুকও মুজিবের সাথে গণভবনে দেখা করেন।

পাকিস্তানি সেনাতন্ত্রের ফল থেকে আগত হিসেবে ফারুককে একজন সম্ভ্রান্ত এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচনা করা হত। তার অধীনস্ত ল্যান্সাররা যারা ১৫ আগস্টে হামলার নেতৃত্ব দিয়েছিল তাদের পরনে ছিল বেরেট, জ্যাক-বুট এবং কালো ওভারঅল, যা তাদেরকে অন্য সেনা ইউনিট থেকে আলাদা করে রেখেছিল।

ফারুক মুজিবকে বলেছিলেন "রাষ্ট্রপতির দেহরক্ষীদের অন্তত ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চতার হওয়া উচিৎ এবং ব্যতিক্রমী পোষাক পরা উচিৎ, কেবলমাত্র তখনই তাদের সম্ভ্রান্ত মনে হবে।" মুজিবের কাছ থেকে জবাব আসে "না"। এতে করে অধিকাংশ বাঙালীই বাদ পড়ে যাবেন এবং এতে তাদের অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হবে। এমন কি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীতে যেখানে দীর্ঘদিন বেশি সংখ্যায় বাঙালীকে জওয়ান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি তারা খর্বাকৃতি হওয়ায়, সেখানে বাঙালীকে নেয়ার জন্য তার শর্ত নামিয়ে আনা হয়েছিল।

১৩ আগস্ট যখন মোস্তাক মুজিবের বাড়িতে তার সাথে দেখা করেন সেদিন তিনি রাসেলের প্রতি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি স্নেহপ্রবণ ছিলেন।

ব্রাসেলস থেকে ১৩ আগস্ট শেখ হাসিনা তার মাকে ফোন করেন। সেদিন বেগম মুজিব বলেন, "দ্রুত ফিরে এসো। তোমাদের বাবার তোমাদেরকে খুব প্রয়োজন। বিস্তারিত ফোনে বলা সম্ভব নয়।" হাসিনার চার বছর বয়সী ছেলে এই ফোনালাপ ব্যহত করে তার মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে শুরু করে। "ওকে কখনও শান্তি দিবে না" বলে বেগম মুজিব কাঁদতে শুরু করেন।

এই শেষবারের মত শেখ হাসিনা তার মায়ের সাথে কথা বলেছিলেন। হাসিনা প্রায়ই ভাবেন কী কারণে সেই সন্ধ্যায় তার মা কাঁদতে শুরু করেছিলেন।

১৩ আগস্ট মুজিব আব্দুর রাজ্জাককে বলেছিলেন, "তোমার বাড়িতে পুলিশ প্রহরা থাকা দরকার।" বাকশালের নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে রাজ্জাকের পুলিশ প্রহরা পাবার অধিকার ছিল, কিন্তু একজন রাজনৈতিক নেতার বাড়িতে পুলিশ প্রহরার বিষয়টি তার কাছে পুরোনো ধ্যান ধারণা মনে হচ্ছিল। মুজিব বলেন, "আমি ইতিমধ্যেই মণিকে তার বাড়িতে পুলিশ প্রহরার ব্যবস্থা করতে বলেছি। তোমাদের দুজনেরই সাবধান হওয়া দরকার। তোমাদের জীবনের হুমকি রয়েছে।"

মুজিবের এ কথাগুলো স্মরণ করে রাজ্জাক বলেন, "মুজিব বাকি সবাইকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে তেমন কোন সতর্কতা অবলম্বন করেননি।" একটু থেমে রাজ্জাক বলেন, "হয়তো মুজিবের মনযোগ অন্যদিকে নেয়ার জন্যই গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন তাকে আমাদের বিপদের কথা জানিয়েছিল।"

এটি একটি মারাত্মকভাবে বিলম্বিত উপলব্ধি।

বিদেশি যোগাযোগ রয়েছে এমন লোকদের দিয়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিপূর্ণ ছিল। ভুট্টো যখন ১৯৭৪-এর জুনে ঢাকা আসেন তখন অনেক অফিসারের পাকিস্তানিদের সাথে দহরম মহরম ছিল চোখে পড়ার মত।

এবং ১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মেই ফারুক এবং রশিদ শেখ মুজিবকে হত্যার পরিকল্পনা করেন।

দেশ স্বাধীন হবার আগে গোয়েন্দা বিভাগে কর্মরত জেষ্ঠ্য গোয়েন্দাদের মধ্যে কয়েকজন বাঙালী শেখ মুজিবের কাছে তথ্য দিতেন। যদিও যে সব ছোট খাটো তথ্য তারা পাচার করতেন তা ছিল প্রধানত অগুরুত্বপূর্ণ এবং প্রায়ই সেগুলো বিভ্রান্তিকর ছিল, তারপরও এসব কর্মকর্তারা সম্ভবত তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েই এ কাজগুলো করতেন। এটা মনে রাখতে হবে এসব লোককে প্রশিক্ষণ দেয়াই হয়েছিল অন্তর্ঘাতমূলক কাজ করার জন্য। তারা ছিল প্রকৃত অর্থেই ধোঁকাবাজ।

১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের পুলিশ বাহিনী ছিল পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর প্রধান ব্যবস্থাগুলোর একটি। পুলিশের একজন সুপারিনটেন্ডেন্টকে অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছিল কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি একজন চরম বাঙালী জাতীয়তাবাদী। পুলিশের কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিলেও গোয়েন্দা বিভাগের সবাই একদম শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনা কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করেছিলেন। এমন কি যখন বাঙালী কূটনীতিকরা পাকিস্তানে কর্তৃপক্ষকে বর্জন করা শুরু করেছিলেন, তখনও বাঙালী গোয়েন্দা কর্মকর্তারা পাকিস্তানিদের কাছে বিশ্বস্ত ছিলেন। হয়তো তারা ষড়যন্ত্রে এতোটাই জড়িয়ে পড়েছিলেন যে তারা চাইলেও আর এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না তাদের প্রাণের ভয়ে বা ধরা পড়ে যাবার ভয়ে।

মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) ফজল মুকিম খান তার 'পাকিস্তান'স ক্রাইসিস ইন লিডারশিপ' গ্রন্থে লিখেছেন, "মুজিবের ক্ষমতায় না আসার সাথে অনেকগুলো গোয়েন্দা সংস্থার নিজেদের স্বার্থ জড়িত ছিল।"

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কিছু বাঙালী কর্মকর্তা ছিলেন। তাদের পদ যাই হোক না কেন বাঙালী হিসেবে তারা পাকিস্তানি প্রভুদের চোখে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ছিলেন; মতাদর্শিক দিক থেকে এবং প্রশিক্ষণের কারণে

তারা মনে প্রাণে পাকিস্তানি ছিলেন এবং তা প্রমাণ করার জন্য তারা উদগ্রীব ছিলেন।

এ.বি.এস. সফদার ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময়, যা কিনা পাকিস্তানের প্রথম নির্বাচন, পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান ছিলেন এবং তিনি অল্প কয়েকজন বাঙালী কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন যাদের পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতো।

সফদার নির্বাচনের আগে মুজিবের অবস্থান মূল্যায়ন করে মতামত দেন যে মুজিবের জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ অবস্থা পেরিয়ে এখন কমতির দিকে। তার মতে ঐ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগে আওয়ামী লীগের জেতার কথা। কিছু বাঙালী অফিসারকে বলেন যে কোন অবস্থাতেই পূর্ব পাকিস্তানের আসনগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ ৭০ ভাগের বেশি আসনে জিততে পারবে না। কেন্দ্রের কাছে পাঠানো রিপোর্টে তিনি হয়তো আওয়ামী লীগের জেতার সম্ভাবনা আরও কমিয়ে দেখিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ ঐ নির্বাচনে ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করে। এর ফলে পাকিস্তানের ৩০০ আসন বিশিষ্ট জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পাকিস্তানের সামরিক জান্তার সব হিসাব নিকাশ ভুল প্রমাণ করে দেয়। এর ফলে জনগণের রায় কে বাতিল করার চক্রান্ত শুরু হয়।

নির্বচনের সময় জনমত বুঝতে একা সফদারই ভুল করেননি। কিন্তু তিনি তার ভবিষ্যদ্বানী সঠিক প্রমাণ করতে এক বা দুটি দলের হয়ে কাজ করেছিলেন। তিনি ব্যর্থ হলেও সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক এন. এ. রিজভী যাকে পাকিস্তানের দুই অংশেই সবাই ভয় পেত, তার আস্থা হারাননি। অন্তর্ঘাতমূলক কাজের আরও প্রশিক্ষণ নেয়ার জন্য সফদারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ যখন পাক বাহিনী বাংলাদেশের মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছিল, ঠিক সে সময় সফদার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইন্টারন্যাশনাল পুলিশ একাডেমিতে টেকনিক্যাল ইনভেস্টিগ্যাশন কোর্সের প্রশিক্ষণ নিচ্ছিলেন। তাকে পাকিস্তানে ফেরত আসতে বলা হয়েছিল, কিন্তু ইউ. এস. পাবলিক সেফটি প্রোগ্রামের প্রধান জোসেফ কর এর হস্তক্ষেপের কারণে তিনি তার কোর্স সম্পন্ন করতে পেরেছিলেন। তার প্রশিক্ষণ পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনে কাজে আসবে।

এই কোর্সের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো থেকে পুলিশ সদস্যদের বাছাই করা হয়ে থাকে। কোর্সের অর্থায়ন করে থাকে ইউ.এস এজেন্সি ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ইউ.এস.এ.আই.ডি) এবং মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষকের ব্যবস্থা করত সি আই এ। এই কোর্স সম্পন্ন করা পুলিশ সদস্যরা গুয়াতেমালার 'ওজো পর ওজো (চোখের বদলে চোখ)' বা

ডমিনিকান রিপাবলিকের 'লা ব্যান্ড (দল)'-এর মত 'মুক্ত হত্যাকারীদের দল' এর সদস্য হিসেবে কাজ করতেন।

১৯৭১ সালের গ্রীষ্মে মুক্তিযুদ্ধ যখন ধীরে ধীরে গতিপ্রাপ্ত হচ্ছিল তখন সফদার পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত আসেন এবং তার গোয়েন্দা তৎপরতা শুরু করেন। কেউ ভাবতে পারেন সফদারকে হয়তো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নিজের বদনাম ঘোচাতে অনেক চেষ্টা করতে হয়েছিল। কিন্তু সত্যি হলো আওয়ামী লীগের মধ্যে এমন অনেক নেতা ছিলেন যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এমন বামপন্থীদের শায়েস্তা করতে বেশি আগ্রহী ছিলেন, ভয়ঙ্কর আলবদর আর রাজাকারদের ধরার বিষয়ে তাদের আগ্রহ কম ছিল; আর এমন নেতাদের মধ্যে অনেকেই সফদারের ভালো বন্ধু ছিলেন।

মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রীর তদন্তকারী দলের সদস্য করা হয় সফদারকে। একজন কর্মকর্তা হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, "একজন বিশ্বাসঘাতককে আমাদের বিচার করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।"

তদন্তকারী দলগুলোকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হলেও তার মূল আগ্রহ ছিল গোয়েন্দা তৎপরতায়। তিনি তার গোয়েন্দা সূত্রগুলো বহাল রাখতে থাকেন।

মুজিব ভেবেছিলেন যেসব পাকিস্তানপন্থী কর্মকর্তাকে স্বাধীন দেশে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি তাদের মন জিতে নিয়েছিলেন এবং এরা তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। কিন্তু কলঙ্কিত অতীত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করাটা ছিল সাপের লেজ দিয়ে পিঠ চুলকানোর মত বিপদজনক ।

মুজিব হত্যার পরপরই এই সফদারকে মোস্তাক জাতীয় গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক পদে নিয়োগ দেন। ১৯৭৭-এর ২ অক্টোবরের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের পর তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়।

আবু তাহের, জিয়া উদ্দীন, মঞ্জুর আহমেদ এবং আরও কিছু বাঙালী কর্মকর্তা যারা ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। অভ্যুত্থানকারী মেজরদের একজন শাহরিয়ার কোয়েটায় বালুচ রেজিমেন্ট থেকে জুলাই মাসে পালিয়ে আসা কর্মকর্তাদের একজন ছিলেন।

কিন্তু ফারুক যিনি খুব গর্বের সাথে বলে থাকেন যে তিনি মুজিব হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন কেবল অক্টোবরের দিকে যখন আসলে যুদ্ধের হাওয়া বাংলাদেশের দিকে ঘুরে যেতে শুরু করেছে এবং ঐ শেষ মুহূর্তে মোস্তাক আর তার সহযোগীরা দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

হাবিলদার মোসলেম উদ্দীন যে নিজের ভাষ্যমতে মুজিবের উপর গুলি চালান, তাকে পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে আনা হয় ১৯৭৩ সালে। হুদা মুজিবকে শ্রদ্ধা

করতেন আর এ কারণে মুজিবের উপর সরাসরি গুলি চালানোর জন্য ট্রিগারে চাপ দিতে পারেননি। এ সময় মোসলেম উদ্দীন পেছন থেকে মুজিবের উপর গুলি চালান। তার কৃতকর্মের স্বীকৃতি হিসেবে সাথে সাথেই মোস্তাক সরকার তাকে ক্যাপ্টেন পদে পদোন্নতি দেয়। খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সংঘটিত ২/৩ নভেম্বরের পাল্টা অভ্যুত্থানের পর তাকে দেশ ছেড়ে পালাতে হলেও, পরবর্তীতে একটি বাংলাদেশী দূতাবাসে তাকে থার্ড সেক্রেটারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু তার ভয়ঙ্কর অপরাধের পুরস্কার হিসেবে এটি যথেষ্ট ছিল না। তার মনে হয়েছিল তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে এবং তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি তার উন্নতির জন্য এরপর চেষ্টা করেছিলেন যে একটি মাত্র উপায় তার জানা ছিল সে উপায়ে তিনি আরও একটি অভ্যুত্থানে অংশ নেন। এবার তার ভাগ্য প্রসন্ন ছিল না।

তার বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর যে ব্যর্থ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তাতে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ আনা হয় এবং ঢাকা সেনানিবাসে বিশেষ সেনা ট্রাইব্যুনালে তার বিচার করা হয়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তাৎক্ষণিক তার ফাঁসি কার্যকর করা হয়।

বিশেষ সেনা ট্রাইব্যুনালের কাছে তার জবানবন্দীতে তিনি বলেন মেজর ডালিম তাকে মুজিব হত্যার চক্রান্তের অংশ করেন এবং ফারুক তাকে মুজিবকে হত্যা করতে প্ররোচিত করেন। যেহেতু ঐ সময়ে তিনি মাতাল ছিলেন তাই তিনি মুজিব পরিবারের আরো চার সদস্যকে হত্যা করেন।

তিনি এতোটাই মাতাল ছিলেন যে ঐ মুহূর্তে কি করছিলেন তা তিনি কিছুই বুঝতে পারেননি।

মোসলেম উদ্দীন তার জবানবন্দীতে বলেন তার মৃত্যু মুজিব হত্যার শাস্তি হবে, এবং তার দেশবাসী তাকে সবসময়ই একজন ঘৃণ্য হত্যাকারী হিসেবে মনে রাখবে। কিন্তু এটা কোন অনুতাপ থেকে বলা হয়নি। তিনি একজন ভয়ঙ্কর খুনী ছিলেন, এবং ১৯৭৭-এর ২ অক্টোবরের অভ্যুত্থান ব্যর্থ না হলে তিনি অন্য কথা বলতেন।

ফারুক ইসলামের নামে ল্যান্সারদের প্ররোচিত করেছিলেন এবং মোসলেম উদ্দীন যখন ইসলামের নামে গুলি চালান তখন তিনি মাতাল ছিলেন।

মুজিবের বাড়িতে হত্যাকারী দলটিকে নেতৃত্ব দান করার পর বেশ কিছুদিন হুদা বিকারগ্রস্ত হয়ে ছিলেন। তাকে মনোচিকিৎসকের দারস্থ হতে হয়েছিল এবং এখনো যখন তিনি ঐ দিনটি সম্পর্কে কথা বলেন তখন তাকে বিশেষ মানসিক প্রস্তুতি নিতে হয়। তিনি শপথ করে বলেন শেখ মুজিবকে হত্যার ব্যাপারে তিনি কোন কিছু জানতেন না। তার মতে তাদের পরিকল্পনা ছিল মুজিবকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে বাধ্য করা। কিন্তু তারপর কি হতো? এ বিষয়ে আজও তার কাছে কোন উত্তর নেই।

মোসলেম উদ্দীনের মত হুদাও মনে করেন দেশের মানুষ তাকে একজন ঘৃণ্য হত্যাকারী হিসেবে মনে রাখবে! একজন দেশী বন্ধুর সাথে অভ্যুত্থানের তিন বছর পর আলাপকালে হুদা স্বীকার করেন যে মুজিবের কারণেই দেশের মানুষের মনে জাতীয় গৌরবের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু এটা তিনি কেন জন সমক্ষে বলতেন না? হুদার মতে কোন কিছু করেই তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবেনা এবং কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না এবং তাকে কখনোই ক্ষমা করা হবে না।

হুদার ভাষ্যমতে যখন তিনি মুজিবকে সিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে আনছিলেন তখন পেছন থেকে গুলির শব্দ শুনতে পান এবং মুজিব লুটিয়ে পড়েন। তিনি দাবি করেন তার সামরিক প্রশিক্ষণের কারণেই সেদিন তিনি গুলি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ভুলে যান যে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসছিলেন। নিশ্চয়ই মুজিবের ছেলেদের কেউ পেছন থেকে গুলি চালাননি, কারণ তাদের বাবার এতে আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কারণ মুজিব হুদার চেয়ে বেশ অনেকটা লম্বা ছিলেন। তা ঠিক, এটা হুদাও মানেন; কিন্তু আর প্রশ্নের মুখোমুখি না হতে চেয়ে হুদা বারবার এটাই বলতে থাকেন, "আমি সেদিন মারা যেতে পারতাম, আমি সেদিন মারা যেতে পারতাম।"

সেদিন মুজিবের বাড়িতে প্রহরায় থাকা একজন পুলিশ অফিসারের ভাষ্যমতে, হুদা নিচে নেমে আসেন এবং বলতে থাকেন, "আমি পারছি না, আমি পারছি না।" এ সময় মোসলেম উদ্দীন ট্যারেস থেকে নেমে আসছিলেন এবং মুজিবের উপর গুলি চালান।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ একজন পাক সৈনিক মুজিবের কাঁধে বন্দুকের মাজল ঠেকিয়েছিলেন। তখন একজন পাকিস্তানি অফিসার "গুলি চালিওনা" বলে নির্দেশ দেন।

যে বিষয়টির উপর হুদা বার বার জোড় দিচ্ছিলেন তা হল তিনি তখনও সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন। এটি প্রকৃত অর্থে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না।

যে হুদা শাহরিয়ারের সাথে সেরনিয়াবাতের বাড়িতে গিয়েছিলেন তিনি সেনা বাহিনীর সদস্য ছিলেন না। তিনি ছিলেন নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের ভাই।
নুরুল ইসলাম মঞ্জুরকে ১৯৭৫ সালের ২১ জুলাই যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগে অব্যাহতি দেয়া হয়। পরদিন তাকে বাকশাল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

১৫ আগস্টের রক্তাক্ত সকালে মঞ্জুর সশরীরে সেরনিয়াবাতের বাড়িতে উপস্থিত হন কত দক্ষতার সাথে হত্যাকারী দলটি তাদের কাজ করেছে এটা দেখতে। তিনি যখন জানতে পারেন সেরনিয়াবাতের পুত্র হাসনাত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন তখন দলটিকে অভিসম্পাত করেন।

মোস্তাকের মন্ত্রীসভায় তিনি আবার যোগাযোগ মন্ত্রী হিসেবে বহাল হন ।

হত্যাকাণ্ডের পর তিনি বলেন যে তার পীর তাকে আগেই বলেছিলেন যে তার শত্রুদের করুণ পরিণতি হবে।

দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদনা পরিষদের সভাপতি মইনুল হোসেনের এবং মুজিব সরকারের একজন প্রতিমন্ত্রী কে এম ওবায়দুর রহমানের বাড়িতে বেশ কয়েকবার কয়েকজন ষড়যন্ত্রকারী বৈঠক করেন।

ওবায়দুর রহমানকে আওয়ামী লীগের সমাজ সেবা সচিবের পদ থেকে ১৯৭২ সালে ত্রাণ সামগ্রী অপব্যবহার এবং অর্থের বিনিময়ে বিশ্বাসঘাতকদের আশ্রয় দেয়ার অভিযোগে সরিয়ে দেয়া হয় । এরপরও ১৯৭৩ সালে প্রতিমন্ত্রীর পদ দেয়া হয়। অনেক আওয়ামী লীগ নেতা মনে করেন তাকে পুনর্বাসন করাটা একটা ভুল ছিল, কিন্তু কেউই এটা বলতে পারেননি কিভাবে গুরুতর অভিযোগে দলের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়ার এক বছরের মধ্যে তাকে রাজনীতিতে পুনর্বহাল করা হয়েছিল।

১৯৭৪ সালে ওবায়দুর রহমান তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলেছিলেন যে তাকে খুব শীঘ্রই পূর্ণ মন্ত্রী করা হবে। যখন আশা অনুসারে তার পদোন্নতি হয়নি তখন তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন।

তাহের উদ্দীন ঠাকুরও আশা করেছিলেন তাকে প্রতিমন্ত্রী থেকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রী করা হবে। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের মনোয়নে নির্বাচনের সুযোগ পাওয়ার আগে পর্যন্ত তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের প্রধান প্রতিবেদক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৩ সালে মুজিব তাকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব দেন। যদিও তথ্য মন্ত্রণালয় মুজিবের আওতায় ছিল, তারপরও প্রকৃত পক্ষে ঠাকুরই এ মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিলেন। দেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা কমিয়ে আনার উদ্যোগটি তিনিই নিয়েছিলেন। এমনকি যে সাংবাদিকরা তার তথ্য প্রতিমন্ত্রী হওয়াকে স্বাগত জানিয়েছিলেন তারাও তার বিপক্ষে চলে যান এ উদ্যোগের কারণে।

সবার ধারণা ছিল ঠাকুর মুজিবের খুব কাছের লোক ছিলেন। যখন মুজিব লাহোরে ইসলামিক সম্মেলনে যোগ দিতে যান তখন সাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রী কামাল হোসেন এবং ঠাকুরকে সাথে নিয়ে যান। কিন্তু মুজিব তার বন্ধুদের বলেছিলেন ঠাকুর তার নিজের সম্পর্কে মিথ্যা উচ্চ ধারণা পোষণ করেন। যখন ১৯৭৫ সালের ২৬ জানুয়ারি মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করেন তখন তিনি কুরবান আলী নামে একজন পুরোনো আওয়ামী লীগ নেতাকে তথ্য মন্ত্রীর পদে বহাল করেন। পদোন্নতির আশায় থাকা ঠাকুর আবিষ্কার করেন যে তার গুরুত্ব কমে গেছে। এবং এতে তিনি ক্ষুব্ধ হন। তার এক বন্ধু এতোটাই হতাশ হন যে তিনি মন্তব্য করেন, "২৫ জানুয়ারি যে বিপ্লব শুরু হয় তা ২৬ জানুয়ারিতেই শেষ হয়ে যায়।"

যাই হোক না কেন, এটা ভাবলে ভুল হবে যে ওবায়দুর রহমান ও তাহের উদ্দীন ঠাকুর তাদের আশা অনুসারে পদোন্নতি পান নি বলেই মুজিবের বিপক্ষে চলে

গিয়েছিলেন। ২৬ জানুয়ারি ১৯৭৫-এ মন্ত্রীসভার রদবদলের বেশ কয়েক মাস আগে থেকেই তারা মুজিব হত্যার চক্রান্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতার আগে মোহাম্মদুল্লাহ আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্পিকার আব্দুল হামিদের মৃত্যুর পর তিনি তার স্থলাভিষিক্ত হন। আবু সাইয়ীদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিলে ১৯৭৪ সালের ২৪ জানুয়ারি মুজিব মোহম্মদুল্লাহকে রাষ্ট্রপতি করেন। এটা মোহাম্মদুল্লাহর জন্য স্বপ্নেরও বেশি ছিল।

যেদিন মোহম্মদুল্লাহ রাষ্ট্রপতি হন সেদিন তিনি বলেন, "আমি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সত্যি করতে চাই। আমি বাংলাদেশের সব মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই।"

মোহাম্মদুল্লাহ এক বছর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে রূপান্তরিত হয় তখন তাকে মুজিবের রাষ্ট্রপতি শাসিত মন্ত্রীসভার একজন মন্ত্রী করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন এমন একজন ব্যক্তির জন্য এই অবনতি ছিল বড় রকমের।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট মোস্তাক মোহাম্মদুল্লাহকে উপ-রাষ্ট্রপতি করেন। আবু সাইয়ীদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি পদে অস্বস্তি বোধ করছিলেন এবং তিনি পদ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও সে পদেই বহাল ছিলেন। ন্যূনতম জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন করতে তিনি সময় নিয়েছিলেন, এবং তার নিজের মালিকানায় যে অতিরিক্ত জমি ছিল তা বিক্রি করার পরই তিনি ঐ বিল অনুমোদন করেছিলেন।

বিশেষ সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাকে একজন রাষ্ট্রদূত করা হয় যা একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির জন্য মানানসই। ১৫ আগস্টের মাত্র এক সপ্তাহ আগে তাকে মুজিব সরকারের মন্ত্রীসভায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

যখন সরকার সিদ্ধান্ত নেয় যে, যে সমস্ত সংসদ সদস্য বাকশালে যোগদান করবেন না তারা তাদের সদস্য পদ হারাবেন, তখন জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) এম. এ. জি. ওসমানী এবং মইনুল হোসেন তাদের সংসদ সদস্য পদ ত্যাগ করেন। একজন চিকিৎসক যিনি নিজে খুব তড়িঘড়ি করে পার্টি গঠনে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না তিনি বলেন, "যখনই ওসমানী পছন্দ করেন না এমন কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় তখনই তিনি দলের পদ বা প্রশাসনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ান। কিন্তু মইনুল হোসেন তার গণতান্ত্রিক মতাদর্শের জায়গা থেকে সংসদ সদস্য পদ ছাড়েন নি, বরং তিনি তার প্রভুদের নির্দেশেই কাজ করেছেন।"

মোস্তাকের মন্ত্রীসভায় একমাত্র নতুন মন্ত্রী ছিলেন শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, যার নাম মুজিব হত্যার চক্রান্তের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। যদিও এক সময় তাকে মুজিবের কাছের লোক মনে করা হত, তারপরও আওয়ামী লীগের

সংসদীয় দলের চিফ হুইপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন মন্ত্রীর পদ কখনো দেয়া হয়নি।

মোস্তাক শাহ মোয়াজ্জেমকে তার মন্ত্রীসভায় একজন প্রতিমন্ত্রী করেছিলেন।

ঘটনাচক্রে শাহ মোয়াজ্জেমই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা যিনি মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশ সফর করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তার সে সফর সফল ছিল।

মোস্তাকের মতোই শাহ মোয়াজ্জেমও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নীতি থেকে ডান পন্থার দিকে বেশি ঝুঁকে ছিলেন। যখন মোস্তাক আওয়ামী লীগ নেতাদের মন জয় করার আশা ছেড়ে গণতন্ত্রী লীগ গঠন করেন তখন শাহ মোয়াজ্জেম তার সাথে ছিলেন। এ দলের আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মইনুল হোসেন। তারা সব সময় একই রাজনৈতিক দলে ছিলেন।

কি কারণে ভারতীয় কূটনীতিক ভেবেছিলেন যে মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে, এমন কি রেডিওতে মৃত্যু সংবাদটি শোনার আগেই? যখন এই কূটনীতিককে এই প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি জবাব দেন, "তখন খুব একটা উত্তেজনাকর অবস্থা ছিল, সাধারণ্যে এমন একটা অনুভূতি কাজ করছিল যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।" অল্প একটু থেমে তিনি যোগ করেন, "বাংলা বর্ষপঞ্জি বাংলাদেশের নেতার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।"

হয়তো জোতিষ শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে এই কূটনীতিক বিশ্বাস করেছিলেন মুজিব নিহত হতে যাচ্ছেন।

হাসিনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন। কে হতে পারে এই নেতা? তিনি মাওলানা ভাসানীর কথা ভেবেছিলেন যার বয়স তখন ছিল আশির কোটায়। মুজিব বলেছিলেন "তোমার বাবাও তো হতে পারে।" খুব দুঃখিত হয়ে হাসিনা বলেছিলেন "তোমার এমন কথা মুখে আনা উচিৎ নয়।" মুজিব ভালোবেসে হেসেছিলেন।

হাসিনার দুশ্চিন্তা অমূলক ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সেনা আইন চালু হওয়ার পর থেকে অনেকবারই তিনি তার বাবার মুখে শুনেছিলেন যে পাক সেনা বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারে। মুজিব হাসিনাকে তার দেহের জন্মচিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন গুলো চিনে রাখতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ওরা আমাকে খুন করতে পারে। কিন্তু হয়তো ওরা আমার দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমাদের আমার দেহ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু পচনের কারণে আমার মৃতদেহের অবস্থা এমন হতে পারে যে শুধু দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারবে না। তখন এই চিহ্নগুলো দেখে তোমরা আমার লাশ সনাক্ত করতে পারবে।"

বাকশাল নেতাদের কাছে এমন অনেক বেনামী চিঠি আসছিল যেগুলোতে সামনে সরকার উৎখাতের উদ্যোগের কথা বলে সতর্ক করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা এসব চিঠি আমলে নেননি। একজন সংসদ সদস্য মোস্তাকের বাড়িতে ঘটতে থাকা বিভিন্ন কার্যকলাপে সন্দিগ্ধ হয়ে তা শেখ মণিকে জানান। কিন্তু তাতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আলেন্দেকে যখন ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয় তখন জিল্লুর রহমান, শেখ মণি এবং আলতাফ হুসেইনকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হ্যানয় যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে অবস্থান করছিল। তখন শেখ মণির প্রতিক্রিয়া ছিল, "এমন কোন অপচেষ্টা বাংলাদেশেও কেউ করতে পারে, এদিকে আমাদের কাছ থেকে আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত নেয়া হয়েছে।"

এই প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে। আলতাফ হোসেন মুজিবের একজন পুরোনো বন্ধু ছিলেন, তিনি মুজিবকে বলেন, "তুমি যদি সতর্ক না হও তাহলে তোমার পরিণতিও আলেন্দের মত হতে পারে।" মুজিব এমনভাবে হেসেছিলেন যেন তিনি কোন কৌতুক শুনছেন, তিনি জবাব দেন; "বাংলাদেশ চিলি নয়, আমি এদেশের মানুষকে চিনি।

ফিদেল কাস্ত্রো মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি যদি আপনার শত্রুদের কঠোর হাতে দমন না করেন, তাহলে ওরাই আপনাকে সরিয়ে দিবে।" মুজিব কাস্ত্রো তাকে যা বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন কিছুই করেননি।

ইন্দিরা গান্ধী কাস্ত্রোর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। তিনি মুজিবকে একাধিকবার সতর্ক করে বলেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত চলছে।

কিন্তু মুজিব এই সতর্ক বার্তা গুরুত্বের সাথে নেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায়ই মুজিব বলতেন যে, "একটি বুলেট আমাকে তাড়া করে ফিরছে।" কিন্তু তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না। একজন মানুষ যদি মৃত্যুভয়ে ভীত থাকে তাহলে তার আত্মমর্যাদা কোথায় থাকে?

মুজিবকে তার দেশের মানুষের সাথে খোলামেলাই মিশতে হত।

"আমার জনগণ আমাকে ভালোবাসে" এ কথাটি মুজিব বহুবার এমনভাবে বলতেন যেন এটি এমন এক মন্ত্র যা তাকে যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

সংসদীয় দলের চিফ হুইপ হওয়া সত্ত্বেও তাকে কোন মন্ত্রীর পদ কখনো দেয়া হয়নি।

মোস্তাক শাহ মোয়াজ্জেমকে তার মন্ত্রীসভায় একজন প্রতিমন্ত্রী করেছিলেন।

ঘটনাচক্রে শাহ মোয়াজ্জেমই প্রথম আওয়ামী লীগ নেতা যিনি মার্কিন সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশ সফর করেছিলেন। ১৯৭৩ সালের ১৮ অক্টোবর থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত তার সে সফর সফল ছিল।

মোস্তাকের মতোই শাহ মোয়াজ্জেমও আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নীতি থেকে ডান পন্থার দিকে বেশি ঝুঁকে ছিলেন। যখন মোস্তাক আওয়ামী লীগ নেতাদের মন জয় করার আশা ছেড়ে গণতন্ত্রী লীগ গঠন করেন তখন শাহ মোয়াজ্জেম তার সাথে ছিলেন। এ দলের আরেকজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন মইনুল হোসেন। তারা সব সময় একই রাজনৈতিক দলে ছিলেন।

কি কারণে ভারতীয় কূটনীতিক ভেবেছিলেন যে মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে, এমন কি রেডিওতে মৃত্যু সংবাদটি শোনার আগেই? যখন এই কূটনীতিককে এই প্রশ্ন করা হয়, তখন তিনি জবাব দেন, "তখন খুব একটা উত্তেজনাকর অবস্থা ছিল, সাধারণ্যে এমন একটা অনুভূতি কাজ করছিল যে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে।" অল্প একটু থেমে তিনি যোগ করেন, "বাংলা বর্ষপঞ্জি বাংলাদেশের নেতার মৃত্যুর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল।"

হয়তো জোতিষ শাস্ত্রের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে এই কূটনীতিক বিশ্বাস করেছিলেন মুজিব নিহত হতে যাচ্ছেন।

হাসিনাও এই ভবিষ্যদ্বাণীর কথা জানতেন। কে হতে পারে এই নেতা? তিনি মাওলানা ভাসানীর কথা ভেবেছিলেন যার বয়স তখন ছিল আশির কোটায়। মুজিব বলেছিলেন "তোমার বাবাও তো হতে পারে।" খুব দুঃখিত হয়ে হাসিনা বলেছিলেন "তোমার এমন কথা মুখে আনা উচিৎ নয়।" মুজিব ভালোবেসে হেসেছিলেন।

হাসিনার দুশ্চিন্তা অমূলক ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সেনা আইন চালু হওয়ার পর থেকে অনেকবারই তিনি তার বাবার মুখে শুনেছিলেন যে পাক সেনা বাহিনী তাকে হত্যা করতে পারে। মুজিব হাসিনাকে তার দেহের জন্মচিহ্ন ও অন্যান্য চিহ্ন গুলো চিনে রাখতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "ওরা আমাকে খুন করতে পারে। কিন্তু হয়তো ওরা আমার দেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর নাও করতে পারে। সেক্ষেত্রে তোমাদের আমার দেহ খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু পচনের কারণে আমার মৃতদেহের অবস্থা এমন হতে পারে যে শুধু দেখে তোমরা আমাকে চিনতে পারবে না। তখন এই চিহ্নগুলো দেখে তোমরা আমার লাশ সনাক্ত করতে পারবে।"

বাকশাল নেতাদের কাছে এমন অনেক বেনামী চিঠি আসছিল যেগুলোতে সামনে সরকার উৎখাতের উদ্যোগের কথা বলে সতর্ক করা হচ্ছিল, কিন্তু তারা এসব চিঠি আমলে নেননি। একজন সংসদ সদস্য মোস্তাকের বাড়িতে ঘটতে থাকা বিভিন্ন কার্যকলাপে সন্দিগ্ধ হয়ে তা শেখ মণিকে জানান। কিন্তু তাতে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

আলেন্দেকে যখন ১৯৭৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর হত্যা করা হয় তখন জিল্লুর রহমান, শেখ মণি এবং আলতাফ হুসেইনকে নিয়ে গঠিত তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল হ্যানয় যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে অবস্থান করছিল। তখন শেখ মণির প্রতিক্রিয়া ছিল, "এমন কোন অপচেষ্টা বাংলাদেশেও কেউ করতে পারে, এদিকে আমাদের কাছ থেকে আমাদের অস্ত্রগুলো ফেরত নেয়া হয়েছে।"

এই প্রতিনিধি দলটি ঢাকায় ফিরে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে। আলতাফ হোসেন মুজিবের একজন পুরোনো বন্ধু ছিলেন, তিনি মুজিবকে বলেন, "তুমি যদি সতর্ক না হও তাহলে তোমার পরিণতিও আলেন্দের মত হতে পারে।" মুজিব এমনভাবে হেসেছিলেন যেন তিনি কোন কৌতুক শুনছেন, তিনি জবাব দেন; "বাংলাদেশ চিলি নয়, আমি এদেশের মানুষকে চিনি।

ফিদেল কাস্ত্রো মুজিবকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, "আপনি যদি আপনার শত্রুদের কঠোর হাতে দমন না করেন, তাহলে ওরাই আপনাকে সরিয়ে দিবে।" মুজিব কাস্ত্রো তাকে যা বলেছিলেন তা পুনরাবৃত্তি করতে পারতেন, কিন্তু তিনি কোন কিছুই করেননি।

ইন্দিরা গান্ধী কাস্ত্রোর চেয়েও স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন। তিনি মুজিবকে একাধিকবার সতর্ক করে বলেছিলেন যে তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত চলছে।

কিন্তু মুজিব এই সতর্ক বার্তা গুরুত্বের সাথে নেন নি।

দেশ স্বাধীন হবার পর প্রায়ই মুজিব বলতেন যে, "একটি বুলেট আমাকে তাড়া করে ফিরছে।" কিন্তু তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত ছিলেন না। একজন মানুষ যদি মৃত্যুভয়ে ভীত থাকে তাহলে তার আত্মমর্যাদা কোথায় থাকে?

মুজিবকে তার দেশের মানুষের সাথে খোলামেলাই মিশতে হত।

"আমার জনগণ আমাকে ভালোবাসে" এ কথাটি মুজিব বহুবার এমনভাবে বলতেন যেন এটি এমন এক মন্ত্র যা তাকে যে কোন বিপদ থেকে রক্ষা করবে।

একটি পারিবারিক বিষয়

ফারুক হেমলেট হিসেবে জন্ম নেন নি যার কাজ ছিল 'সব কিছু ঠিক করে দেয়া'। তিনি ছিলেন খুব ঠাণ্ডা মাথার আর ভীষণ হিসেবী লোক। তার কিছু কিছু উর্ধ্বতন কর্মকর্তা মনে করেন তার বুদ্ধিমত্তা ছিল উচ্চ পর্যায়ের। হিটলারের বুদ্ধিমত্তাও উচ্চ পর্যায়ের ছিল বলে জানা যায়।

ফারুক দাবি করেন তার কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকায় তিনি রশিদের পরামর্শ মত মোস্তাককে রাষ্ট্রপতি করতে রাজি হয়েছিলেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্য কাউকে মতায় বসাতে মুজিব হত্যার চক্রান্তে অংশ নেন নি। তিনি নিজেই আসলে রাষ্ট্রপতি হতে চেয়েছিলেন।

একজন আত্মীয় আদর করে ছেলেবেলায় তাকে 'ভোমরা' বলেছিলেন। এ নামটি তাকে বেশ মানিয়ে যায় এবং এ নামটি তার সঙ্গে বড় হওয়ার পরও থেকে যায়।

তার বক্তব্যগুলোতে 'আমি' শব্দটি বেশি বেশি শোনা যায়: 'আমি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনাটি সাজিয়ে ছিলাম...' 'আমি মুজিবকে হত্যার হুকুম দিয়েছিলাম...' 'আমি মুজিবের মৃত্যুর নির্দেশ দিয়েছিলাম...'। রশিদ তুলনামূলকভাবে কম অহঙ্কারী ছিলেন, কিন্তু তিনিও নিজের কথা বেশি করে বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। ফারুক বা রশিদের কেউই কখনও 'আমরা' শব্দটি ব্যবহার করতেন না, যদিও তারা দুজনে মিলেই চক্রান্ত করেছিলেন। ডালিম বেশ অহঙ্কারের সাথেই নিজের নাম ঘোষণা করেছেন যখন তিনি রেডিওতে মুজিব সরকারকে উৎখাত করার ঘোষণা পাঠ করেন। রশিদ হুদাকে যিনি মুজিবকে গুলি করতে ব্যর্থ হন তাকে খুব একটা পছন্দ করতেন না। হুদা রশিদের ট্যাঙ্কে বসে মুজিব হত্যার নির্দেশ দেয়ার দাবি নিয়ে কৌতুক করতেন। অভ্যুত্থানের এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তার ফল স্বরূপ আগে বা পরে সংঘর্ষ দেখা দিতই।

১৯৭৪ সালের গ্রীষ্মকাল থেকে ফারুক এবং রশিদ মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত শুরু করেন। তারা একে অপরের ভায়রা ভাই ছিলেন এবং ঢাকা সেনানিবাসে পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। একে অপরের সাথে দেখা করার অনেক সুযোগ তারা পেয়েছিলেন এবং এক বছর সময় নিয়ে অনেক যত্নের সাথে তারা মুজিব হত্যার চক্রান্ত সাজিয়েছিলেন।

তাদের এই মারাত্মক ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের ব্যাপারে ফারুক এবং রশিদ দুজনেই বদ্ধ পরিকর ছিলেন। তারা প্রচণ্ড উচ্চাকাঙ্ক্ষী তরুণ ছিলেন যারা মতা দখল করার কথা ভাবতেন, কিন্তু তারা এও জানতেন তাদের কর্তৃত্ব অবশ্যই চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। সামনে রাখার জন্য তাদের একজন কাউকে দরকার ছিল। রশিদ মুজিব সরকারের ব্যবসা ও বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রী মোস্তাকের নাম প্রস্তাব করেন। মোস্তাক যে তার চাচা হন এ বিষয়টি তিনি সামনে আনেননি।

ফারুক তার ভায়রা ভাইয়ের এ প্রস্তাব মেনে মোস্তাককে তাদের সামনে রাখার মত লোক হিসেবে মেনে নেন।

এটা ছিল একটি পারিবারিক বিষয়।

তারুণ্যের দম্ভ নিয়ে রশিদ দাবি করে থাকেন তিনি মোস্তাককে মুজিব হত্যার চক্রান্তে যুক্ত করেন অভ্যুত্থান সংঘটিত হবার বড় জোড় দুই সপ্তাহ আগে। কে কাকে যুক্ত করেছিল?

মোস্তাক সব সময়ই মুজিবকে তার পথ থেকে সরাতে চাইতেন, কিন্তু নিজে কিছু করার মত সাহস তার কখনোই ছিল না। যাই হোক, তার সাহসের অভাব তিনি কৌশল দিয়ে পূরণ করতেন। ফারুক এবং রশিদ বুদ্ধিমান হলেও মোস্তাকের চতুরতার সামনে তারা প্রায় কিছুই না, মোস্তাক ছিলেন একজন আজন্ম কৌশলী ধূর্ত ব্যক্তি।

ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কেউ কেউ জেষ্ঠ্য সেনা কর্মকর্তাদের দিয়ে অভ্যুত্থান ঘটাতে চাইলেও মোস্তাক এটা বিশ্বাস করতেন না যে জেষ্ঠ্য সেনা কর্মকর্তাদের কেউ চালের গুটি হিসেবে কাজ করতে রাজি হবেন। যদি অভ্যুত্থান সফল হয় তখন ঐ কর্মকর্তারা তাকে সরিয়ে দিতে পারেন। তার চেয়ে রশিদ এবং ফারুককে দিয়ে কাজ করানো সহজতর হবে। যখন তিনি রশিদের মাথায় সব চক্রান্ত ঢুকাচ্ছিলেন পাশাপাশি তিনি তাকে এটা বিশ্বাস করাতে সম হয়েছিলেন যে তিনি তাদের নিজের লোক মনে করেন।

যেহেতু ডালিম রেডিওতে অহঙ্কারের সাথে নিজের নাম ঘোষণা করেছিলেন তাই দেশের বাইরের অনেকে মনে করেছিলেন হয়তো ডালিমই এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছেন।

কোলকাতার সাংবাদিকদের মধ্যে যারা মুক্তিযুদ্ধের খবর পরিবেশন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে ঢাকা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন তারা এ ভুল করেন নি। এরপরও ১৫ আগস্টের রক্তপাতের ঘটনার এক মাস পরও কোলকাতার সাংবাদিকদের কেউ কেউ এমন গল্প চালাতে লাগলেন যাতে অভ্যুত্থানটিকে মান-সম্মানের সাথে জড়িত বলে মনে হতে পারে। হয় তারা ভয়াবহ অজ্ঞ, নয়তো তারা বিকৃত রকম অসৎ। কিন্তু যেহেতু তাদের জ্ঞানী মনে করা হত তাই তাদের বলা ভুল গল্পগুলো অনেকেই বিশ্বাস করতে লাগলো।

যখন মিথ্যাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হয় তখন অনেক বড় তি হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে যেসব গল্প অনেক সাংবাদিক ছড়াতে থাকেন তার ফলে মানুষের মনে দ্বিধা তৈরি হয় এবং তাদের বিচার-বুদ্ধি ধোঁয়াশাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। হয়তো এ উদ্দেশ্যেই এসব গল্প তৈরি করা হয়েছিল।

কোলকাতার সানডে পত্রিকায় ১৯৭৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর প্রথম পাতায় একটি ফটোগ্রাফ ছাপা হয় যাতে দেখা যায় ডালিম তার 'অপূর্ব সুন্দরী' স্ত্রী তাসমিনকে নিয়ে বাড়ির লনে পায়চারী করছেন। তার চেহারা এমন ছিল না যা দেখে সহস্র জাহাজ যুদ্ধযাত্রা করবে, লেখক লিখেছেন, কিন্তু ডালিম সবাইকে এটা বিশ্বাস করাতে চেয়েছিলেন যে তার মুখের দিকে চেয়েই ১৫ আগস্ট ভোরের অভ্যুত্থানের সময় ট্যাঙ্কগুলো চলতে শুরু করেছিল। তাসমিনকে তার বিবাহ পরবর্তী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে শেখ মুজিবের 'সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু' গাজী গোলাম মোস্তফার পুত্ররা অপমান করে। বিচারের প্রত্যাশায় ডালিম ও তার স্ত্রী তাদের কিছু বন্ধুদের পাহারায় শেখ মুজিবের বাড়িতে যান। সেখানে গাজী আর তার পুত্ররা আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তারা গাজীর বাড়িতে ধ্বংস লীলা চালিয়েছিলেন। মুজিব তাদের এই দুর্বৃত্ত সুলভ আচরণের কারণে বিচার করতে রাজি হননি। এবং মেজর ডালিম প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। এই প্রতিজ্ঞাটি দৃঢ়ভাবে পালিত হয়েছিল।

ডালিমের প্রতি লেখকের শ্রদ্ধা এখানে স্পষ্টভাবে ফুঠে উঠেছে।

নিশ্চয়ই ডালিম ও তার নবপরিণিতা স্ত্রী তাদের বিয়ের রাতেই মুজিবের বাড়িতে যান নি।

ডালিম আর তাসমিনের বিয়ে হয় ১৯৭১ সালে। মুক্তি বাহিনীর সাথে যুদ্ধে অংশ নেয়ার সময় ডালিম আহত হন। এতে করে তিনি যুদ্ধের বাইরে থাকলেও ঐ সময়ে কোলকাতায় কর্মরত বাঙালী কূটনীতিকের কন্যা তাসমিনকে মুগ্ধ করে তার হৃদয় জিতে নেওয়ার সময় পেয়েছিলেন।

সানডে পত্রিকায় যে ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তা ঘটেছিল ডালিমের বোনের বিয়েতে। গাজী গোলাম মোস্তফার একজন পুত্র খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। বোনকে অপমান করার অপরাধে ডালিম সেই পুত্রকে থাপ্পড় দেন।

গাজী ডালিমকে মুজিবের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাসমীন তার স্বামীর সঙ্গে ছিলেন মাত্র।

মুজিব সব সময়ই শান্তিকামী ছিলেন, তিনি গাজী এবং ডালিমকে একে অপরের সাথে হাত মেলাতে বলেন এবং তাদের মধ্যকার দ্বন্দ্ব সমাধান হওয়ায় সবার মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করেন। ততক্ষণে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে।

কিন্তু এখানেই ঘটনা শেষ হয়নি।

কিছু সেনা কর্মকর্তা নয়া পল্টনে গাজীর বাড়িতে হামলা করে ভাঙচুর চালান এবং হুমকি দেন যে ডালিমের কিছু হলে শহরে সংঘর্ষ বেঁধে যাবে। অনেকে বলেন ডালিম নিজে ট্রাকে করে ভাঙচুর চালানোর জন্য সৈনিকদের নিয়ে আসেন। কিন্তু তার বন্ধুদের কৃতকর্মের কোন দায়িত্ব নিতে ডালিম নারাজ ছিলেন। তিনি বলেন,

"আমাকে তো গাজী ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি কিভাবে এসব ভাঙচুর করবো।"

সেনা সদর দপ্তর গাজী বাড়িতে এই ভাঙচুরের ঘটনা তদন্ত করে এবং এ ঘটনার সাথে জড়িত কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার নির্দেশ দেয়। তখন সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। যে সেনা কর্মকর্তারা আইন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাদের কোন শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেয়ার কোন সুযোগ ছিল না।

কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী মুজিবকে সেনা কর্মকর্তাদের বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তটি প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন, কিন্তু সেবারের মত মুজিব তার সিদ্ধান্তে অটল ছিলেন। তিনি বলেন "এটা সেনা সদরের সিদ্ধান্ত"।

ডালিম, তার স্ত্রী তাঁসমিন এবং তার শ্বাশুড়ি হেনা ডালিম পদচ্যুত হওয়ার পরও মুজিবের বাড়িতে নিয়মিত বেড়াতে যেতেন।

তাসমিনের মা দেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবার পড়ালেখা শুরু করেছিলেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞানে অধ্যয়ন করছিলেন। ছাত্র শিক্ষক সবাই তাকে হেনা ভাবি ডাকতেন। তিনি বেগম মুজিব এবং হাসিনা দুজনেরই বন্ধু ছিলেন, তিনি শেখ মুজিবের বাড়িতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন ।

ডালিম তার মায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। তিনি স্কুলে থাকতেই তার মা মারা যান। মায়ের মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে পড়েন এবং তার বাবা আরেকজন কম বয়স্ক নারীকে নিজের দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে তিনি তার বাবার কাছ থেকেও কিছু সময়ের জন্য দূরে সরে যান।

ডালিম বেগম মুজিবকে বলতেন, "আমি ছেলেবেলায় আমার মাকে হারিয়েছি। এখন আপনি আমার মা।" বাঙালী সংস্কৃতি অনুসারে বিশেষ উৎসবের সময় তিনি বেগম মুজিবের পা ছুঁয়ে তার প্রতি তার ভালোবাসা জ্ঞাপন করতেন।

তিনি তার ব্যক্তিগত সমস্যাও বেগম মুজিবের কাছে জানাতেন। তার একটি প্রধান দুশ্চিন্তা ছিল যে তার কোন সন্তান ছিল না। বেগম মুজিব তাকে আশ্বস্ত করে বলতেন, "তোমার মাত্র দু'তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে। নিশ্চয়ই তোমার সন্তান হবে।" এরপরও যখন ডালিম আশ্বস্ত হচ্ছিলেন না তখন বেগম মুজিব একজন চিকিৎসকের নাম তাকে বলেন যার সাথে ডালিম ও তার স্ত্রী আলাপ করতে পারেন।

আপাতদৃষ্টিতে ডালিম বেগম মুজিবের অন্ধ ভক্ত ছিলেন।
সেনাবাহিনী থেকে পদচ্যুত হওয়ার পর যখন ডালিম ব্যবসা শুরু করেন তখন মুজিব তাকে সাহায্য করেছিলেন। মুজিব এবং ডালিম প্রায়ই ভাগাভাগি করে খিচুড়ি খেতেন যা তাদের দুজনেরই খুব পছন্দের খাবার ছিলো। কিন্তু পুরোটা সময়ই ডালিমের মনের মধ্যে এই ক্ষোভ ছিল যে তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

একদিন রেহানা যে খুব স্পষ্টভাষী ছিলেন, ডালিমকে বলেন, "আপনি যখন আমার বাবা সম্পর্কে অনেক বাজে কথা বলে বেড়ান, তখন আপনি আমাদের বাড়িতে কেন আসেন?" হেনাও তার মেয়ের জামাইকে তিরস্কার করে বলেন, "তোমার যত্র তত্র কাণ্ডজ্ঞানহীনের মত কথা বলা উচিৎ নয়।"

ডালিম জবাবে রেহানাকে বলেছিলেন, "সময় এলেই দেখতে পাবে কে তোমাদের প্রকৃত বন্ধু।"

কিছুদিন ডালিম মুজিবের বাড়ি থেকে দূরে দূরে ছিলেন।

ডালিম যখন বিবাহ পরবর্তী সংবর্ধনার রাতেই প্রতিশোধের শপথ নিয়েছিলেন তখন তিনি কেন গাজী গোলাম মোস্তফাকে ছেড়ে দিলেন? "তাকে হত্যা করে আমি আমার হাত নোংরা করতে চাইনি" ডালিম তার বন্ধুদের বলেছিলেন।

গাজী গোলাম মোস্তফা একজন অজনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐ সময়ে ডালিমের কোন ক্ষতি করার চেয়ে তিনি বরং নিজের প্রাণ বাঁচানো নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন। ডালিমের হাতে তখন অন্য গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল।

ডালিমকে খুব ভালোভাবে চেনেন এমন একজন বলেন ডালিম শেখ মুজিবের মধ্যে নিজের বাবাকে খুঁজে পেয়েছিলেন যাকে এক সময় তিনি হত্যা করতে চেয়েছিলেন। ডালিমের মধ্যে একটি ধ্বংসাত্মক প্রবণতা আছে এবং মাঝে মাঝে তিনি এমন আচরণ করেন যে মনে হয় তার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেয়েছে। একবার একটি মেয়ে ডালিমের একজন বন্ধুকে কষ্ট দেয়ায় ডালিম ঐ মেয়েটির হোস্টেলে গিয়ে শুধু মেয়েটিকেই নয় সাথে সাথে তার বন্ধুদেরকেও হত্যার হুমকি দেন।

সত্যি কথা হল মুজিব হত্যা একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যা খুব সাবধানে সাজানো হয়েছে এবং এটি কোন মান সম্মানজনিত লড়াইয়ের ফল নয় বা কোন মনস্তাত্ত্বিক নাটকও নয়।

মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যার কয়েকদিন পর্যন্ত তাসমিন পাগলের মত আচরণ করতে থাকেন। সবাই মেজরদের সামনে সতর্ক থাকতেন কারণ তারা হত্যা করার মন মানসিকতায় ছিলেন। কিন্তু তাসমিনের মনে কোন ভয় ছিল না। তিনি মেজরদের দেখলেই তাদের মুখে থুতু মারতেন।

তখন ব্যাপক হারে চোরাচালানী চলছিল এবং অনেক প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা এর সাথে জড়িত ছিলেন। চোরাচালান বন্ধে সরকারী উদ্যোগগুলো ফলপ্রসূ ছিল না। ১৯৭৪ সালে যৌথ চোরাচালানরোধী অভিযানে অংশ নেয়ার জন্য সেনা বাহিনী মোতায়েন করা হয়। এটি ছিল একটি রাজনৈতিক দুর্যোগ। সরকার এমন একটা ধারণা জন্ম দিল যে বেসামরিক প্রশাসন যেখানে ব্যর্থ হয় সেখানে সামরিক কর্তৃপক্ষ সফল হতে পারে।

দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছর পর ১৯৭৩ সালের শেষ দিক থেকেই সেনা কর্মকর্তারা তাদের বল প্রয়োগ শুরু করেন।

১৯৭৩ সালের নির্বাচনে সারাদেশে আওয়ামী লীগ শতকরা ৭২ ভাগ ভোট পায়। ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় ভোটের চিত্র ছিল এর প্রায় বিপরীত।
১৯৫৭ সালে 'অপারেশন ক্লোজড ডোর' নামে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে যে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায় তা ছিল ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে সেনা শাসন কায়েমের পূর্ব প্রস্তুতি।

১৯৭৪ সালে সেনাবাহিনীকে চোরাচালান বিরোধী অভিযানে অংশ করে মুজিব সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি আরও গ্রহণযোগ্য করেছিলেন এবং সেনা কর্মকর্তাদের মতার স্বাদ পেতে দিয়েছিলেন। পুরো বিশ বছর সেনা শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসা শেখ মুজিব এই ভুলটি কিভাবে করলেন।

দুই একজন সম্মানিত ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব ছাড়া অধিকাংশ সেনা কর্মকর্তা আর জওয়ানই সৎ ছিলেন না বলে বদনাম ছিল। কিছু সেনা কর্মকর্তা এবং সৈনিক দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই দ্রব্য আত্মসাত, গাড়ি ছিনতাই এবং এমনকি নারী অপহরণের মত অপরাধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। মেজরদের মধ্যে একজন এক তরুণ মুক্তিযোদ্ধার গাড়ি জোড় করে নিয়ে নেন। ঐ তরুণ প্রতিবাদ করলে মেজর শ্লেষের সাথে বলেন, "আমার এই গাড়িটি পছন্দ হয়েছে। পুরুষ মানুষের মতো আচরণ কর। আরেকটি গাড়ি কিনে নাও।"

সেনাবাহিনী সদস্যরা চোরাচালান বিরোধী অভিযানে অংশ নিয়ে জনমনে ব্যাপক আতঙ্ক তৈরি করে, বিশেষ করে কুমিল্লা জেলায়। তারা কিছু বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার নামে অভিযোগ আনে। মোস্তাক নিজে কুমিল্লার লোক ছিলেন এবং তিনি চিন্তায় পড়ে যান। আওয়ামী লীগে যারা সেনা বাহিনীকে যৌথ অভিযানে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন তিনি তাদের মধ্যে একজন, কিন্তু এখন তিনি চাচ্ছিলেন যেন সেনা বাহিনীকে সরিয়ে নেয়া হয়। তিনি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সহায়তা চাইলেন। তারা দুজনে মিলে শেখ মুজিবকে এটা বিশ্বাস করাতে সক্ষম হলেন যে সেনাবাহিনী আসলে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধেই অভিযান চালাচ্ছে।

ফারুক ছিলেন ২ নং ফিল্ড আর্টিলারির কমান্ডার এবং রশিদ বেঙ্গল ল্যান্সারের ভারপ্রাপ্ত কমান্ডার। ঢাকা বিমানবন্দরের কাছে নিয়মিত বিরতিতে রাতের বেলা আর্টিলারি আর ল্যান্সারের যৌথ মহড়া করার জন্য ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে তারা সেনা সদরের অনুমতি চান। কোন সমস্যা নেই বলে বেশ দ্রুতই তাদের অনুমতি দেয়া হয়—ভাবলে মনে হবে যেন একটু বেশি দ্রুতই তাদের অনুমতিটি চলে আসে।

ট্যাঙ্কে কোন গোলা ছিল না। রশিদের মতে ল্যান্সাররা বাদে আর অল্প কিছু কর্মকর্তাই শুধু এটা জানতেন। খুবই হাস্যকর কথা। যখন ৭০০ জন ল্যান্সার এ কথা জানতো তার মানে এটি আর কোন গোপন কথা ছিল না। অন্তত ঢাকায় না। অন্তত সেনা গোয়েন্দারা আর রক্ষীবাহিনীর কর্মকর্তারা এটা জানতেন। মুজিবের কিছু রাজনৈতিক সহযোগী দাবি করেন তারা মুজিবকে ট্যাঙ্কগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি কি তাদের বলেননি যে এই ট্যাঙ্কগুলোতে কোন গোলা ছিল না, যেখানে তিনি আনোয়ার সাদাতের কাছ থেকে উপহার পাওয়া এই ট্যাঙ্কগুলো নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট ছিলেন না।

মাঠ পর্যায়ের গোয়েন্দা ইউনিটের মাত্র ২০০ মিটারের মধ্যেই চক্রান্তগুলোর একটা বড় অংশ করা হয়েছে, অথচ এই ইউনিটের দিন রাত ২৪ ঘণ্টাই কাজ করার কথা।

ছুটিতে গিয়ে ব্রিগেডিয়ার রউফ এই ইউনিটের দায়িত্ব ব্রিগেডিয়ার জামিলের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াটি এক মাস পিছিয়ে দেন। ১৯৭৫ সালের এপ্রিলে এই ইউনিটের কিছু কর্মকর্তা বই ও চলচ্চিত্র সংগ্রহের ছলে দূতাবাসগুলোতে যান, তারা আসলে জানতে গিয়েছিলেন মুজিব সরকার সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর মতামত কী। একজন কূটনীতিক আমাকে বলেন, "সেনা গোয়েন্দা বিভাগের একজন মেজর আমাকে ফোন করে জানিয়েছেন কিছু চলচ্চিত্র নিয়ে আলাপের জন্য তিনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চান। দেখা হওয়ার পর তিনি আমার সাথে মূলত দেশের দূরবস্থার কথাই বেশি আলাপ করেন। আলাপের একদম শেষদিকে যে চলচ্চিত্রটি নিয়ে আলাপের জন্য তিনি এসেছিলেন সেটির কথা তার মনে পড়ে। তিনি বলেন যে পরে তিনি চলচ্চিত্রগুলোর জন্য আবার আসবেন। তিনি পরে আর আসেননি।"

অনেকেই মনে করেন ১৩ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যে গ্রেনেড বিস্ফোরণ হয় তার সাথে সেনা গোয়েন্দা সংস্থার যোগাযোগ রয়েছে। তাদের ধারণা ঠিক হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। উর্ধ্বতন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা হয় ভয়ঙ্কর রকম অদক্ষ ছিলেন নয়তো তারা এই চক্রান্তের অংশ ছিলেন। এমন অনেক কারণ রয়েছে যার ফলে মুজিব হত্যায় তাদের হাত রয়েছে বলে মনে হতে পারে।

১৫ আগস্ট যেদিন মুজিব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবেন সেদিন তাকে এক সেট রবীন্দ্র সমগ্র উপহার দিবেন বলে ঠিক করে রেখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মতিন চৌধুরী। সেনা গোয়েন্দারা কোলকাতা থেকে রবীন্দ্র সমগ্র'র সেটটি ঢাকায় আসার সাথে সাথেই এটি বাজেয়াপ্ত করেন। ড. চৌধুরী খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন। সেনা গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাকে জানান, "শেখ মুজিবের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সফরের সাথে সম্পৃক্ত সব কিছুই আমাদের অনুমোদিত হতে হবে।"

ব্রিগেডিয়ার রউফ অভ্যুত্থানের দুদিন আগে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে বসে মুজিবের বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে কথা বলছিলেন। যখন তার মদ্য পানের সাথীরা তাকে নিরস্ত্র করতে যান তখন তিনি বলেন, "তোমাদের বঙ্গবন্ধুর করুণ পরিণতি হবে।"

ফারুক বলেন যে তার হিসেব ছিল কেউই এটা ভাবতে পারবেন না যে তিনি অল্প কয়েকটি ট্যাঙ্ক নিয়ে যেগুলোর কোন গোলা নেই তা নিয়ে সেনা সদরের এবং রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে যেতে পারেন। সব বিবেচনায়ই ফারুক একজন সাহসী সেনা কর্মকর্তা, কিন্তু তিনি নিশ্চিতভাবেই মাথামোটা বা গোঁয়ার ছিলেন না। তার অধীনে মাত্র ৭০০ লোক ছিল এবং যদি ঢাকা ব্রিগেড আর রী বাহিনী তার বিরুদ্ধে লড়াই চালাতো তাহলে তার জেতার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তিনি নিশ্চয়ই জানতেন যারা তার ট্যাঙ্কগুলোতে গোলা না থাকার কথা জানতেন তার কেউ সেটা ধরিয়ে দেবেন না। নিশ্চয়ই কোনভাবে এটা ফারুক নিশ্চিত করেছিলেন।

আনসার বাহিনী একটি সহযোগী বাহিনী, এর পরিচালক জহুরুল হক আনসার সদস্যদের ১৫ আগস্ট কোন কিছুতে না জড়ানোর পরামর্শ দেন। তিনি একজন বিশ্বাসঘাতক ছিলেন, স্বল্পমেয়াদে জেল খাটার পর তাকে পুনর্বাসিত করা হয়। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছেন এমন অনেক উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও এর মধ্যে জড়াতে চাননি। হয়তো তারা ভেবেছিলেন যে কিছু অধীনস্ত কর্মকর্তা এই অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তাদের জেষ্ঠ্যতা লঙ্ঘন করলেও শেষ পর্যন্ত উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাদের লাভই হবে। কারণ নতুন সরকার তাদের উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল হবে। যদিও এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে কিছু কিছু উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তাকে শান্ত করা হয়েছিল বা অর্থের বিনিময়ে কিনে নেয়া হয়েছিল।

শান্ত করার কথা হুদা প্রায়ই বলতেন। তিনি দাবি করেন তার প্রধান কাজ ছিল ১৫ আগস্ট সকালে মুজিবের বাড়িতে প্রহরার দায়িত্বে থাকা সৈনিকদের 'শান্ত' করা। তাদের তিনি শান্ত করেছিলেন ঠিকই তবে ১৫ আগস্ট সকাল বেলা নয়। তিনি বারবার বলেন "সৈনিকেরা আমাকে ভালোবাসত।" কিন্তু নিশ্চয়ই ভালোবাসার কারণে ঐ প্রহরীরা তাকে বিনা প্রতিবাদের মুজিবের বাড়িতে ঢুকতে দেন নি?

সশস্ত্র বাহিনী ও আধা সামরিক বাহিনীর অনেক কর্মকর্তা ল্যান্সারদের চ্যালেঞ্জ করতে চেয়েছিলেন। বিমান বাহিনীর কিছু কর্মকর্তা ট্যাঙ্কগুলোতে বোমা ফেলতে চেয়েছিলেন। ঢাকা ব্রিগেডের কর্নেল শাফাত জামিলের ইচ্ছা ছিল প্রতিরোধ করার এবং তার অধীনস্ত সৈনিকেরাও তার সাথে ছিলো। কিন্তু তার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ ছিল: "অপেক্ষা কর", ঠিক যেমনটি ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল।

কেউ কেউ তাদের তৎপর না হওয়ার অজুহাত হিসেবে বলেছিলেন, "আমরা জানতাম না যে ট্যাঙ্কগুলোতে কোন গোলা ছিল না।" ট্যাঙ্কে গোলা থাকলেও ল্যান্সারদের প্রতিরোধ করা যেত। আসলে যে জিনিসের অভাব ছিল তা হল লড়াই করার ইচ্ছা।

মাত্র ৭০০ ল্যান্সার ছিল আক্রমণকারী দলটিতে এবং ঢাকা শহরে অল্প কয়েকটি প্রশস্ত রাস্তা ছিল ফলে এ শহর ট্যাঙ্ক যুদ্ধের উপযোগী ছিল না মোটেই। ঐ ট্যাঙ্কগুলোর পক্ষে এক গলি থেকে আরেক গলিতে গিয়ে যুদ্ধ করা সম্ভব ছিল না।

পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক দেখে মুক্তিযোদ্ধারা কখনো ভয় পায়নি, এবং রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা ছিল মুক্তিযোদ্ধা। তাদের মধ্যে অনেক মতবিরোধ ছিল, সার্বিকভাবে তারা সবাই বঙ্গবন্ধুর অনুগত ছিলেন। তাদের যা দরকার ছিল তা হল দিক নির্দেশনা। রক্ষীবাহিনীর পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ঐ সময় লন্ডনে ছিলেন এবং তার দু'জন সহকারী তখন ছুটিতে ছিলেন। বাহিনীর চার জন শীর্ষ ব্যক্তির মধ্যে তিনজনই কেন সে সময় দায়িত্বে ছিলেন না তার কোন ব্যাখ্যা নেই।

তোফায়েল আহমেদ সে সময় রক্ষীবাহিনীকে পাল্টা যুদ্ধ করার নির্দেশ দেয়ার ব্যাপারে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তিনি বলেন, "তাদের যদি সত্যিই লড়াই করার ইচ্ছা থাকত এবং আমি তাদের বাধা দিয়ে থাকি তাহলে তাদের উচিৎ ছিল আমাকে হত্যা করা।" তার মতে, তিনি নিজেই সে সময় শের-এ-বাংলা নগরে রক্ষীবাহিনীর দপ্তরে গিয়েছিলেন এবং এমন কিছু সামরিক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করেছিলেন যাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। তাদের মধ্যে একজন তাকে সে সময় হুমকি দিয়েছিলেন যে তিনি যদি রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্প ত্যাগ না করেন তাহলে তাকে হত্যা করা হবে।

১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের চার বছর পর বিদেশী সাংবাদিক লরেন্স লিফশুলজ মত দেন 'সেনা কর্মকর্তারা কোন রাজনৈতিক ইন্ধন ছাড়াই নিজেরা অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন' বলে যে ধারণা চালু ছিল তা শুধুই একটি মিথ্যাচার যা পরে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের বিদেশি সংবাদদাতারা এ অপপ্রচার চালাতে সাহায্য করেছেন।

মুজিব প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থায় গণভবনে ওঠেননি এবং রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরও তা করেননি। কিন্তু তারপরও অনেক বিদেশি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধি যারা ঐ অভ্যুত্থানের আগে একাধিকবার ঢাকা সফর করেছেন তারা ১৫ আগস্টের ঘটনাগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন তিনি গণভবনে থাকতেন। এই ভুলটি এবং এমন আরও কিছু ভুল খুব মারাত্মক হওয়া সত্তেও ক্ষমা করা যায়। কিন্তু কিছু সংবাদপত্র ও সাংবাদিক এই অভ্যুত্থানকারীদের আদর্শবাদী বীর হিসেবে উপস্থাপন করেছিল।

লন্ডনভিত্তিক দি সানডে টাইমস ফারুকের প্রবন্ধের ভূমিকায় লিখে মেজররা এমন একটি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন 'যা দেশে পরিবর্তন আনতে এতোটাই বদ্ধ পরিকর ছিল যে প্রয়োজনবোধে দেশের প্রতিষ্ঠাতা নেতাকে হত্যা করতেও পিছপা হয়নি।' এটি কোন আন্দোলন ছিল না, এটি একটি চক্রান্ত ছিল এবং চক্রান্তকারী হত্যার মাধ্যমে ক্ষমতা দখল ছাড়া আর কিছুই ভাবেনি।

এইট ডেইস নামের আরেকটি লন্ডনভিত্তিক জার্নালও ফারুক ও রশিদকে আদর্শবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে। সেখানে লেখা হয় "ইসলামিক বাংলাদেশ এক রাতেই উধাও হয়ে যায়, ৭০ মিলিয়ন মুসলমান অসাম্প্রদায়িকতার পথে ফিরে আসে।" তাদের এক বারের জন্যও মনে হয়নি এই তরুণ সেনা কর্মকর্তাদের কোন ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে অর্থ বা ক্ষমতার জন্য।

এটা লিফশুলজের কৃতিত্ব যে তিনি তার 'দ্যা আনফিনিশড রেভলুশন' গ্রন্থে তার ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। সেখানে তিনি দাবি করেছেন 'যারা সরাসরি ঘটনার সাথে যুক্ত ছিল তারা ছাড়া আর কেউই আসল ঘটনা জানেন না।

প্রাথমিকভাবে যতটা মনে হয়েছিল চক্রান্তের ব্যাপ্তি তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল, কিন্তু ঢাকায় কেউই এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেননি যে সেনাবাহিনীর কনিষ্ঠ কর্মকর্তারা একাই এমন নৃশংসতা করেছেন। মোস্তাকের ইন্ধনেই এমন ঘটনা ঘটেছে বলে সাধারণের বিশ্বাস ছিল। আগস্টের শেষ সপ্তাহে বিদেশি সাংবাদিকরা ঢাকায় আসলে তারা সব সময় তাদের হোটেল কক্ষেই আবদ্ধ ছিলেন এবং তাদের কাছে আসা সরকারের অনুগত সাংবাদিকদের দেয়া তথ্যই তারা সত্য বলে মেনে নিয়েছিলেন; এগুলোকে সরকারের অপপ্রচার না ভেবে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করাটা ছিল বোকামী।

এসব বিদেশি সাংবাদিকদের অনেকেই স্বাধীনতার পর থেকেই দেশটি ব্যাপক রাজনৈতিক দুর্যোগে অচিরেই পড়তে যাচ্ছে এমন রিপোর্ট লিখছিলেন, এবং মিথ্যা গুজবকে গুরুত্বের সাথে নেয়া বা যে সব ঘটনা তাদের পছন্দনীয় নয় সেগুলো ধামা চাপা দিতেও তাদের খুব দ্বিধা ছিল না।

মার্কিন দূতাবাসের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা লিফশুলজের কাছে স্বীকার করেন যে মুজিবকে উৎখাত করতে চান এমন ব্যক্তিরা ১৯৭৪ সালে প্রথম মার্কিন দূতাবাসের শরণাপন্ন হয়েছিলেন এবং মার্কিন কর্মকর্তাদের সাথে তাদের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়েছিল। বাংলাদেশে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পরিবর্তন হলে মার্কিন সরকারের প্রতিক্রিয়া কি হবে সেটাই এসব বৈঠকের আলোচ্য বিষয় ছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন দেশের নেতাদের হত্যার ঘটনার সাথে সিআইএ'র সম্পৃক্ততা নিয়ে সে সময় মার্কিন সিনেটের লোক দেখানো সংসদীয় কমিটির কর্মকাণ্ডে মার্কিন কূটনীতিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বেশ সতর্ক ছিলেন। ১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে তারা সিদ্ধান্ত নেন তারা এসব চক্রান্তকারীদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখবেন না এবং এই গোলমাল থেকে দূরে থাকবেন।

এ গল্পটি মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। একই রকম গল্প মোস্তাক করেছিলেন যখন তার বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালে মার্কিনীদের সাথে যোগাযোগের অভিযোগ আসে। ১৯৭৬ সালে রিচার্ড নিক্সন মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির কাছে স্বীকার করেন যে তিনি সালভাদর আলেন্দের নির্বাচন বানচাল করতে সিআইএকে নির্দেশ

দিয়েছিলেন, সাথে এও দাবি করেন যে আলেন্দে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ঐ অঞ্চলে সিআইএকে কোন ধরণের গোপন তৎপরাতা না চালাতে নির্দেশ দেন। একই বছর ২২ জানুয়ারি তারিখে সিআইএর সাবেক পরিচালক রিচার্ড হেল্মস মার্কিন সিনেটের পররাষ্ট্র বিষয়ক কমিটির কাছে স্বীকারোক্তি দেন যে, ১৯৭৩ সালে আলেন্দের শাসনামল চলছিল চিলির রাজনীতিতে সিআইএ কোন ধরণের হস্তক্ষেপ করেনি বলে কমিটিকে ভুল পথে চালিত করেছিলেন।

১৯৭৫ সালের ৫ ডিসেম্বর, মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা বিষয়ক কমিটির সভাপতি সিনেটর ফ্র্যাঙ্ক চার্চ বলেন, 'হোয়াইট হাউসের যে একনায়কতন্ত্রী প্রবণতা রয়েছে রিচার্ড নিক্সনের আমলে তা শীর্ষে পৌছায়।' চিলির ক্ষমতা থেকে আলেন্দেকে উৎখাতের ঘটনা সম্পর্কে চার্চ বলেন হোয়াইট হাউসের অবস্থাটা এমন যে- 'ভিয়েতনামের ঘটনার কারণে আমি যদি আর কোন দেশে সেনা পাঠাতে না পারি তাহলে ঐসব স্থানে আমি সিআইএকে পাঠাবো।'

চার্চের এসব কড়া কথায় হোয়াইট হাউসের 'একনায়কতন্ত্রী' মন মানসিকতায় তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। নিক্সন কমিটির উদ্যোগকে সিআইএকে দুর্বল করার চেষ্টা বলে অভিযোগ করেন। যদিও সে সময় তিনি ক্ষমতায় ছিলেন না, তারপরও জোড় দিয়ে বলেন, কমিটির কার্যক্রম 'ভয়ঙ্কর রকম অপরিণামদর্শী' এবং 'এর ফলে পৃথিবীর সব মুক্ত দেশের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে।'

এটা যদি মেনেও নেয়া হয় যে মার্কিন দূতাবাস অভ্যুত্থানের সাথে নিজেদের যুক্ত রাখতে চায়নি, তারপরও সরাসরি না হলেও বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে অভ্যুত্থানকারীদের সাথে দূতাবাসটির কিছু কর্মকর্তার যোগাযোগ ছিল । যাই হোক তখন আসলে মার্কিন কর্মকর্তাদর চক্রান্ত থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার সময় পেরিয়ে গেছে এবং তারা বেশ অঙ্গাঅঙ্গিভাবে চক্রান্তের সাথে জড়িয়ে পড়েছিল।

যখনই কোন সেনা অভ্যুত্থানের কথা মাথায় এসেছে, তখনই বৈঠকগুলোর কিছু হত ঢাকায় আর কিছু কুমিল্লা জেলায়।

কুমিল্লা ঢাকা থেকে কয়েকশো কিলোমিটার দূরে হওয়ায় ওখানে বৈঠক করা চক্রান্তকারীদের জন্য সুবিধাজনক ছিল।

ডালিম প্রথমে ছাত্র এবং পরে সেনা কর্মকর্তা হিসেবে কুমিল্লায় কিছু সময় কাটিয়েছিলেন। হুদা অভ্যুত্থানের সময় কুমিল্লা সেনানিবাসে দায়িত্বে ছিলেন এবং ১৫ আগস্টের ভয়ঙ্কর সকালে শেখ মুজিবের বাড়ি পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত সেনা জওয়ানারাও সবাই এসেছিলেন কুমিল্লা সেনানিবাস থেকে।

অভ্যুত্থানকারী মেজররা কুমিল্লায় বেশ কয়েকবার বৈঠক করেছিলেন এবং মাঝে মাঝেই এসব বৈঠকে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হত। মোস্তাক ও তাহের উদ্দীন ঠাকুর দুজনই কুমিল্লার লোক এবং মাহবুবুল আলম চাষী কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ

একাডেমি অফ ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড)'র উপ-পরিচালক ছিলেন।

'৬০ এর শুরুর দিকে যখন পাকিস্তানে প্রথমবারের মত সামরিক শাসন এসেছিল, তখন মার্কিন আর্থিক সহায়তায় কুমিল্লায় এই একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হয়। ড. আখতার হামিদ খান ছিলেন প্রথম পরিচালক। তিনি একজন পাঠান হলেও খাদি কাপড় পড়তেন, দ্রুত ও শুদ্ধ ভাষায় বাংলা বলতে পারতেন এবং তিনি একাডেমির আশে পাশের গ্রামাঞ্চলে অনেক ঘোরাঘুরি করতেন। তিনি কুমিল্লা সমবায় সমিতি চালু করেন, যা পরবর্তীতে সমন্বিত 'উন্নয়ন' এর মডেল হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়েছিল। এই সমবায় সমিতিগুলো সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয় এবং পাকিস্তান ও পাকিস্তানের বাইরে অন্য দেশেও ড. হামিদের কাজ প্রশংসিত ছিল। কিন্তু 'কুমিল্লা গবেষণা' পরিচালনা করার জন্য প্রচুর অর্থ দরকার ছিল যা তখন ছিল না এবং এমন কি কুমিল্লা সমবায় সমিতিগুলোও খুব সামান্যই সফলতা পেয়েছিল, এগুলোর পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার পরও। ভূমিহীন কৃষকরা এসব সমবায়ের অন্তর্ভূক্ত ছিল না এবং সমবায় সমিতি পরিচালনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে এ কৃষকদের দাবী দাওয়া তেমন গুরুত্ব পেতনা।

প্রখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল থর্নার কুমিল্লা প্রকল্পের ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে জানুয়ারি ১৯৭০ পর্যন্ত সময়ের রিপোর্টটি সম্পর্কে ঢাকায় ১৯৭৩ সালে আয়োজিত ইন্টারন্যাশনাল ইকনোমিক এসোসিয়েশানের কনফারেন্সে বলেছিলেন এটি পড়ে মনে হচ্ছে যেন 'জনতার আদালতে চীনা স্টাইলে গণ আদালতের সামনে কর্তৃপক্ষের স্বীকারোক্তি'।

কিন্তু আখতার হামিদ খান মোটেও কোন সমাজবাদী ব্যক্তি ছিলেন না, যেমন মাহবুবুল আলম কোন 'চাষী' ছিলেন না। তারা দুজনই উদ্বৃত্তভোগী কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করছিলেন, এসব কৃষকদের অনেকেই আইয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার কট্টর সমর্থক ছিলেন।

আইয়ুব খানের আমলে কুমিল্লা একাডেমিটি একটি শো-পিস হিসেবেই ছিল, আর ১৯৭৪-১৯৭৫ সালে এটি মোস্তাক, তাহের উদ্দীন ঠাকুর এবং মাহবুবুল আলম চাষীদের জন্য নিয়মিত বৈঠকের স্থানে পরিণত হয়। এই তিন ব্যক্তি, মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ ছিল, তাদেন নিয়মিত বৈঠক নিশ্চয়ই সন্দেহের উদ্রেক করে থাকবে। কিন্তু ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি প্রভুদের সেবা দিয়েছিলেন এমন লোকেরা তখনও গোয়েন্দা বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন।

১৫ আগস্টে মাহবুবুল আলম চাষীর সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিলেন আসলে একাডেমিতে সন্ধ্যাবেলার স্বনির্ভর বৈঠকগুলোতে কি আলোচনা হত।

স্বনির্ভর শব্দটির অর্থ হল যে নিজের উপর নির্ভর করে এমন ব্যক্তি। ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি এই স্বনির্ভর আন্দোলন শুরু হয়, যখন সোনালী শতক নামে একটি কর্মসূচি আরম্ভ করা হয়। ১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে একটি ভয়ঙ্কর বন্যায় বাংলাদেশের সতেরোটি জেলার মধ্যে তেরোটি আক্রান্ত হয়। বন্যা দুর্গতদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কুমিল্লায় অবস্থিত বাংলাদেশ একাডেমি ফর রুরাল ডেভেলপমেন্ট (বার্ড) একটি পুনর্বাসন প্রকল্প হাতে নেয়।

এই প্রকল্পটির নাম ছিল 'সবুজ' । এর নাম হওয়া উচিৎ ছিল 'কালো', কারণ ঠিক এই সময়টাতেই শেখ মুজিবকে হত্যা করার মাধ্যমে জাতিকে দুর্যোগে ফেলার চক্রান্ত শুরু হয়। ১৯৭৪ সালের ২৭ জুন যেদিন ভুট্টো ঢাকায় এসেছিলেন সেদিন মোস্তাকের বন্ধু এক প্রকৌশলি প্রেসক্লাবে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের জানান যে মোস্তাক বাংলাদেশে পাকিস্তানি ধ্বংসযজ্ঞের ফটো প্রকাশ করার কারণে তাহের উদ্দীন ঠাকুরের উপর ক্ষিপ্ত ছিলেন। ঐ প্রকৌশলি বলেন, "হঠাৎ কেন তাহের উদ্দীন পাকিস্তানের বিপক্ষে চলে গেলেন? ঢাকায় ভুট্টো যে আন্তরিক অভ্যর্থনা পেয়েছেন তা থেকে বোঝাই যাচ্ছে যে দেশের মানুষ পাকিস্তানের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক রাখতে চায়। আমি আশা করব এই ভিড় দেশে তাহের উদ্দীনের বোধোদয় ঘটবে। এখন মুজিবের সান্নিধ্য পাচ্ছেন বলে তাহের উদ্দীন যদি মোস্তাকের কাছে তার যে ঋণ আছে তা ভুলে যান তাহলে তাকে এ কারণে পস্তাতে হবে। এই প্রকৌশলি কানে কম শুনতেন বলে বেশ জোড়ে কথা বলতেন । ঐ সময় কেউ তার কথা গুরুত্বের সাথে নেন নি।

পরে অনেকেই সন্দেহ করেছিলেন যে তাহের উদ্দীন এবং মোস্তাকের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা গিয়েছিল তা ছিল লোক দেখানো। তাদের মধ্যে কোন মত পার্থক্য থাকলেও তা খুব শিঘ্রই মিটে গিয়েছিল।

১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষ আমাদের সবার মনেই গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছিল। তাহের উদ্দীন ঠাকুর একদিন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আপনার কি মনে হয় আমরা এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে পারবো?" জবাবে আমি বলেছিলাম, "কেন নয়?" অবস্থা খুব খারাপ হলেও তখনও হতাশ হবার মত কিছু ঘটেনি। কিন্তু হতে পারে ঠাকুরের মাথায় তখন অন্য চিন্তা ঘুরছিল। আজ তাহেরের সেই প্রশ্নের অর্থ আমার কাছে অন্য রকম মনে হচ্ছে।

১৯৭৪ সালের জুনে যখন ভুট্টো ঢাকা সফর করেন তখন মুজিব তাকে প্রত্যাখ্যান করার পরপরই পাকিস্তান বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর পায়তারা শুরু করে। এই ভয়ঙ্কর তৎপরতা আরো জোড়দার হয় যখন বাংলাদেশ একটি দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে। ভুট্টো নিজেই ১০ নভেম্বর ১৯৭৪ বাহাওয়ালপুরে ভাষণে শ্লেষের সাথে বলেন, হাজার হাজার বাঙালী এখন, 'স্বাধীনতার সুফল ভোগ করছে'।

মোস্তাক আর তাহের উদ্দীন ঠাকুরও নিশ্চয়ই সেদিন যারা তাদেরকে বাদ পড়াদের দলে ফেলছিলেন তাদের নিয়ে হাসাহাসি করছিলেন । তারা দুজনই কৃষি কাজে আগ্রহী ছিলেন এবং প্রায়ই স্বনির্ভর আন্দোলন সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে এক সাথে চলাফেরা করতেন। ১৯৭৫ সালের শুরু থেকে তারা এ আন্দোলন নিয়ে এতোটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েন যে তাদের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রণালয়গুলোর কাজ দেখার সময় তাদের ছিল না।

যে বীজ তারা রোপণ করেছিলেন তারা সেগুলোর যত্ন নিচ্ছিলেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তারা তাদের কুকর্মের ফসল ঘরে তুলতে পেরেছিলেন।
ঢাকায় জাতীয় স্বনির্ভর আন্দেলনের কার্যক্রম শুরু হয় ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ এ, মুজিব হত্যার ৪০ দিন পর। এর প্রধান লক্ষ ছিল 'স্বনিয়ন্ত্রিত প্রতিরক্ষা কর্মকৌশলের মাধ্যমে একটি অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা'।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা দিয়েছেন এমন অনেককেই এই 'অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা'য় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। মোস্তাকের সরকারের জন্য তারা সহজাত মিত্র ছিলেন।

মুজিবকে হত্যার চক্রান্ত শুরু হয় ১৯৭৪-এর গ্রীষ্মে। সময়টির সাথে ভুট্টোর ঢাকা সফরের সময় মিলে যায়। অনেকেই ঐ সময় ভুট্টোর ঢাকা সফরকে বাংলাদেশের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়া ঘটনা মনে করেন। নিশ্চয়ই ঐ সফরের মধ্যে দিয়ে অনেক দিন ধরে লুকিয়ে থাকা শত্রু মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। যদিও এ সফরটি লাহোরে ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনের প্রতিক্রিয়া সফরই ছিল শুধু।

১৯৭২ সালে জেদ্দায় মুসলিম সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ইসলাম বিরোধী চক্রের ষড়যন্ত্রের ফল বলে প্রত্যাখ্যান করা হয়। ১৯৭৩ সালে কায়রোতে ইলসামী দেশগুলোর সম্মেলনে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু ১৯৭৪ সালে হঠাৎ করেই ইসলামী রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশকে তাদের দলভুক্ত করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। তারা পাকিস্তান যেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় সে দাবী জানায়। পাকিস্তনাও এ দাবী সানন্দে মেনে নেয়।
আনোয়ার সাদাত বলেন ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের সবচেয়ে বড় অর্জন হল মুসলিম দেশগুলোর বাংলাদেশকে স্বাগত জানানো এবং 'ভাই মুজিব' কে গ্রহণ করা।

কিন্তু বাংলাদেশ নিউজ লেটার (লন্ডন, মার্চ/এপ্রিল ১৯৭৪)-এর একজন রাজনৈতিক ভাষ্যকার লিখেন, "এই ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলন ভবিষ্যতে হয় অনেক অপকর্ম শুরুর স্থান হিসেবে মানুষের মনে থাকবে অথবা ইতিহাসের একটি অগুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবে। আমরা আশা করবো এক্ষেত্রে দ্বিতীয়টিই ঘটবে, কারণ সেটিই হবে এই সম্মেলনের জন্য উপযুক্ত।"

একটি গোপন দরজা দিয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আবার ধর্ম প্রবেশ করেছিল।

মুজিব সব সময়ই জনতাকে ভালোবাসতেন, এবং লাহোরে বিশাল সংবর্ধনা পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু লাহোরের ঐ ইসলামিক সম্মেলনের পুরোটাই মুজিবের জন্য আনন্দদায়ক ছিল না এবং তিনি হয়তো পরে এটি নিয়ে অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

লাহোর থেকে ফিরে যখন মুজিব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন বেগম মুজিবের কাছে একটি চিঠি আসে যার ঠিকানা ছিল পাকিস্তানের, কিন্তু চিঠিটি এসেছিল লন্ডন থেকে। চিঠির লেখক নিজেকে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর একজন চিকিৎসক বলে দাবী করেন এবং জানান যে অনেক ঝুঁকি নিয়ে তিনি চিঠিটি লিখছেন কারণ বেগম মুজিবকে সতর্ক করাকে তিনি তার নৈতিক দায়িত্ব বলে মনে করেন। তিনি জানান যে ভুট্টো তাকে এমন একটি ভাইরাস দিতে বলেন যা তিনি (ভুট্টো) মুজিবের সাথে ঐতিহ্য অনুসারে আলিঙ্গনের মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানাবার সময় মুজিবের শরীরে ঢুকিয়ে দিতে পারেন। ঐ চিকিৎসক নিজে কাজটি করতে অস্বীকৃতি জানালেও তার ভয় ছিল অন্য কেউ কাজটি করতেও পারে। মুজিবের স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করে তিনি তার চিঠিটি শেষ করেন।

শেখ মণি এই চিঠির একটি কপি পান।

পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে ঐ নামে একজন চিকিৎসক ছিলেন, কিন্তু তিনি নিজের নামে এই চিঠি পাঠানোর পাগলামী করবেন না সেটাই স্বাভাবিক। এই চিঠিটি নিশ্চিতভাবেই চক্রান্ত করে পাঠানো হয়েছিল।

কিন্তু বেগম মুজিব শুরু থেকেই শেখ মুজিবের লাহোরে যাওয়ার বিপক্ষে ছিলেন এবং এই চিঠিটি পেয়ে তিনি ভীষণ মুষড়ে পড়েন। মুজিবের ঘাড়ে নতুন একটা ব্যাথা যা কোন ক্রমেই সেড়ে উঠছিল না, তার ফলে বেগম মুজিবের দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

মুজিবের মৃত্যুর এক বছর পর জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে আনোয়ার সাদাত বাংলাদেশের তখনকার রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমের কাছে প্রশ্ন রাখেন, "আপনারা শেখ মুজিবকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করতে পারতেন, তা না করে মুজিব ও তার পরিবারের সদস্যদের হত্যা করার কি দরকার ছিল?" রাষ্ট্রপতি সায়েম সব দায় অস্বীকার করে বলেন, "এই কাজ করা হয়েছে পূর্বের সরকারের আমলে, আমাদের সাথে এই ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।" কিন্তু সায়েমের কথা শুনতে পান নি এমন ভঙ্গিতে সাদাত বলেন, "বাংলাদেশকে বিনা কারণে ঐ রাশিয়ান ট্যাঙ্কগুলো দেয়ায় আমি নিজেই খুব অনুতপ্ত, আপনারা ঐগুলো দিয়ে আমার বন্ধু মুজিবকে হত্যা করেছেন।"

মুজিবের একজন আত্মীয় যখন আনোয়ার সাদাতের এই প্রতিক্রিয়ার কথা জানতে পারেন তখন তিনি বলেন, "আনোয়ার সাদাত এখন অনুতপ্ত বোধ করছেন। কিন্তু তিনি ঐ পুরোনো ট্যাঙ্কগুলো কোথাও ফেলে দিয়ে ভারমুক্ত হতে উদগ্রীব ছিলেন

বলেই বাংলাদেশকে ওগুলো দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হলো তিনি কার ইশারায় এ কাজ করেছিলেন?"

মুজিব কিছু জানার আগেই ট্যাঙ্কগুলো বাংলাদেশের উদ্দেশে পাঠানো হয়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে স্বাক্ষর করার সময় তিনি শুধু একটি কথাই বলেছিলেন, "এমন যেন আর না হয়।" কিন্তু এমন ঘটনা একবার ঘটাই তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

একজন ব্রিগেডিয়ার আক্ষেপের সাথে বলেন, "ঐ ট্যাঙ্কগুলো সত্যিকারের যুদ্ধে হয়তো কোন কাজে আসতো না, কিন্তু ঐগুলো দিয়ে অভ্যুত্থানকারী মেজরদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল।"

"চাচীই (বেগম মুজিব) বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর জন্য দায়ী। তিনি কোন অবস্থাতেই গণভবনে যেতে রাজি ছিলেন না।" মুজিবের একজন তরুণ আত্মীয় এ কথা বলেন। মুজিবকে এই আত্মীয় প্রচণ্ড ভালোবাসতেন আর তাই তিনি নিজের মত করে এই দুর্যোগের কারণ ব্যাখ্যা করছিলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা আবেগের বশবর্তী হয়ে বলেছিলেন এবং পরে এ জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন।

বিদেশীরা সহ অনেকেই মন্তব্য করেন যে, মুজিব দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাতেন গণভবনে যা ছিল সুরক্ষিত দুর্গের মত, অথচ রাতে ঘুমাতে যেতেন ধানমণ্ডিতে নিজের বাসায় যার চারিদিক উন্মুক্ত এবং খুবই ঝুঁকিপূর্ণ।

কোন একজন উন্মাদের পক্ষেও মুজিবের বাড়ির জানালাগুলোর কোনটি দিয়ে গুলি চালানো বা পাশের কোন বাড়ি থেকে বোমা ছুড়ে মারা সম্ভব ছিল।

১৯৭২ সালে মুজিবের সাথে দেখা করতে আসা বিদেশীরা গণভবনে বা মুজিবের নিজস্ব বাসভবনে নিরাপত্তার কড়াকড়ি না দেখে খুবই অবাক হয়েছিলেন। কাঁধে কোন একটি ব্যাগ নিয়েও যে কোন অতিথি মুজিবের সামনে যেতে পারতেন। এমনকি এর পরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা হতাশাজনকভাবে কম ছিল।

১৯৭৫ সালের ৩০ মার্চে যখন মুজিবের বাবা মৃত্যু বরণ করেন তখন তার বাড়িতে মানুষ গিজ গিজ করছিল, এমন কি তার শোবার ঘরেও।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে মুজিব কখনোই খুব উৎকণ্ঠিত ছিলেন না।

অনেকেই মনে করেন মুজিব গণভবনে বসবাস করলে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর অভ্যুত্থান ব্যর্থ হত। তাদের যুক্তি হল, যে সেনাদলটি হামলা চালায় গণভবনে ঢুকতে তাদের আরো বেশি সময় লাগতো এবং এর মধ্যে সাহায্য চলে আসতে পারতো। তারা ইঙ্গিত করেন যে রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পটি গণভবনের কাছাকাছি ছিল।

কিন্তু যখন আগে থেকেই নিরাপত্তা রক্ষীদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছিল তখন গণভবনে থাকলেও কি আদৌ কোন পার্থক্য হত?

বেগম মুজিব, শেখ মুজিবকে বলতেন, "তুমি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগেই এই বাড়িতে আমরা থাকতাম। একবার আমাদের সন্তানদের গণভবনের মত জায়গায় থাকার অভ্যাস হয়ে গেলে পরে তাদের অন্য পরিবেশে মানিয়ে নিতে কষ্ট হবে।"

বেগম মুজিবের গণভবন যেতে না চাওয়ার পেছনে আরও গভীর কারণ থাকতে পারে। গণভবনে তিনি হয়তো পূর্ণ স্বাচ্ছন্দের সাথে থাকতে পারতেন না। তিনি ছিলেন একজন ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে থাকা নারী, যার কাছে নিজের বাসগৃহ জীবনের কেন্দ্র। তিনি কখনোই মুজিবের সাথে বিদেশ সফরে যেতেন না।

এ বিষয়েও সন্দেহ আছে যে মুজিব নিজে গণভবনে বা বঙ্গভবনে থাকতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করতেন কি না। একজন বাংলা সাহিত্যিক বেশ প্রশংসা করে লিখেছিলেন, "আর দশটা বাঙালী মধ্যবিত্ত মানুষের মত মুজিবও নিজের বাড়ি পছন্দ করতেন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তার জীবন যাপনে পরিবর্তন আসেনি। তার বাড়িতে কোন কার্পেট বা নতুন আসবাব আসেনি। তার মাছ, খিচুড়ি, দই আর গুড় পছন্দ ছিল। বাড়িতে তিনি লুঙ্গি আর গেঞ্জি পড়ে আরাম করতেন। তিনি একজন মধ্যবিত্ত বাঙালীই ছিলেন।

যখন ১৯৭০ সালে একদল ছাত্র মুজিবকে শ্রদ্ধা ভরে মালা পরিয়ে দেয় তখন মুজিব ভালোবেসে সে মালা বেগম মুজিবকে পরিয়ে দিয়ে বলেন "মালাটি তারই প্রাপ্য।" এই সম্মান বেগম মুজিবের প্রাপ্য ছিল। তিনি মুজিবের উত্তাল রাজনৈতিক জীবনে সব সময় পাশে থাকার সাথে সাথে বিভিন্ন সময় মুজিব যখন কারাবন্দী ছিলেন তখন রাজনৈতিক কর্মীদের সহযোগিতা করেছেন এবং কোন কোন সময় যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞার এবং সাহসের পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৬৮ সালে লাহোরে আইয়ুব খান যে গোলটেবিল বৈঠক ডেকেছিলেন তাতে যেন মুজিব অংশ নেন সে বিষয়ে অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই আগ্রহী ছিলেন, এমন কি জামিন নিয়ে হলেও মুজিব যেন সেখানে যান তারা সেটা চাচ্ছিলেন। কিন্তু যখন বেগম মুজিব এ কথা জানতে পারেন তখন তিনি দ্রুত ঢাকা সেনানিবাসে যেখানে মুজিবসহ অন্যান্য নেতারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আটক ছিলেন সেখানে হাজির হন। তিনি বলেন, "সব অভিযুক্তদের মুক্তি দিলেই কেবল তুমি ঐ বৈঠকে যেতে পার।" তিনি নিশ্চিত ছিলেন সরকারকে সকল বন্দীদের মুক্তি দিতে হবে। অনেক আওয়ামী লীগ নেতা বেগম মুজিবের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে অনেক দুর্বলচিত্ত রাজনৈতিক নেতা যারা আইয়ুব খানের সাথে যে কোন মূল্যে সমঝোতায় আগ্রহী ছিলেন তাদের চেয়ে তার প্রজ্ঞা ও সাহস বেশি ছিল। মুজিব যদি ঐসব নেতার কথায় কান দিতেন তাহলে তা হত রাজনৈতিক আত্মহত্যার শামিল।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এটি পাকিস্তানের রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

অনেকেই বেগম মুজিবের এই সাহসী রাজনৈতিক উদ্যোগের কৃতিত্ব দাবি করেন। একথা সত্য যে কিছু কিছু ছাত্র নেতা তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু তাকে কোন রকম জোড় করতে হয়নি। মুজিবের লাহোরে বৈঠকে যাওয়া উচিৎ হবেনা এই সিদ্ধান্তটি তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল যথেষ্ট।

কিন্তু বহু বছর ধরে দুশ্চিন্তায় থাকা বিশেষত মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে যখন তার স্বামীকে পাকিস্তানে নিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল সে সময়ের দুর্ভোগের কারণে বেগম মুজিব আগের তুলনায় অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি একটু স্বস্তি চেয়েছিলেন, এবং তার পক্ষে সম্ভব হলে তিনি শেখ মুজিবকে কোন ধরণের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব নেয়া থেকে বিরত রাখতেন। তিনি প্রায়ই মুজিবকে বলতেন, "দেশের জন্য তুমি যা চেয়েছ তা হয়েছে। এখন অন্যদের এ দেশের ভাল মন্দ দেখতে দাও।" মুজিব জবাবে বলতেন তার পক্ষে দায়িত্ব এড়ানো সম্ভব নয়। হাসিনা সব সময় তার বাবাকে সমর্থন দিতেন। বেগম মুজিব তখন হাসিনার দিকে ফিরে বলতেন, "কেন তুমি তার পক্ষ নিচ্ছি?"

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ মুজিব গ্রেফতার হওয়ার পর, বেশ কিছুদিন তার পরিবারের সদস্যরা লুকিয়ে ছিলেন।

একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাদের পরামর্শ দিয়েছিলেন তারা যেন সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যান। এ জন্য তাদের বেশ কয়েকদিন ধরে হাঁটতে হবে। হাসিনার গর্ভে তখন তার প্রথম সন্তান থাকায় তিনি দুর্বল ছিলেন বলে তার পক্ষে এ দীর্ঘ যাত্রা করা সম্ভব ছিল না। বেগম মুজিব সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, যাই হোক না কেন তারা সবাই একসাথে থাকবেন। তিনি তার কোন সন্তানকেই পিছনে ফেলে যেতে রাজি ছিলেন না।

মাত্র দুই সপ্তাহ সময়ের মধ্যেই তাদের বেশ কয়েকবার স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছিল, কারণ কেউই এই পরিবারটিকে বেশি দিন আশ্রয় দেওয়া নিরাপদ মনে করছিল না। ঢাকার একটি দৈনিকের সম্পাদক তাদের বসবাসের ঠিকানা জানার দিনই সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের খুঁজে পায়। এটি হয়তো শুধুই কাকতালীয় ঘটনা।

পরের নয় মাস ছিল দুঃস্বপ্নের মত। যে সেনা সদস্যরা পাহারার দায়িত্বে ছিল তারা সারা রাত বাড়ির টেরেসে কুচকাওয়াজ করতো, তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী বাসার বাতি জ্বালাতো বা নিভাতো এবং বিভিন্ন অজুহাতে যে কোন কক্ষে প্রবেশ করতো।

বেগম মুজিবকে নামায আদায় করতে দেখে কিছু সেনা সদস্য তার কন্যাদের প্রশ্ন করতো, "আপনাদের মা কি হিন্দু নন?" সেনারা বলতো তাদের মাও তাদের

বাবার মতোই টুঙ্গিপাড়ার শেখ। তারা বলতো "আমরা জানি তিনি আসলে কোলকাতা থেকে আগত একজন হিন্দু।" শেষ পর্যন্ত অনেক সেনা সদস্য বিশ্বাস করতো বেগম মুজিব একজন হিন্দু, যদিও তারা তাকে নামায আদায় করতে এবং রমযান মাসে রোযা পালন করতে দেখেছিল।

এই লোকগুলো এতোটাই নির্বোধ ছিল যে তারা বিনা প্রশ্নে সবচেয়ে অদ্ভুত মিথ্যাগুলোও বিশ্বাস করতো।

এ কারণেই এটা অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে বেগম মুজিব সেনা সদস্যদের অপছন্দ করতেন এবং তাদেরকে মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বেগম মুজিবের সেনা সদস্যদের প্রতি বিদ্বেষ থেকে গিয়েছিল।

প্রায়ই তিনি প্রহরীর দায়িত্বে থাকা সেনা সদস্যদের দেখিয়ে শেখ মুজিবকে বলতেন, "এই লোকেরাই একদিন তাদের অস্ত্র তোমার দিকে তাক করবে।"

এমন লোকেরা বিপদজনক

যখনই মোস্তাক মুজিবের বাড়িতে খাবার খেতেন তখন মুজিব কৌতুক করে তার স্ত্রীকে বলতেন, "মোস্তাকের চেহারায় একটা দুর্বল আর ক্ষুধার্ত ভাব আছে। তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে, সে যেন কখনোই ক্ষুধার্ত না থাকে। সে দিনে মাত্র একবার খাবার খায়।"

মুজিব ছিলেন একজন উচ্ছল মানসিকতার ব্যক্তি, যার রসিকতায় ভরা হাসি সবার হৃদয়কে উষ্ণ করতো। মোস্তাক ছিলেন একজন রেখে ঢেকে কথা বলা মানুষ, যার ধূর্ত হাসি যে কাউকে অস্বস্তিতে ফেলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অভ্যুত্থানের পর পর জয়প্রকাশ নারায়ণ মোস্তাকের কথা স্মরণ করে বলেন, 'একজন গড় উচ্চতার হালকা পাতলা লোক যার মাথায় সব সময় একটি অবাঙালীসুলভ টুপি থাকতো।' মোস্তাকের টুপি তার ব্যক্তিত্বের অংশ ছিল। ঢাকার একজন ব্যাংকার মোস্তাককে তার টুপির কারণে 'টুপিওয়ালা' বলে সম্বোধন করতেন। অনেকেই সে সময় টুপি পড়তেন, কিন্তু মোস্তাকের টুপি ঐ ব্যাংকারকে পাকিস্তান আমলের কথা মনে করিয়ে দিত, যা তিনি সব সময় ভুলে থাকতে চাইতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছু সময় পরই ঐ ব্যাংকার তার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষীকে বলেন যে, "মোস্তাক এখনও একজন মুসলিম লীগার রয়ে গেছেন, একজন প্রাচীনপন্থী।"

মূল মুসলিম লীগের বিরোধিতা করে ১৯৪৯ সালে যে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয় মোস্তাক ছিলেন তার একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। নতুন দলটির সদস্যরা সবাই আগের মুসলিম লীগের সদস্য ছিলেন, কিন্তু তাদের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার লোক ছিলেন এবং বামপন্থীরাও ছিলেন। সবাই এ দলটিকে আওয়ামী লীগ বলতেন, আওয়ামী মুসলিম লীগ নয়। এটি একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল ছিল যা ক্রম বর্ধমান বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্ব করত এবং পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন এই দল গঠনে ইন্ধন যুগিয়েছিল।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাঙালী প্রথম তাদের মাতৃভাষার জন্য জীবন দিয়েছিল। দুই বছর পর জনতা প্রদেশ থেকে মুসলিম লীগ সরকারকে প্রত্যাখ্যান করে নির্বাচনের মাধ্যমে।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনের মোড় ঘুরাবার মত ঘটনা ছিল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। ঐ নির্বাচন নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা এই অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তবুও যেহেতু স্বাধীনতার জন্য বাঙালীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে বুঝতে গেলে ঐ নির্বাচনগুলো সম্পর্কে জানা প্রয়োজন তাই এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

মুসলিম লীগ নিজেদেরকে পাকিস্তানের একমাত্র রাজনৈতিক কর্তৃত্ব মনে করতো এবং নির্বাচনে জোড় প্রচারণা চালানোর জন্য তারা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেতাদের নিয়ে আসে এবং স্থানীয় মোল্লাদের হাত করে নেয়। তাদের নির্বাচনী প্রচারণার প্রধান অস্ত্র ছিল 'ভারত বিদ্বেষ'। আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং আরও দুটি দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা বিশিষ্ট একটি মেনিফেস্টো ছিল। এটি ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির (ভাষা শহীদ দিবসের) চেতনা থেকে উৎসরিত ছিল এবং উদীয়মান বাঙালী জাতীয়তাবাদের চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এ মেনিফেস্টোর মূল প্রতিশ্রুতি ছিল প্রতিরক্ষা, মুদ্রা ব্যবস্থা এবং পররাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া আর সব ক্ষেত্রে প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন।

মুসলিম লীগ সরকার নির্বাচনের আগে আগে বিরোধী মতের শত শত ছাত্র ও রাজনৈতিক কর্মীকে আটক করে। এরপরও শেরেবাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দির নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট পূর্ব পাকিস্তানের ২৩৭ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ২০৮ টিতে জয়লাভ করে মুসলিম লীগকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে (সে সময় সংসদে ৩০৫ টি আসনের মধ্যে ৭২ টি সংখ্যালঘুদের জন্য বরাদ্দ ছিল)। মুসলিম লীগ মাত্র ৯টি আসনে জয়লাভ করেছিল। ১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ব বাংলার কিংবদন্তী নেতা এ. কে. ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন, কিন্তু ততদিনে তার সরকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৯৫৪ সালের ২৮ মে করাচীতে মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে ফজলুল হক প্রদেশের সম্পূর্ণ স্বায়ত্ত শাসন দাবি করেন। পরের দিনই কেন্দ্রীয় সরকার তার বিরুদ্ধে প্রদেশের স্বাধীনতার দাবি জানানোর অভিযোগ আনে।

ফজলুল হক বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের একটি স্বায়ত্ত শাসিত অংশ হওয়া উচিৎ। এটা আমাদের আদর্শ এবং আমরা এর জন্য লড়াই করব। আমি কখনোই স্বাধীনতা আমাদের আদর্শ এমন কথা বলিনি।"

ফজলুল হক দেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তারপরও তিনি আর তার মন্ত্রীসভার সতীর্থরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার দাবি করেননি বলে ঘোষণা করেন। এরপরও তারা রক্ষা পাননি। নিউ ইয়র্ক টাইমসের পাকিস্তানের প্রতিনিধি ফজলুল হক তার সাথে আলাপকালে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা বলেছেন বলে যে বক্তব্য দেন তার ভিত্তিতে ১৯৫৪ সালের ৩০ মে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, ফজলুল হকের মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের পরিবর্তে মোহাম্মদ আলীকে ওয়াশিংটনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের দায়িত্বে থাকা অবস্থা থেকে ফিরিয়ে এনে দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। লম্পট হিসেবে মোহাম্মদ আলীর কুখ্যাতি ছিল। অন্য দিকে ফজলুল হককে বাংলার বাঘ (শের-এ-বাংলা) বলা হত। লম্পট কর্তৃক বাঘকে পদচ্যুত করা হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম বারের মত জনগণের ভোটে নির্বাচিত মন্ত্রীসভার স্থায়ীত্ব ছিল মাত্র ৫৭ দিন। কেন্দ্রীয় সরকার ভারত শাসন আইনের ৯২-ক ধারা বাতিল করে পূর্ববঙ্গে গভর্নরের শাসন জারি করে।

নতুন গভর্নর হিসেবে মেজর জেনারেল ইসকান্দার মির্জা দায়িত্ব নেন। তখনও তিনি প্রতিরক্ষা সচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার একদিন আগে সংবাদ সম্মেলনে ইসকান্দার মির্জা বলেন যে ভারতীয় চর এবং কম্যুনিস্টরা পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে এবং যুক্তফ্রন্ট নেতারা পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের সাথে যুক্ত করার চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, "প্রয়োজন বোধে জাতীয় সংহতি রক্ষার্থে সেনাবাহিনী দশ হাজার মানুষকে হত্যা করতেও দ্বিধান্বিত হবে না।"

১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা ৩০ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে।

ফজলুল হকের মন্ত্রীসভা বরখাস্ত হওয়ার পর পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণ ঘটে। মুসলিম লীগ সরকার এবং কেন্দ্র এখানকার জনগণের প্রতিনিধিত্ব করার যে সামান্য দাবি আগে করতে পারতো সে সুযোগও তারা হারিয়ে বসে, তারপরও তারা ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে চায়। ১৯৫৫ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা মানা হয়নি।

১৯৫৪ সালের শেষ নাগাদ আওয়ামী মুসলিম লীগের সিংহভাগ সদস্য মনে করলেন দলের নামে 'মুসলিম' শব্দটি বাধা সৃষ্টি করছিল এবং এটি বাদ দেয়ার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু মোস্তাকের মতে দলটি মূলত 'মুসলিম' যার সাথে পরে আওয়ামী শব্দটি যোগ করা হয়েছে মাত্র। যখন ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিল চলাকালীন ৮০০ জনেরও বেশি কাউন্সিলর 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়ার পক্ষে রায় দেন, তখন মোস্তাক এবং আব্দুস সালাম খান সভা ত্যাগ করেন।

অনেক লেখক দাবি করেন মোস্তাক এ সময় ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টিতে যোগ দেন। তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ ঐ দলে মোস্তাকের স্থান হয়নি । তিনি প্রথমে আব্দুস সালাম খানের নেতৃত্বাধীন ২২ জনের একটি উপদলে যা তখনো নিজেদের আওয়ামী মুসলিম লীগ বলে দাবি করছিল তাতে যোগ দেয়ার কথা ভাবলেও পরবর্তীতে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে তা আর করেন নি। এই বিচ্ছিন্ন উপদলটি খুব শিঘ্রই আরও বিভক্ত হয়ে যায় এবং ১৯৫৮ সালের পরে তাদের কথা আর খুব একটা শোনাও যায়নি।

মোস্তাক মনে মনে একজন মুসলিম লীগারই থেকে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রধান চারটি স্তম্ভের মধ্যে একটি ছিল অসাম্প্রদায়িকতা। ১৯৭১ সালে

পাকিস্তানের মৌলবাদী শত্রুর সাথে লড়াইয়ের চেতনা থেকেই এটি হয়েছিল। কিন্তু অসাম্প্রদায়িকতা শব্দটি শুনলেই মোস্তাক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই মাসেরও কম সময় পরে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কয়েকজন ভারতীয় সাংবাদিকের সাথে আলাপ কালে মোস্তাক বেশ ক্ষুব্ধ হয়েই বলেন, "আমরা সংবিধানে সমাজতন্ত্রের কথা বলেই প্রমাণ করেছি যে আমরা অসাম্প্রদায়িক। ফলে এখন অসাম্প্রদায়িকতা শব্দটি নিয়ে এত উত্তেজনার কি দরকার?"

মোস্তাক নিজে অসাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী ছিলেন না এবং সমাজবাদ তার কাছে কথার কথা ছিল।

ঢাকার একজন নারী চিকিৎসক ঠিকই লক্ষ করে ছিলেন যে মুজিব নগর সরকারের গ্রুপ ফটোগুলোতে মোস্তাককে মোটেও ঐ সরকারের একজন মনে হচ্ছিল না, বরং একজন বহিরাগতের মত লাগছিল।" তার কথাই ঠিক। মোস্তাক যখন সামনের সারিতে থাকতেন তখনও মনে হত তিনি যেন পেছনে আছেন, ঠিক যেন উনি মুজিব নগর সরকারে তার সতীর্থদের সাথে একসাথে চিহ্নিত হতে চাইছিলেন না এবং এ কারণে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখছিলেন। ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খান তার পাকিস্তান দিবসের (২৩ মার্চ) বাণীতে উল্লেখ করেন- "পূর্ব এবং পশ্চিমের প্রতিনিধিদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধন এবং ঐক্যের ভিত্তিতে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যেন একই জাতীয় স্বার্থ রক্ষার্থে কাজ করে যেতে পারেন সেজন্য মঞ্চ এখন প্রস্তুত।"

এই বার্তার ভয়াবহতা আন্দাজ করাটাও কঠিন। ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে ছিল না, মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে ছিল আগ্রাসনের। 'অপারেশান ব্লিৎজ' যাকে যথার্থভাবে 'অপারেশান জেনোসাইড' বলা হয়ে থাকে, সেই অভিযানের জন্য তখন চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছিল। ভয়ঙ্কর হত্যাযজ্ঞের প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে ইয়াহিয়া খান সব পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ঢাকা ছাড়তে বলেন। 'আতশবাজি' দেখার জন্য শুধু ভুট্টোই ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন।

শওকত হায়াৎ খান ঢাকা এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে আগামসি লেনে মোস্তাকের বাড়িতে যান । তিনি খুবই উত্তেজিত ছিলেন, তার কাছে খবর ছিল ঢাকায় বড় ধরণের সামরিক অভিযান চালানো হবে এবং এটি খুব বড় ধরণের অভিযান হতে যাচ্ছে। তিনি মুজিবের কাছে এই বার্তা পৌছে দেয়ার জন্য এবং তার সালাম জানানোর জন্য মোস্তাককে বলেছিলেন, মুজিবের সাথে নিজে দেখা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

শওকত হায়াতের বার্তা 'তড়িঘড়ি' করে মুজিবের কাছে পৌছে দেয়ার পথে মোস্তাক সিটি নার্সিং হোমে থেমে তার বন্ধু ড. টি. হোসেইনকে খবরটি জানিয়ে যান।

যত আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে মুজিবের ২৫ মার্চ ১৯৭১ এ দেখা হয়েছিল তাদের সবাইকে মুজিব তাদের ঢাকা ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় চলে যাবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। নেতারা ঢাকা ত্যাগের আগেই সেনা বাহিনীর অভিযান শুরু হয়ে যায়, তবে তারা সবাই নিজ গৃহে না থাকার সতর্কতা অবলম্বন করতে পেরেছিলেন।

১৯৭১-এর ২৬ মার্চ সকালে যারা নিজেদের রেডিও বা ট্রান্সমিটার সেট চালু করেন তারা সেনাবাহিনীর এই মেসেজটি শুনতে পান: "বড় পাখিকে খাঁচায় ভরা হয়েছে। অন্য পাখিরা তাদের বাসায় নেই।" সেনাবাহিনীর অন্য একটি মেসেজে বলা হয়, "টি উড়ে গেছে।" মুজিব ছিলেন বড় পাখি, আর টি বলতে তাজ উদ্দীনকে বোঝানো হয়েছে।

২৭ মার্চ সকালে যখন অল্প সময়ের জন্য কারফিউ শিথিল করা হয় তখন তাজ উদ্দীন ভারতে চলে যান। সকল আওয়ামী লীগ নেতাই প্রথম সুযোগে ঢাকা ছাড়েন।

কিন্তু সব আওয়ামী লীগ নেতা ঢাকা ছাড়ার একদিন পর ২৮ মার্চে মোস্তাককে 'উদ্ধার' করতে হয় এবং তার বন্ধু ড. টি. হোসেইন এর সিটি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়। জাতীয় সংসদে যে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেই দলটি মোস্তাককে তাদের পক্ষ থেকে জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে মনোনয়ন দেয়। সেনাবাহিনী যখন এমনকি বুদ্ধিজীবীদেরকেও খুঁজছিল তখন কি তারা মোস্তাককে তার বাড়িতে খুঁজতে যায়নি?

মোস্তাক সিটি নার্সিং হোমে দশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন, এমনকি ড. রব নামে একজন অবাঙালী চিকিৎসক তাকে দেখে ফেলার পরও।

যাই হোক, ১৯৭১ সালের ৭ এপ্রিল কোলকাতার সর্ব ভারতীয় বেতার থেকে এক সম্প্রচারে জানানো হয় কিছু কিছু ভারতীয় নেতা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি জানাচ্ছেন। মোস্তাক এবং তার বন্ধু হোসাইন এ থেকে ধরে নিয়েছিলেন যে ভারত যে কোন সময় বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে, এমন কোন ঘটনা ঘটলে তারা এর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে চান নি। হোসেইন তখন মোস্তাককে বলেন, "দুর্ভাগ্যজনক বিষয় হল তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য নার্সিং হোমে আসবেন না, বরং কাউকে তাদের কাছে গিয়ে দাবি জানাতে হবে।" বিকেলে মোস্তাক হোসেইনকে বলেন, "তুমি কি সত্যিই মনে করছ আমার দেশের বাইরে যাওয়া উচিৎ?" জবাবে হোসেইন বলেন, "আমি নই তুমিই রাজনীতিবিদ। কিন্তু আমি দেশত্যাগের বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছি এবং আমি তোমাকে পুরোটা পথ যেতে সাহায্য করতে পারবো।"

ঢাকায় মোস্তাকের অবস্থান করাটা কোনক্রমেই গোপন থাকার কথা নয়। সিটি নার্সিং হোমে অন্তত ৫০ জন ব্যক্তি ছিলেন যাদের মধ্যে অনেকেই আওয়ামী লীগ বিদ্বেষী ছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল টিক্কা খানের উপদেষ্টা ছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। চৌধুরী যখন জানতে পারেন মোস্তাক ঢাকাতেই আছেন তিনি মোস্তাকের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন, কিন্তু ততদিনে মোস্তাক ভারত চলে গিয়েছিলেন।

হামিদুল হক নিশ্চয়ই অন্য কোন আওয়ামী লীগ নেতা, যেমন ধরা যাক তাজ উদ্দীনের সাথে যোগাযোগ করার সাহস দেখাতেন না।

হামিদুল হক মোস্তাকের চরিত্র সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতেন, আপাত দৃষ্টিতে তাদের দুজনকে দুই বিরোধী শিবিরের লোক মনে হলেও তাদের মধ্যে অনেক মিল ছিল।"

ভারতে পৌঁছেই তাজউদ্দীন চিৎকার করে বলছিলেন, "আমরা লড়াই করতে চাই, আমরা লড়াই করতে চাই।" তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল "কিভাবে?" এ প্রশ্নের জবাব তার কাছে না থাকলেও তিনি দৃঢ়তার সাথে বলে ছিলেন, "আমরা লড়াই করব।" অনেকেই তাজউদ্দীনের কথা শুনে সে সময় হেসেছিলেন, কিন্তু অনেক প্রতিরোধ যুদ্ধই "আমরা লড়াই করব" এমন অবুঝ আর্তনাদ দিয়ে শুরু হয়েছে।

মোস্তাকের চিন্তা ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ অন্য রকম। তিনি ভারতে গিয়েছিলেন 'বন্ধু আর সতীর্থদের সহায়তায় সীমান্তের ওপারে একটি সরকার গঠন করার সম্ভাব্যতা যাচাই করতে।' হঠাৎ তার মাথায় এটা খেলে গিয়েছিল যে যদি জাতীয় সংসদ অধিবেশন চালু হয় তাহলে তিনি স্পিকার হবেন। হোসেইন আগরতলায় গিয়েছিলেন তার বন্ধু মোস্তাকের অস্থায়ী সরকার গঠনের দাবি নিয়ে চাপ সৃষ্টি করতে, এই সরকার হবে বাংলাদেশের সরকার, তার মতে যে দেশটির স্বীকৃতি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই সর্ব ভারতীয় বেতারের সম্প্রচারের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

এটা অবাক করার মত বিষয় হতে পারে যে মোস্তাক আর তার বন্ধু হোসেইন একটি সংবাদ সম্প্রচারকে ভারত সরকারের অবস্থান মনে করে ভুল করবেন। কিন্তু তারা যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া সংক্রান্ত সম্প্রচারটি ভুল না বুঝতেন তাহলে ৭ এপ্রিলে সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের ১২ দিন পর তারা কি ঢাকা ত্যাগ করতেন?

বেশ অনিচ্ছার সাথেই মোস্তাক অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিকই তার পদাধিকারের সুযোগ নিয়েছিলেন। মার্কিন কূটনীতিক এবং আরও যেসব কর্মকর্তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে ফাটল ধরাতে চাইছিলেন তারা মোস্তাকের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

পরে মোস্তাক দাবি করেছিলেন মার্কিন কূটনীতিকদের সাথে যোগাযোগ করে তিনি আসলে জানতে চাইছিলেন বাংলাদেশ বিষয়ে ওয়াশিংটনের চিন্তা ভাবনা কী ছিল। এটি একটি ভিত্তিহীন তথ্য, বিশেষত যখন দিল্লীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিং এবং ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল এ দাবির কারণে অপমানিত বোধ করেন। মোস্তাকের এ ব্যাখ্যা আরো হাস্যকর হয়ে ওঠে যখন তখনকার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি কিসিঞ্জার জানান যে, ভারত যুদ্ধে যুক্ত হওয়ার সময় তারা "পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে সমঝোতার ব্যাপারে কোলকাতাভিত্তিক বাংলাদেশের নেতৃত্বকে প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন।"

কিসিঞ্জার 'কোলকাতাভিত্তিক বাংলাদেশী নেতৃত্ব' বলে ইঙ্গিত করেছিলেন মোস্তাকের দিকে, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের অপর চার সদস্য– ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, এম. মনসুর আলী বা এ. এইচ. কিউ. আশিকুজ্জামানের বিষয়ে কিছু বলেন নি।

ডেইলি টেলিগ্রাফ অক্টোবর ১৯৭১ এ ছাপে, "এখন সমাধানে পৌছার একমাত্র উপায় হল মুজিবের গোপন বিচার প্রক্রিয়া, এবং তার জন্য সময়ও এখন ফুরিয়ে আসছে।" বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার এবং পাকিস্তানি সরকারের মধ্যে যে কোন আলোচনা শুরু হওয়ার আগে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দিতে হবে। ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগ জানায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় কারাবন্দী থাকা মুজিবই কেবল মাত্র রাষ্ট্রপতি আইয়ুব খানের ডাকা গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত হিসেবে কর্মরত থাকা জোসেফ ফারল্যান্ড, জেনারেল ইয়াহিয়ার বন্ধু ছিলেন। তিনি ইয়াহিয়াকে বলেছিলেন যে মার্কিন কর্তৃপক্ষ মনে করেন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ভবিষ্যৎ স্থিতিশীলতার চাবিকাঠি হলেন শেখ মুজিব। এরপরও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কারাবন্দী থাকা শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে মোস্তাকের সাথে সমঝোতায় যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। ১৯৭১-এর ৪ সেপ্টেম্বর, ফারল্যান্ড ইয়াহিয়াকে জানান যে, মার্কিনিরা তাদের 'চমৎকার অফিসগুলোর সহায়তায় পাকিস্তান সরকারের সাথে প্রবাসী বাঙালী সরকারের গোপন বৈঠক আয়োজন করছে।' তিনি ইয়াহিয়ার কাছে যে নামটি জানিয়েছিলেন তা হল মোস্তাক।

সাবেক এফ বি আই এজেন্ট ফারল্যান্ড আসলে ইয়াহিয়াকে পরামর্শ দিচ্ছিলেন যেন মার্কিন 'চমৎকার অফিস'গুলোর সহায়তায় মোস্তাকের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাতে।

ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা পরে কার্নেজি গবেষকদের কাছে স্বীকার করেছিলেন যে, "বাঙালীর মধ্যে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব ছিলেন যারা বিশেষ বিশেষ পদে অবস্থান করছিলেন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের কাছেও তাদের

গ্রহণযোগ্যতা ছিল; এই সব ব্যক্তিরাই আমাদের (মার্কিনিদের) মধ্যে আশার সঞ্চার করেছিলেন।"

এই বাঙালী ব্যক্তিরা হলেন মোস্তাক এবং তার লোকেরা।

এসব ঘটনা থেকেই ঢাকায় পাকিস্তানি সেনাদের ধ্বংসযজ্ঞের ১৩ দিন পরও মোস্তাক কেন ঢাকায় ছিলেন তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। তিনি পাকিস্তানি সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

ইউ এস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ঐ কর্মকর্তা কার্নেজি গবেষকদের কাছে এটা জানাতে অস্বীকৃতি জানান যে ঠিক কোন সময়ে বিশেষ পদাধিকারী প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের ভেতরের লোকদের সাথে মার্কিন কর্তৃপক্ষের যোগাযোগ হয়। এটা জানালে আসলে অনেক বেশি কিছু বলা হয়ে যেত।

তাদের সাথে প্রথম যোগযোগ করা হয়েছিল এমন কি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হওয়ারও আগে।

ওয়াশিংটন পোস্ট ১৯৭১-এর ১১ ডিসেম্বরে কিসিঞ্জারের বক্তব্য হিসেবে ছাপে, 'বোঝা যাচ্ছিল একবার সমঝোতার জন্য সংলাপ শুরু হলে অবধারিতভাবেই কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে মুজিবের মুক্তির বিষয়টি সামনে চলে আসবে এবং এ কারণেই আমরা যে কোন কিছু শুরুর আগে সংলাপ অসম্ভব করার বিষয়ে ভীষণ রকম আগ্রহী ছিলাম।' কিসিঞ্জারের বক্তব্যের অসারতা এমনকি 'কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর' বলার পরও ঢেকে রাখা যায়না। কারণ এই 'কিছু সময়ে'র মধ্যে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে, এমনকি দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের গতিধারাও বদলে যেতে পারে।

জাতিসংঘের সহকারী মহাপরিচালক পল মার্ক হেনরি, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ঢাকায় পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় ঢাকায় থাকা জাতিসংঘ মিশনের প্রধান ছিলেন। তিনি যথার্থই তখনকার অবস্থা ব্যাখ্যা করেছিলেন। জ্যাক এন্ডারসনকে তিনি বলেন, "আমরা স্টালিনগ্রাদের সম পর্যায়ের একটা ট্র্যাজেডি ঘটবে বলে আশঙ্কা করেছিলাম।"

এটি একটি ব্যাপক ক্ষতিকর যুদ্ধ হতে যাচ্ছিল। এক পর্যায়ে 'পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' হস্তপে না করতে ভারত বাধ্য হত। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিনী ও চীনের সাথে একটি 'ত্রিমুখী লড়াই শুরু করতে বাধ্য হত'।

মূল লক্ষ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকিয়ে দেয়া।

যখন বোঝা যাচ্ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ এখন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকা বিদেশী শক্তিগুলো স্বাধীনতা ঠেকাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়। যে সমস্ত রাষ্ট্র 'বাঙালীদের নির্বিচারে হত্যার বিষয়ে কথা বলে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন করতে' চাইছিল না, তারা সবাই হঠাৎ করেই

মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ল। 'ভারতীয় কৌশল' সম্পর্কে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার একটি উঁচুমানের কিন্তু উদ্দেশ্য প্রণোদিত সম্পাদকীয়তে লেখা হয়, "এসব কৌশল বড় ধরণের মানসিক দুর্যোগ সৃষ্টি করবে, কারণ ইয়াহিয়া কোন অবস্থায় ব্যাপক ব্যক্তিগত অপমান সহ্য করে মুজিবকে মুক্ত করবেন না, আর অন্যদিকে মুজিবকে ছাড়া বাংলাদেশ ভেঙে পড়বে ।" এটি ছিল একটি সরাসরি হুমকি। গার্ডিয়ান মুজিব বা বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে চিন্তিত ছিল না। পত্রিকাটির একমাত্র চিন্তা ছিল এশিয়ার নিরাপত্তা পরিস্থিতি। পাকিস্তানকে ভেঙ্গে ফেলার আগেই ভারতকে থামাতে হতো। পত্রিকাটি চাইছিল পরাশক্তিগুলো যেন ভারতের সামনে 'বাস্তব রাজনীতি' নিয়ে আসে, যাতে করে এসব ঘটনা ঘটা বন্ধ করা যায়। পত্রিকাটি প্রশ্ন রাখে, "এশিয়ার নিরাপত্তার কি হবে, যদি পাকিস্তান খণ্ডিত হয়ে যায়?"

এমনকি ১৯৭১-এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহেও অনেক পশ্চিমা পত্রিকার প্রতিনিধিরা 'পূর্ব পাকিস্তান সংকটে'র শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য ইয়াহিয়াকে আরও সময় দেওয়ার দাবি জানাচ্ছিলেন। তাদের এ দাবি, কিসিঞ্জারের সংকট সমাধানে আরও সময় চাওয়ার দাবির মতোই হাস্যকর ছিল, কিন্তু তারা এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করছিলেন যে, ইয়াহিয়া এমন ব্যক্তি ছিলেন না যাকে বল প্রয়োগ করে কোন কাজ করতে রাজি করানো যাবে। নিশ্চয়ই ইয়াহিয়া এমন লোক ছিলেন না। কিন্তু বাঙালীর ভাগ্যে কি ঘটতো?

মার্কিনিরা ইয়াহিয়ার প্রতি খুবই সমব্যথী ছিল, তারা লাখো বাঙালীর দুর্দশা নিয়ে নয়, বরং 'একজন পুরোনো মিত্র'র দুশ্চিন্তা নিয়ে বেশি সচেতন ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের দায়িত্ব পালনকারী টি. এন. কাউলের মতে মার্কিনিদের পরিকল্পনা ছিল বছর দুয়েক সময়ের মধ্যে সমস্যার শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমাধান করা। এই সময়ের মধ্যে পাকিস্তান সম্ভবত আরো কয়েক লক্ষ বাঙালী হত্যার মাধ্যমে তার বাঙালী 'নিধন' অভিযান শেষ করে আনতে পারতো।

কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরেও মুজিবের মুক্তির বিষয়ে তার অবস্থান অস্পষ্ট রেখেছিলেন, কিন্তু নিজের আত্মজীবনী হোয়াইট হাউস ইয়ারস-এ তিনি খুব দক্ষতার সাথে তার এই অবস্থান চেপে গিয়েছিলেন। তার দাবি মতে, "মার্কিন কর্তৃপক্ষ যে সময়সীমা মেনে নিতে ইয়াহিয়াকে রাজি করাতে সমর্থ হয়েছিল, সেটি অনুসারে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে পাকিস্তানে সেনা শাসন অবসান হয়ে বেসামরিক সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করতো এবং এর ফলে অবধারিতভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন এবং স্বাধীনতা সম্ভব হতো। তার আত্মজীবনীতে তিনি আরও লিখেছেন, "আমি মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্ত শাসন আর তার অল্প সময় পরে স্বাধীনতা আসবে বলে মনে করছিলাম আগে থেকেই।"

তার প্রতারণা করার ক্ষমতা অবাক করার মত।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সংসদে ৩০০ আসনের ১৬৭ টিতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৮৮ টিতে জয়লাভ করেছিল। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদের ৭৮টি এবং প্রাদেশিক সংসদেও ৮৮টি আসন শূন্য ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে এসব আসনে উপনির্বাচন হওয়ার কথা।

ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি)'র করাচীর সচিব মেরিয়াজ মোহাম্মদ খান ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে 'আসন্ন উপনির্বাচনের জন্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে'র জন্য যে পিপিপি প্রতিনিধি দল ঢাকায় আসে তাতে প্রথমে থাকলেও পরে তিনি সরে দাঁড়ান । তার মতে কার্যত ক্ষমতা 'যখন গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল চক্র যারা ইতিমধ্যেই নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে, তাদের কাছে চলে গিয়েছে' তখন এই সফর করা অর্থহীন।

এমন কি পূর্ব পাকিস্তানের কট্টর ডানপন্থী দল জামায়াত-এ ইসলামী'র নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমও বলেছিলেন, "এখন পরিস্থিতি এমনই যে আগামী ছয়মাস বা তারও বেশি সময়ের মধ্যে নির্বাচন বা অন্য কোন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড করা অসম্ভব।" কিন্তু তখন আসলে নির্বাচন করার কেনা প্রয়োজন ছিল না। সেনাবহিনী খুব সতর্কতার সাথে প্রার্থী নির্বাচন করেছিল, কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য ৫৮ জন প্রার্থী, আর প্রাদেশিক সংসদের জন্য আরও ৫০ জন প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। একজন প্রার্থী দাবি করেন তিনি তার নিজের প্রার্থিতা প্রত্যাহারের খবর সংবাদপত্রে রিপোর্ট পড়ে জানতে পারেন।

সে সময় পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর পিআরও হিসেবে দায়িত্বে থাকা মেজর সিদ্দিক সালিক বলেন, "আসলে সংসদীয় আসনগুলো জেনারেল ফরমান আলী ভাগ বাটোয়ারা করে দিয়েছেন।"

বাঙালীর উপর ১৯৭১-এর মার্চে হত্যাযজ্ঞ চালানোর পর যে সমস্ত ডানপন্থী দলগুলো পাক বাহিনীর প্রতি সহযোগিতামূলক মনোভাব দেখিয়েছিল, জেনারেল ফরমান তাদেরকে পুরস্কৃত করেছিলেন।

এই দলগুলো ১৯৭০-এর নির্বাচনে মাত্র একটি আসনে জয়লাভ করেছিল।

নিউ ইয়র্ক টাইমস ২০ অক্টোবর ১৯৭১ এ ছাপে, "বাঙালীর নেতা শেখ মুজিবকে কারাবন্দী করা এবং তার গোপন বিচার, ১৯৭০ এর নির্বাচনে যে আওয়ামী লীগ ব্যাপক বিজয় পেয়েছিল, সেই দলটির নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচার ইত্যাদির কারণে রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের ডাকা নির্বাচন কার্যত একটি কৌতুক মাত্র।"

সালিক এই নির্বাচনকে 'প্রতারণা' বলেছিলেন; এই সালিক পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পিআরও হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জেনারেল টিক্কা খানের পরিবর্তে ওয়াশিংটনের পরামর্শে ড. এ. এম. মালিককে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে সামরিক সরকার নিয়োগ দিয়েছিল। উপনির্বাচন সম্পর্কে ড. মালিকের বক্তব্য ছিল, "এই উপনির্বাচনের অনেক ভুলত্রুটি ছিল, কিন্তু একদম কোন কিছু না হওয়ার চেয়ে এটি ভালো ছিল ।"

১৯৭১-এর অক্টোবরে গার্ডিয়ান পত্রিকা লিখে, "অধস্তন সহযোগী নির্বাচনে ইয়াহিয়া খান বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারেন নি।" ড. মালিক, যিনি মনে করেন কোন কিছু না হওয়ার চেয়ে কিছু একটা হওয়া ভালো, তার চেয়ে ভালো আর কে ইয়াহিয়ার সহযোগী হতে পারতেন? তিনি জিন্নাহ'র আনুকূল্য লাভ করেন, কারণ যখন ১৯৪৮ সালে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা আন্দোলন করছিল তখন তিনি তার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে জিন্নাহর কাছে অভিযোগ করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসেবে ড. মালিককে রাষ্ট্রদূত সমমর্যাদার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। সেই সময় থেকে যখনই কোন কদর্য কাজ করার দরকার পড়েছে তখনই পশ্চিম পাকিস্তানি উন্নসিক শাসকরা এই ব্যক্তিকেই নির্বাচন করেছেন।

পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের সময়ও মালিক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অর্থে দেশের প্রশাসন চালাচ্ছিলেন তার সেনা সচিব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি।

একবার মালিকের আত্মীয়াকে পাকবাহিনীর কয়েকজন জওয়ান ধর্ষণ করলে, তার আত্মীয়ার এ বিষয়ে তাকে কোন একটা ব্যবস্থা নিতে বললে, তিনি রাও ফরমান আলীর সাথে যোগাযোগ করেন। তখন রাও ফরমান তাকে বলেন, "সেনা সদস্যরা সেনা সদস্যের মতোই আচরণ করছে। তাদেরকে সবকিছু ঠিক করে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তারা যদি আমার কোন আত্মীয়াকে ধর্ষণ করতো তাহলেও আমি কিছু করতে পারতাম না।"

১৯৭১ সালের ১০ ডিসেম্বর যখন ফরমান আলী পূর্বের ফ্রন্টে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেন এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার ঘোষণা দেন তখন আসলে তিনি কালক্ষেপণ করতে চাইছিলেন, যেমনটি তার নয় মাস আগে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খান করেছিলেন। ফরমান আলি সালিকের কাছে স্বীকার করেন যে তিনি আসলে যুদ্ধবিরতি চাইছিলেন যাতে করে সময় পাওয়া যায় যে সময়ে পাক সেনারা 'নিজেদের পুনঃপ্রস্তুত করে নতুন উদ্যোমে হামলা করতে পারে'। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলতে তিনি ঐসব 'পাকিস্তানপন্থী বাঙালী এমএনএ এবং এমপিএদের'কে বুঝিয়েছিলেন যারা ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে বা ১৯৭১ সালের উপনির্বাচনে জয়ী হয়েছিলেন।

এমনকি মন্ত্রী পর্যায়ের নিয়োগ দিয়েও পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের পক্ষে দুই একজন বাদে বাকি আওয়ামী লীগের সাংসদদের (কেন্দ্রীয় বা জাতীয় পরিষদের)

মন জয় করা সম্ভব হয়নি। যেসব বিশ্বাসঘাতক সাংসদ পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়েছিলেন তাদের জনগণ বর্জন করেছিল এবং তাদেরকে সবসময় কড়া সেনা প্রহরায় থাকতে হত।

ফরমান আলী'র মতে 'নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি'র সবাই ছিলেন তার নিজের পছন্দ মত বাছাই করা লোক।

বাঙালীরা গভর্নর মালিক আর তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের বিশ্বাসঘাতক হিসেবেই জানতেন। এই বিশ্বাসঘাতকরা ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর যখন স্বাধীনতা দারপ্রান্তে তখন আন্তর্জাতিক রেডক্রসের সহযোগিতা চেয়েছিলেন। স্বাধীনতার দিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কারণেই তারা জনরোষ থেকে বাঁচতে পেরেছিলেন।

এটাই সেই বেসামরিক প্রশাসন যার কথা কিসিঞ্জার তার আত্মজীবনীতে বার বার উল্লেখ করেছেন।

পূর্ব পাকিস্তানে যে সময় উপনির্বাচনের প্রহসন ঘটছিল, ঠিক সে সময়ে মার্কিনীরা কোলকাতায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের অবশিষ্ট চারজন সদস্যকে বাদ দিয়ে শুধু মোস্তাকের সাথে আপোষ নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ব্যাহত করার জন্য একটি দ্বি-মুখি চক্রান্ত সে সময় চলছিল।

হেনরি ব্র্যান্ডন, যিনি কিসিঞ্জার এবং নিক্সন দুজনকেই খুব ভালোভাবে চিনতেন, তিনি তার দ্য রিট্রিট অফ আমেরিকান পাওয়ার গ্রন্থে উল্লেখ করেন. 'কিসিঞ্জার কোলকাতায় আগস্ট, সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে মার্কিনিরা বাংলাদেশের ছায়া সরকারের সাথে যে যোগাযোগ স্থাপন করেছিল সেটিকে যতটা ফলপ্রসু ভেবেছিলেন তেমনটি ছিল না।' তাদের কোন 'কর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক শক্তি' ছিল না এবং তাদের মধ্যে 'মুজিব এবং অন্যান্যরা পরবর্তিতে তাদের দূরে ঠেলে দিবেন' এমন ভয় কাজ করছিল।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, মোস্তাকের চক্রান্ত উদঘাটিত হয়েছিল ঠিক সময়েই। এ বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে তা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য ক্ষতিকর হবে বলে সে সময় এ নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য করা হয়নি। মাহবুবুল আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিবের পদ থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং ১৯৭১ এর নভেম্বর মাসে যে প্রতিনিধি দল তদবীর করার জন্য জাতিসংঘে অনানুষ্ঠানিক সফরে যায় সেটি থেকে মোস্তাককে বাদ দেয়া হয়। মোস্তাক যদি জাতিসংঘে পৌছাতে পারতেন এবং পাকিস্তানি প্রতিনিধি দলের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হতেন তাহলে হয়তো এমন কোন ঘোষণা দিয়ে বসতেন যার ফলে স্বাধীনতা সংগ্রামের অপূরণীয় ক্ষতি হতো এবং তার মার্কিন মিত্ররা এটা অবশ্যই নিশ্চিত করতেন যে ঐ ঘোষণা ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয়।

মোস্তাক আর তার লোকেরা মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে 'তাজউদ্দীন– শেখ মুজিবকে ফিরিয়ে আনতে চান না' এমন বক্তব্য সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করে বেশ দ্বিধা দ্বন্দ্ব তৈরি করতে সক্ষম হন। কাদের সিদ্দিকী বলেন, "এটি একটি জঘন্য মিথ্যাচার হলেও কিছু সময়ের জন্য এটা কিছু মানুষের মনে সন্দেহ তৈরি করেছিল।"

সে সময় যে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল তা শেষ হয়ে যায়নি, এর ফলে অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল।

যেদিন ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল, সেই ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তাজ উদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, "আমি সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলতে চাই, আমাদের মহৎ প্রতিবেশির সহায়তায় শত্রুকে পরাজিত করার মধ্য দিয়েই এই সংকট শেষ হয়ে যাবে না। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মাঝে নেই, আর চার লাখ বাঙালী এখনো পশ্চিমে বন্দী। তাদের মুক্ত করার আগে পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।"

মোস্তাকের বক্তব্যে কোথাও মুজিবের উল্লেখ ছিল না। তিনি নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে এতোটাই ভাবিত ছিলেন যে অন্য কিছু নিয়ে ভাবার অবকাশ তার ছিল না। তিনি বলেন, "আমরা আশা রাখি ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার মৈত্রীর সম্পর্ক চিরস্থায়ী হবে।" তিনি কোন লজ্জা ছাড়াই ঘোষণা দেন, "গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা এবং সমাজবাদের দানবীয় শত্রুকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের ৭৫ মিলিয়ন এবং ভারতের ৫৫০ মিলিয়ন মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করে যাবে।" তিনি এরপরও আরও যোগ করেন, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের 'ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক' ভূমিকার সমালোচনা করার পাশাপাশি, সোভিয়েত ইউনিয়নের 'জন-বান্ধব' ভূমিকার প্রশংসা করেন।

কিন্তু তার এসব কথা তাকে বাঁচাতে পারেনি, তার সহকর্মীরা কেউই আর তাকে বিশ্বাস করেনি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পনেরো দিন পর ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ যখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রণালয়গুলোর দায়িত্ব পুনর্বন্টন করেন তখন মোস্তাকের পরিবর্তে তিনি আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী করেন। এই রদবদল কাউকেই অবাক করেনি। মোস্তাক পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকা অবস্থায় যথেষ্ট অপকর্ম করেছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস লিখে, প্রধানমন্ত্রী তার 'কমিউনিস্ট বিরোধী পররাষ্ট্র মন্ত্রীর স্থলে এমন একজনকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করেছেন যিনি সোভিয়েত ব্লকের সাথে সম্পর্ক মজবুত করবেন।'

এই রদবদলের ফলে, মোস্তাকের দায়িত্বে আসে আইন ও সংসদীয় বিষয়, ভূমি কর ও জরিপ।

এটি একটি অবনতি ছিল। মোস্তাক মর্মাহত হয়েছিলেন, তিনি পদত্যাগ করতে চাইলেও, আসলে এতোটাই ধূর্ত ছিলেন যে তার পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করার জন্য তিনি খুব বেশি জোড়াজুড়ি করেন নি। মন্ত্রিসভায় তার সহকর্মীরা সবাই তার বিরুদ্ধে ছিলেন এবং মুক্তি বাহিনী তখন একটি যুদ্ধংদেহীভাবে ছিল। সরকার থেকে বেরিয়ে গেলে তিনি বড় বিপদের মুখে পড়তেন। তার অপকর্মের কারণে তার প্রতি বাকিদের যে সন্দেহ তৈরি হয়েছিল, তিনি চাইছিলেন সময়ের সাথে সবাই যেন সেটা ভুলে যায়।

তিনি কালক্ষেপন করছিলেন মাত্র।

যখন ১০ জানুয়ারি ১৯৭২, মুজিব দেশে ফিরে আসেন তখন মোস্তাক তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে স্বাগত জানান। তার খুশি হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। ঐ সময়ের আগে পর্যন্ত তার অবস্থা বিপদজনক ছিল। মুজিবের নিরাপত্তায় তিনি আবার শান্তিতে থাকতে পারবেন।

মোস্তাক সব সময় মুজিবের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি প্রায়ই মুজিবের বাড়িতে যেতেন এবং মুজিবের সন্তানরা তাকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন এবং বাইরে থেকে দেখে মনে হত তিনি তাদের খুবই পছন্দ করতেন, বিশেষত মুজিবের সর্ব কনিষ্ট সন্তান রাসেলের প্রতি তার স্নেহ উল্লেখযোগ্য ছিল। তার মধ্যে লোক দেখানো ভাব কম হলেও মুজিব পরিবারের সাথে তার 'সখ্য' রয়েছে এটা তিনি নানাভাবে দেখাতেন।

১৯৭৪ এর ৩১ মে মুজিবের মা সায়রা খানম মৃত্যু বরণ করেন। ঐদিন এতো ঝড় হচ্ছিল যে হেলিকপ্টারে মুজিবের টুঙ্গিপাড়া যাবার কথা সেটি কয়েক ঘন্টা আকাশেই উঠতে পারেনি। কিন্তু মোস্তাক বেশ কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করে মুজিব ও তার পরিবারের টুঙ্গিপাড়া সফরে সঙ্গ দেন। তারা যতক্ষণে টুঙ্গিপাড়া পৌছান ততক্ষণে অনেক বেলা হয়ে যায় । মুজিব তার মায়ের মৃতদেহ ছুঁতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার বড় বোন ফাতেমা তাকে অনুমতি দেন নি । মোস্তাক ইতিমধ্যেই সবার অলক্ষে মুজিবের কাছে চলে গিয়েছিলেন এবং তিনি মুজিবের মায়ের মৃতদেহ ছুঁয়ে ফেলেন। ফাতেমা তার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং বলেন, "আপনি কি জানেন না এমনটি করা যায় না, আপনি কি মুসলমান না?" তিনি এই তিরস্কার মাথা নত করে সহ্য করেন। তিনি একজন পীরের সন্তান ছিলেন, এবং তিনি ধর্মের মূল দর্শন না হোক কঠিনভাবে অন্তত ধর্মের রীতি নীতি পালন করতেন, কিন্তু মুজিবের মায়ের মৃত্যুতে তিনি এতোটাই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি একটি ধর্মীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করে ফেলেছিলেন।

মুজিব যখন মস্কোতে চিকিৎসাধীন ছিলেন তখন হংকং সাপ্তাহিকে 'মুজিবের পরে কে?' শীর্ষক একটি রিপোর্ট লেখার কারণে তাহের উদ্দীন ঠাকুর ঢাকার একজন সাংবাদিকের উপর খুব ক্ষেপে গিয়েছিলেন। যদিও কোন অসৎ উদ্দেশ্যে রিপোর্টটি

করা হয়নি, তারপরও কেউ এমন একটা বিষয় উত্থাপন করতে পারে এটা ভেবেই তাহের উদ্দীন ঠাকুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি বেশ অবাক হয়ে বলেছিলেন, "বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া কেউ বাংলাদেশের কথা ভাবে কিভাবে?"

মোস্তাকও মুজিবের বিষয়ে একই রকম আবেগ দেখাতেন, অন্তত মুজিবের আত্মীয় স্বজনের সাথে কথা বলার সময়।

তাজউদ্দীন বেশ কিছু সময় ধরেই অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের কথা ভাবছিলেন। তার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে পরিস্থিতি জটিল করে না তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি ঠিক তাই করেছিলেন। ১৯৭৪ এর অক্টোবরে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ দেশের বাইরে থাকার পর তিনি ঢাকায় এসে এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের একটি সাক্ষাৎকার দেন যেখানে তিনি সরকারের কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি নিশ্চয়ই তখন সরকার থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু মোস্তাক সরকার থেকে তাজউদ্দীনের বেরিয়ে যাওয়াটা নিশ্চিত করতে চাইছিলেন। তিনি মুজিবের একজন আত্মীয়কে বলেন, "এই ঘটনার পর তাজউদ্দীনকে আর মন্ত্রীসভায় রাখা ঠিক হবে না। এটা এখন বঙ্গবন্ধুর মান সম্মানের প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয় তাজউদ্দীন নয়তো বঙ্গবন্ধু এখন থাকতে পারেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশের কথা কে ভাবতে পারে?"

একজন বন্ধু মুজিবকে তাহের উদ্দীন ঠাকুর সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। মুজিব তখন জিজ্ঞেস করেছিলেন "সে কার প্রতি অনুগত?" "সে মোস্তাকের অনুগত" বন্ধুটি জবাব দিয়েছিলেন। মুজিবের জবাব ছিল "আর মোস্তাক আমার অনুগত।" এ বিষয়ে কথা এখানেই শেষ হয়েছিল।

এ কথা অনেকেই জানতো যে মোস্তাক মুজিবকে পছন্দ করতেন না। অনেকেই ধারণা করতেন মোস্তাকের পক্ষে সম্ভব হলে তিনি মুজিবকে সরিয়ে দিতেন। শুধু মুজিব আর তার আত্মীয় স্বজনরাই এ কথা জানতেন না।

মুজিবের এক ভাগ্নী প্রশ্ন রেখেছিলেন, "মোস্তাক কি ইচ্ছে করেই আমাদের প্রতি বেশি বেশি সখ্যতা দেখাতেন, কারণ পুরোটা সময়ই তার মনের মধ্যে কুপরিকল্পনা ছিল?"

জয় বাংলা!

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর মধ্যে এমন বিশ্বাস ছিল যে তারা বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে শেষ করে দিতে পেরেছে। কিন্তু সত্যি হল পাকিস্তানিরাই লড়াই করার মনোবল হারিয়ে ফেলেছিল। ভারত আকস্মিকভাবে বিমান হামলা আরম্ভ করার মাধ্যমে যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র চারদিন পর ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পাকিস্তানিরা যশোর থেকে পিছু হটে, যশোর তাদের একটি শক্ত ঘাঁটি ছিল, এবং তখন থেকে তারা পূর্বের রণাঙ্গনে ক্রমাগত পশ্চাদপসরণ করতে থাকে। কিন্তু তারা কোথায় পালাতো? সারাদেশ তাদের জন্য প্রতিকূল ছিল এবং সব জায়গায় তারা মুক্তি বাহিনীর আক্রমণের স্বীকার হচ্ছিল। প্রতিটি ঝোপ আর নদীর বাঁকে তাদের জন্য মৃত্যু অপেক্ষা করছিল। তাদের পক্ষে আর লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না।

১০ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী ঢাকায় জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব পল মার্ক হেনরি'র কাছে একটি নোট হস্তান্তর করেন যাতে তিনি যত দ্রুত সম্ভব একটি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে 'পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের' কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেন।
এই নোটে বলা হয়, "যতক্ষণ পর্যন্ত এই যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব কার্যকর করা না হবে, ততক্ষণ সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনের প্রশ্ন আসে না এবং সেনাবাহিনী শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে।"

কিন্তু ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ পাকসেনাদের অবস্থা দাড়িয়েছিল হয় আত্মসমর্পণ নয়তো মৃত্যু। ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং মুক্তি বাহিনী চারিদিক থেকে ঢাকাকে ঘিরে ফেলেছিল।

"তোমরা যদি আত্মসমর্পণ করে পালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ না নাও, তাহলে আমি নিশ্চিত করছি তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে অবধারিত মৃত্যু।"
ভারতীয় সেনা প্রধানের এই সতর্কবাণী সারা ঢাকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

ভারত ঢাকায় বোমা হামলা চালানো স্থগিত রাখে ১৫ ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ৩০ থেকে ১৬ ডিসেম্বর ৯ টা ৩০ পর্যন্ত এই ১৬ ঘন্টার মধ্যে পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা । কিন্তু সকাল ৯ টার পরও পাকিস্তানি সেনা বাহিনী কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বলে মনে হচ্ছিল। মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছিল । বেঁধে দেয়া সময় শেষ হয়ে আসছিল, কিন্তু পাকিস্তানিদের পক্ষ থেকে কোন বার্তা আসছিল না। কোথাও কি কোন ভুল হয়ে গিয়েছিল?

উল্লাস করে ছোড়া গুলির শব্দে সবার আশঙ্কা দূর হয়েছিল। ঢাকা আনন্দে উদ্বেলিত হল। জয় বাংলা! যে স্লোগানটি দেশের মানুষকে নয় মাস যুদ্ধের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল সেই স্লোগানে ঢাকা প্রকম্পিত হল। জয় বাংলা! জয় বাংলা!

মানুষ যেন খুশিতে পাগল হয়ে গিয়েছিল, তারা খুশিতে নাচছিল। কেউ কেউ স্লোগান দিচ্ছিল, "বাংলাদেশ দীর্ঘজীবী হোক।"

শীতের রোদের মধ্যে বাংলাদেশের পতাকা গর্বের সাথে ওড়ানো হল, এবং হঠাৎ আবার মুজিবের প্রতিকৃতি দেখা যেতে লাগলো।

যে ভারতীয় সেনারা ঢাকায় প্রবেশ করল তাদের জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হল। বাংলাদেশের পতাকা বহন করছিলেন এমন একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা তার জীপের চারপাশে জড়ো হওয়া মানুষের উদ্দেশে বলেন, "জয় বাংলা! জয় হিন্দ।" জবাবে সমবেত জনতাও বলে ওঠে, "জয় বাংলা! জয় হিন্দ!" এটিই ছিল স্বাধীনতার মূলমন্ত্র। বাঙালীরা ভারতীয় সেনাদের ঘিরে ধরেছিল, তাদের উপর রাশি রাশি ফুল ছুঁড়ে দিচ্ছিল এবং তাদের এমনভাবে আলিঙ্গন করছিল যেন তারা তাদের বহুদিনের হারিয়ে যাওয়া ভাইদের খুঁজে পেয়েছে। নারীরাও এসব দলে যোগ দিয়েছিলেন।

চোখে পানি নিয়ে একজন বৃদ্ধ জড়ানো কণ্ঠে তাদের উদ্দেশে বলেন, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

ছোট ছোট বাচ্চারা ভারতীয় সেনাদের দেখে হাত নাড়ছিল আর তার মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে যাচ্ছিল।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স এমন একজন বৃদ্ধের সাথে একটি ছোট ছেলে, যে সম্ভবত তার নাতি, তাকে এমন ভাবে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন যেন এই চমৎকার সকালটি উদযাপন করার জন্য কারও বয়সই খুব কম নয়।

মুক্তি বাহিনীকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল তারা খুব ক্লান্ত, কিন্তু তারা একই সঙ্গে গর্বিত এবং লক্ষে অবিচল ছিল। এই মুক্তি বাহিনীই তাদের অসম সাহসিকতার জোড়ে পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে দেশের সবচেয়ে দুর্যোগের সময় মানুষের মনে আশা জাগিয়ে রেখেছিলেন। জনগণ এই তরুণ যোদ্ধাদের জড়িয়ে ধরে তাদের আবেগ প্রকাশ করছিল।

কয়েক ঘণ্টা সময় পর্যন্ত ঢাকার রাস্তায় ভারতীয় সেনাদের চেয়ে পাক সেনার সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। তারা খুবই মনোবলহীন অবস্থায় ছিল, কিন্তু তারপরও যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নিরস্ত্র করা না হচ্ছিল ততক্ষণ বিপদের সম্ভাবনা ছিল। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে একজন পাক সৈনিক ভারতীয় বাহিনীর উপর গুলি চালায়। গুলি বিনিময়ের ফলে একজন পাকিস্তানি সৈনিক এবং একজন ভারতীয় মেজর নিহত হন। একজন ভারতীয় ক্যাপ্টেন আর্ত চিৎকার করে বলেন, "হায় ঈশ্বর! এই সংঘাত কি কখনো শেষ হবে না?"

ধানমণ্ডীর ১৮ নাম্বার সড়কের যে বাড়িতে বেগম মুজিব এবং তার সন্তানেরা আটক ছিলেন, সে বাড়ির পাহারার দায়িত্বে থাকা একজন পাকিস্তানি সৈনিক বাড়ির

সামনে দিয়ে যেতে থাকা একটি গাড়ির দিকে লক্ষ্য করে মেশিন গান চালালে একজন নারী চিকিৎসক নিহত হন।

শত শত বাঙালী হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালকে ঘিরে ধরছিলেন, গভর্নর মালিক এবং তার মন্ত্রীসভার সদস্যরা এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এই হোটেলটিকে আন্তর্জাতিক এলাকা ঘোষণা করেছিল। তারা চিৎকার করে, "বিশ্বাসঘাতকদের ধরো' এই দাবী জানাচ্ছিলেন। তাদের এই দাবী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল।

একজন ভারতীয় কর্নেল তার বাহিনী নিয়ে সেখানে উপস্থিত না হলে হয়তো বিক্ষুব্ধ জনতা ঐ হোটেলে হামলা চালাতো।

অধিকাংশ বিহারীই প্রচণ্ড রকম ভারত বিদ্বেষী ছিল, এবং যে নয় মাস বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল সে সময়ে তারা বাঙালীর উপর পাক বাহিনীর দমন পীড়নে সহায়তাও করেছিল। এ সময়ে তারা ভয় পাচ্ছিল যে এবার তাদের উপর বাঙালীরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাবে এবং তারা প্রার্থনা করছিল যেন ভারতীয় বাহিনী দ্রুত এসে পৌছায়।

এমন অনেক বাঙালী ছিলেন যারা বিহারীদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং বিহারীদের উপর কোন প্রতিশোধমূলক হামলার বিপক্ষে ছিলেন, কিন্তু কেউ তাদের কথা শুনছিল না। ভারতীয় বাহিনী দ্রুত ব্যবস্থা নেয়ার কারণেই প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত বাঙালীর হাত থেকে মোহাম্মদপুর আর মিরপুরের বিহারী কলোনীগুলো রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতীয় বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে থাকা মেজর-জেনারেল জে. এফ. আর. জ্যাকব একটি হেলিকপ্টার যোগে ঢাকায় পৌছান। তাকে অভ্যর্থনা জানাতে আট নয় জন বাঙালী এয়ারপোর্টের গেট দিয়ে প্রবেশ করেন। তারা তার সাথে করমর্দন করেন। তখন সেখানে উপস্থিত একজন বিদেশি সাংবাদিকের দিকে ফিরে তারা প্রশ্ন করেন, "আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন?" তখন ঐ সাংবাদিক বাঙালীদের বলেন যে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছেন। করমর্দনের জন্য বাঙালীরা তার দিকে বাড়িয়ে দেয়া হাত তখন ফিরিয়ে নেন। মার্কিন সাংবাদিকরা শুরু থেকেই বাঙালীর দুর্দশার বিষয়ে সমব্যথি ছিলেন, কিন্তু ঐ দিন বাংলাদেশের তরুণরা কোন মার্কিনির সাথেই করমর্দন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাদের একজন বলেন, "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর খুশি নই।"

ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ বাহিনীর জিওসি-ইন-সি লেফট্যানেন্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং আরো কিছু উর্ধ্বতন সামরিক কর্তা ব্যক্তি নিয়ে দশটি হেলিকপ্টারের একটি সারি ঢাকায় পৌছে।

কিন্তু বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এম.এ.জি. ওসমানী সে সময় কোথায় ছিলেন? বিজয়ের এই দিনটিতে তার তো ঢাকাতে থাকার কথা।
আত্মসমর্পণের আনুষ্ঠানিকতা সারা হয় রেসকোর্স ময়দানে বিকেল ৫ টায়, ৭ মার্চ ১৯৭১-এ এখানেই মুজিব তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেছিলেন, "এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

পাকিস্তানের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন পাকিস্তান বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের দায়িত্বে থাকা লেফটেনেন্ট-জেনারেল এ. এ. কে. নিয়াজি। তিনি তার সামরিক পদক খুলে রাখেন, তার পিস্তলের গুলি আনলোড করেন এবং লেফটেনেন্ট জেনারেল অরোরা'র কপালে তার নিজের কপাল ঠেকিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। তিনি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন, কিন্তু অনেক কষ্টে সেদিন অশ্রু সংবরণ করেছিলেন, এর আগে এক সময় বাঘ হিসেবে পরিচিত এই নিয়াজিরও সুদিন ছিল।

"ঢাকা এখন একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন রাজধানী" ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ বিকেল ৫ টা ৩০ মিনিটে ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের ঘোষণা দেয়ার সময় এ কথাগুলো বলেন। তিনি বাংলাদেশের মানুষকে তাদের এই বিজয়ের মুহূর্তে সাধুবাদ জানান এবং মুক্তি বাহিনীর যুবক এবং বালক যোদ্ধাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "এ বিজয় শুধু তাদের নয়, পৃথিবীর সকল জাতি যারা স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে তারা এই বিজয়কে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে মনে রাখবে।" তিনি ভারতীয় বাহিনীরও প্রশংসা করেন এবং জানান যে প্রয়োজনের চেয়ে একদিনও বেশি ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে থাকবে না। "আমাদের লক্ষ" তিনি বলেন, "খুবই সুনির্দিষ্ট- বাংলাদেশের জনগণ এবং মুক্তি বাহিনীকে তাদের স্বাধীনতা অর্জনে সহায়তা করা এবং আমাদের নিজেদের দেশে পাকিস্তানি আগ্রাসন ঠেকানো।"

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের আগে আগে, মুখোশধারী আলবদর এর সদস্যরা দুশোরও বেশি চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিত্বকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের হত্যা করে, তারা এ কাজ করে পাক সেনা বাহিনীর প্রহরায় এবং যে সময় কারফিউ জারি করা ছিল সে সময়ে। মোহাম্মদপুরে রায়ের বাজার এলাকায় একটি বিহারী কলোনীর কাছ থেকে এসব ব্যক্তিত্বদের লাশ উদ্ধার করা হয়। কিছু কিছু মৃতদেহ এতোটাই ক্ষতবিক্ষত ছিল যে সেগুলোকে সনাক্ত করা যায়নি।

এসব নৃশংস হত্যাকাণ্ডের একটি তাৎক্ষণিক ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ছিল। একজন চিকিৎসক বলেন, "আরো বেশি সময় পেলে এই সব খুনীরা আর কতোটা ভয়ঙ্কর হতে পারতো? আমরা সব ভুলতে পারি এই হত্যাকাণ্ড কোনদিন ভুলবো না।"

প্রতিশোধের শপথ নিয়ে তিনি বলেন, "এসব হত্যাকাণ্ডের সাথে যারা জড়িত তাদের শাস্তি না দেয়াটা হবে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ফাঁসি বা ফায়ারিং স্কোয়াডের মাধ্যমে মৃত্যু এদের জন্য কম শাস্তি হবে, এদেরকে সেভাবেই হত্যা করতে হবে যে নৃশংস প্রক্রিয়ায় তারা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে, ধীরে ধীরে তাদের দেহকে খণ্ড বিখণ্ড করে।"

রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের কাছে 'যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বিরতি'র আবেদন জানানোর পর পর বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। ঐ আবেদনটি আসলে ছিল কাল ক্ষেপণের অশুভ পায়তারা মাত্র। ফরমান আলী হত্যা করার জন্য ১৫০০ বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। খুব দ্রুত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল বলেই তাদের বেশির ভাগ বেঁচে গিয়েছিলেন।

ফরমান আলীকে দেখে নৃশংস খুনীর চেয়ে বরং মফস্বলের অধ্যাপক মনে হত, কিন্তু তিনি হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারতেন। ফরমান আলী গভর্নর মালিক কে ঢাকার শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিদের ১৩ ডিসেম্বর সরকারী ভবনে আমন্ত্রণ জানাতে রাজি করিয়েছিলেন, কিন্তু যারা ঐ দিন হাজির হবেন তাদের সবাইকে হত্যা করা হবে– এমন খবর জানতে পেরে মালিক ঐ নিমন্ত্রণ একেবারে শেষ মুহূর্তে বাতিল করেছিলেন।

সেই ১৩ ডিসেম্বরেই আল-বদর বাহিনী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার জন্য তুলে নিয়ে যায়।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন কারাকাস থেকে প্রকাশিত লা ভারদাদ পত্রিকা ৩০ জুন ১৯৭১ এ ছাপে, "পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের একটি অভিযান চালাচ্ছে, হিটলারের পর এমন কোন হত্যাযজ্ঞের ঘটনা বিশ্ব দেখেনি। তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ছাত্র আর বুদ্ধিজীবীরা... ।"

তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যও বুদ্ধিজীবীরাই ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হবার একদিন পর একজন মুক্তিবাহিনীর সদস্য বলেন, "বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া দেশের স্বাধীনতাই অপূর্ণ থেকে যায়। যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি। আমরা বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনতে আমাদের জীবন দিয়ে দিব ।"

নভেম্বর ১৯৭১-এ যখন মুক্তির সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত তখন এক পাকিস্তানি ব্যাংকার বলেছিলেন, "পূর্ব পাকিস্তান হয়তো বাংলাদেশ হয়ে যাবে, কিন্তু তা দেখার জন্য মুজিব বেঁচে থাকবেন না। বাঙালীদেরকে মুজিবের স্মরণে ভাস্কর্য নির্মাণ করতে হবে।" এই ব্যাংকার দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশে আটকে পড়া হাজার হাজার পাকিস্তানিদের মতই নিশ্চয়ই মুজিবের জীবনের নিরাপত্তার জন্য প্রার্থনা করছিলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত মুজিব ঢাকায় না ফিরে আসছেন ততক্ষণ একজনও পাকিস্তানি নাগরিকের দেশে ফেরার পরিস্থিতি সে

সময় ছিল না, কিন্তু ইসলামাবাদে ক্ষমতায় থাকা উন্মাদ ব্যক্তিরা হয়তো বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানিদের জীবনের পরোয়া নাও করতে পারতো। পাক সেনারা তাদের আত্মসমর্পণের ঠিক আগেও যখন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করতে পেরেছিল, তা থেকে ধারণা করা যায় এদের দ্বারা যে কোন অপকর্মই করা সম্ভব।

দেশ স্বাধীন হওয়ার দুই দিন পর কিছু বাংলাদেশী সরকারী কর্মকর্তা ঢাকায় এসে পৌছান। কিন্তু কি কারণে তখনো বাংলাদেশ সরকারের সদস্যরা ভারতে আটকে ছিলেন তা কারও জানা ছিল না। এটা ছিল অবিশ্বাস্য।

এই সরকার তার আগের সরকারের উত্তরসুরি হিসেবে ক্ষমতায় আসেনি, এই সরকার ক্ষমতায় এসেছিল একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। নিঃসন্দেহে ঐ সময় প্রশাসনিক সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কিন্তু ঐ সময় সবচেয়ে দরকারী ছিল রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা। পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের সময় ঢাকায় বাংলাদেশের সেনা প্রধান কর্নেল ওসমানীর অনুপস্থিতিই যথেষ্ট বাজে ঘটনা ছিল। এরপরও বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের সদস্যরা কেন ভারতে বিলম্ব করছিলেন? তাদের কি কোন তাড়া ছিল না, তাদের কি কোন রাজনৈতিক দায়িত্ববোধও ছিল না? তারা কি তাদের নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন? তাদের যথার্থ স্থান ছিল সদ্য স্বাধীন দেশের জনতার মাঝে। তাদের উচিৎ ছিল বিজয়ের দিনেই ঢাকায় পৌছানো, দরকার বোধে তাবুতে বসবাস করা এবং যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজে হাত দেয়া। শুধুমাত্র নায়কোচিত এবং লক্ষ্যে অবিচল নেতৃত্বই পারতো ঐ সময়ে দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে। স্বাধীনতা দেশের যে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে সেটিকে ভালোভাবে অনুধাবন করে সাহসী রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়া এবং কার্যক্রম শুরু করার এটিই ছিল সেরা সময়। এই সময়ে সরকারের মধ্যে যে কোন দুর্বলতার লক্ষণ দেখা গেলে তা দীর্ঘ মেয়াদে দেশের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হতে পারতো।

স্বাধীনতার ছয় দিন পর, ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সদস্যরা ঢাকায় এসে পৌছান। তারা দেরী করায় সবার মনে যে সন্দেহ বা দ্বিধা তৈরি হয়েছিল তা খুব দ্রুত দূরীভূত হওয়ার মত ছিল না।

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ ঢাকায় পৌছার পরদিন পত্রিকার সম্পাদকদের সাথে একটি বৈঠক করেন। তার বক্তব্যের ভূমিকায় তিনি বলেন, "আমরা যারা এখানে বসে আছি মেশিন গানের এক ঝাঁক গুলি আমাদের সবাইকে হত্যা করতে পারে।" ঠিক যেভাবে অং সাং আর তার মন্ত্রীসভাকে ১৯৪৭ সালে রেঙ্গুনে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাজউদ্দীন ভয় পাওয়ার লোক ছিলেন না, বা তিনি কোন নাটকীয়তার আশ্রয়ও নেন নি সেদিন। আসলে নয় মাস সময় ধরে পাকিস্তানি

বাহিনীর পক্ষ থেকে নিরন্তর মৃত্যুর হুমকির মধ্যে থাকার পর তিনি আমরা যেন সহজে বুঝতে পারি এমন ভাষায় কথা বলছিলেন।

তাজউদ্দীন একভাবে বলেন, যে সমস্ত সাংবাদিক পাকিস্তানিরা হামলা শুরু করার পরও ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন তাদের সবাইকে পাক বাহিনীর দোসর বলতে পারতেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি তা মনে করেন না। তিনি জানতেন সাংবাদিকদের কেউ কেউ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তির সংগ্রামে নানা ভাবে সহায়তা করেছেন।

তারপরও তাজউদ্দীনের এই বক্তব্য কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাক বাহিনীকে সহায়তা করেছেন এমন কোন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার ইচ্ছা না থাকলে তার এমন বক্তব্য দেয়া উচিৎ হয়নি। দুই একজন সাংবাদিককে ভুলক্রমে কারাবন্দী করলেও এমন কিছু হত না। এতে বোঝা যেত সরকার পাক বাহিনীকে সহায়তাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বদ্ধ পরিকর।

দুয়েকজন সাংবাদিক তাদের চাকুরি হারান। কিন্তু একজন সাংবাদিককেও পাক বাহিনীকে সহায়তা করার অপরাধে আটক করা হয়নি ।

পাক বাহিনীকে সহায়তা করেছেন এমন একজন সাংবাদিক বলতে থাকেন যে তাজউদ্দীন ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন এমন সব সাংবাদিককেই পাক বাহিনীর সহায়তাকারি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এমন কিছু লোক সব সময়ই থাকে যারা তাদের নিজ স্বার্থের জন্য এমন কি শয়তানের সাথেও হাত মিলায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালিন ফ্রান্স সহ বিভিন্ন ইউরোপিয় দেশে প্রতিরোধকারি বাহিনীর সদস্যদের গল্প পড়তে রোমাঞ্চ লাগে এ কথা সত্য, কিন্তু এ কথাও সত্য যে প্রতিরোধ যুদ্ধ চলাকালিন সময়েও ঐ সব দেশে হাজার হাজার লোক জার্মান দখলদার বাহিনীর সহায়তাকারির কাজ করেছে।

ফ্রান্সে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মোট ১,২৪,৭৫০ জনকে জার্মান দখলদারদের সহায়তা করার অপরাধে বিচারের মুখোমুখি করা হয়। এদের মধ্যে ৭৪৭ জনকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং আরও ৩৫,০০০ ব্যক্তিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রশাসন থেকে হাজার হাজার ব্যক্তিকে চাকুরিচ্যুত করা হয় বা পদাবোনতি দেয়া হয়। এরপরও অন্যান্য পশ্চিম ইউরোপিয় দেশের তুলনায় ফ্রান্স দখলদার বাহিনীর সহায়তাকারিদের বিষয়ে কম কঠোর ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পর যে সব লোকের বিরুদ্ধে হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করার অভিযোগ ওঠে তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩০,০০০; এই সংখ্যাটি ৭৫ মিলিয়ন মানুষের দেশের জন্য বেশ ছোট। কিন্তু এদের মধ্যে শত শত ব্যক্তিকে খুঁজেই পাওয়া যায়নি। তাদেরকে খুঁজে বের করার কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি; কারাগারগুলো তখন হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারিদের দ্বারা এতোটাই ভর্তি হয়েছিল যে এসব লোককে নিখোঁজ বলে দেয়াটাই সুবিধাজনক ছিল।

এসব সহায়তাকারিদের পাশাপাশি এমন অনেক লোক তখনো ছিলেন যারা সবকিছুর পরও পাকিস্তানিদের প্রতি সমব্যথী ছিলেন। যত যাই হোক, যে ৬৫ মিলিয়ন লোক মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশে থেকে গিয়েছিলেন তাদের সবাইকে পাক বাহিনীর সহায়তাকারি বলাটা একটা জাতীয় অপমান। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটিকে মুক্তিযুদ্ধ দাবি করলে তার সাথে দেশে থেকে যাওয়া মানুষকে হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বলে মন্তব্য করাটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না।

যদি দেশের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন না দিত তাহলে মাত্র নয় মাসে দেশ স্বাধীন হতো না। মুক্তিবাহিনী স্বয়ং ঢাকা শহরে খুব সহজেই তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যেতে পেরেছিল কারণ শহরের মানুষ তাদের ব্যাপক সহায়তা করেছিল। যখনই পাক বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল তখনই মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা নির্দ্বিধায় যে কোন বাড়ি, অফিস বা ব্যাংকে ঢুকে যেতে পারতো। দেশের মানুষের সর্বাত্মক সমর্থন না করলে মুক্তি বাহিনী এবং ভারতীয় বাহিনী যত দ্রুত ঢাকায় পৌছেছিল তত দ্রুত পৌছাতে পারতো না।

এমন হতে পারে যে যারা বিভিন্ন সময় মুক্তি বাহিনীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের নিজেদের জন্য সব দরজাই খোলা রাখার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু এমন অনেকেই ছিলেন যারা প্রতিদিন নিজেদের জীবন বিপন্ন করে মুক্তি বাহিনীকে সহায়তা করতেন, এদের মধ্যে নারীরাও ছিলেন যারা তথ্য আদান প্রদান সহ অন্যান্য বিপদজনক অভিযানে সহায়তা করতেন।

যে দশ মিলিয়ন বাঙালী মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের বাদ দিলে ঐ সব আশ্রয় পাওয়া লোকদের মধ্যে একটি খুব ছোট অংশই দেশের স্বাধীনতার জন্য কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দেশে ফিরে তারা খুব দেশপ্রেম দেখাচ্ছিলেন এবং যারা দেশে থেকে গিয়েছিলেন তাদের জাতীয়তাবোধ নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন। তারা এমন ভাব করছিলেন যেন ভারতে পালিয়ে গিয়ে তারা বিশেষ মর্যাদার দাবিদার হয়ে গিয়েছেন; এদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা নভেম্বরের দিকে যখন দেশের স্বাধীনতা প্রায় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে সে সময় দেশ ত্যাগ করেছিলেন । প্রথম দিকে তাদের দেশে ফিরে আসা বীরের সম্মান দেয়া হলেও, খুব দ্রুতই এ ধরণের লোকদের বিরুদ্ধে মত তৈরি হতে থাকে। কেউ কেউ তাদের কৌতুক করে 'হাজী' বলে সম্বোধন করতে থাকেন। যাই হোক যে দশ মিলিয়ন লোক ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে খুব ছোট একটি অংশই এমন আচরণ করেছিলেন। অবশিষ্টদের অধিকাংশই ছিলেন দরিদ্র মানুষ, যারা সরকারের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য পুনর্বাসন ভাতা দিয়েই নতুন করে জীবন শুরু করার উদ্যোগ নিচ্ছিলেন। খাবার ও আশ্রয় অনুসন্ধানের মত বেঁচে থাকার মৌলিক চাহিদা মেটানো নিয়ে তারা এতোটাই ব্যস্ত ছিলেন যে অন্য কিছু নিয়ে ভাববার মত সময় তাদের হাতে ছিল না।

বদরুদ্দীন উমর বলেন, যখন দেশত্যাগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বা দেশত্যাগ করেন নি এমন ৬৫ মিলিয়ন মানুষকে হানাদার বাহিনীর সহায়তাকারী বলা হতে লাগলো তখন 'ভারতের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মনোভাব ক্রমেই বন্ধুত্ব থেকে শত্রুতার দিকে যেতে থাকল'। এতে কোন সন্দেহ নেই যে কিছু কিছু কর্মকর্তা যারা অস্থায়ী সরকারের হয়ে কাজ করেছিলেন তাদের ঔদ্ধত্য এক ধরণের বিদ্বেষ তৈরি করেছিল, কিন্তু 'ভারত-ফেরত ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্বেষ ক্রমান্বয়ে ভারত-বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছিল' বলা হলে এতোটাই সরলীকরণ করা হয়ে যায় যে বলা যায় এখানে আসলে একটি ভুল চিত্র দেখানো হচ্ছে।

যারা 'সীমানা পেরোনো'র কারণে বিশেষ মর্যাদা দাবি করছিলেন তাদের মধ্যে সবাই যে ভারতের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন তা কিন্তু নয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন বিদেশী এজেন্ট। কেউ কেউ ভয়ঙ্কর ভারত বিরোধী পরিকল্পনায় অংশ নিয়েছিলেন, অনেকে ভিন্ন উপায়ে আইয়ুব সরকারকে সহায়তা করেছিলেন। এমন কি হতে পারে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে শরণার্থী হিসেবে ভারতে যাওয়ার ফলে তাদের এসব অতীত অপকর্ম মুছে গিয়ে তারা সব নতুন মানুষে পরিণত হয়েছিলেন? হয়তো দুই একজনের ক্ষেত্রে এটা সত্য।

ভারত থেকে ফেরত আসাদের মধ্যে অনেকে ছিলেন পিকিংপন্থী বামপন্থী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন সত্যিকারের বামপন্থী, কিন্তু অনেকে ছিলেন বামপন্থার মুখোশের আড়ালে সাম্প্রদায়িক। তারা মোটেও বদলাননি, কিন্তু তাদের জন্য সেই সময়টা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় তারা চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেছিলেন। এসব লোকের মধ্যে এমন অনেকেও ছিলেন যারা আগে ভারতের প্রতি অনুরক্ত হয়ে থাকলেও ভারতে গিয়ে তাদের সেই অনুরাগ কোন কারণে কেটে গিয়েছিল। এটা হয়তো সে ধরণের প্রেম কাহিনীর মতো যেখানে একজন প্রেমিক অনেক স্বপ্ন নিয়ে শুরু করলেও পরে বুঝতে পারে বাস্তবতা তার স্বপ্ন থেকে অনেক দূরে।

যদি ১০ মিলিয়ন লোক ভারতে আশ্রয় নিয়ে থাকে, তাহলে অন্তত এর দ্বিগুণ পরিমাণ লোক দেশের ভিতরেই নিজেদের বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েছিলেন। দখলকৃত বাংলাদেশে সর্বত্রই ছিল মৃত্যু। সে সময় মানুষ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দেও ভয় পেত, তাদের মনে হত হয়তো ছোট বাচ্চার কান্নার শব্দেও তাদের বাড়ির সামনে টহলরত পাকসেনারা বিরক্ত হয়ে উঠবে। হাঁটার সময় তারা নিজেদের ছায়াকেও ভয় পেতেন, যে কোন শব্দ তাদের চমকে দিত এবং এগিয়ে আসা গাড়ির শব্দে ভয়ে তাদের আত্মা শুকিয়ে যেত।

দশ মিলিয়ন লোক ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এরপরও আরও ৬৫ মিলিয়ন লোক পেছনে থেকে গিয়েছিল। এদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক স্বল্প বা দীর্ঘ সময়ের জন্য নিজ দেশেই পলাতকের জীবন যাপন করেছিল। তাদেরকে শরণার্থী বলা যাবে না

কারণ আতঙ্কের রাজ্যে পরিণত হওয়া দেশে সেই সময় কেউই তাদের আশ্রয় দেয়ার মত ছিল না। এদের অনেককেই তখন পাক বাহিনী খুঁজে বেড়াচ্ছিল। এমন কি রুহুল কুদ্দুস, যিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আসামী এমন তিন জন সি এস পি (সিভিল সার্ভিস অফ পাকিস্তান) অফিসারের মধ্যে একজন ছিলেন, তিনিও দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র এক মাস আগে নভেম্বর মাসে সীমান্ত পেরিয়ে ভারত যান, তাও প্রবাসী সরকার তাকে ডেকে পাঠানোর পর। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশ সরকারের মহা সচিবের দায়িত্ব পালন করেন।

কী কারণে অনেক দেশপ্রেমিক বাংলাদেশী ভারতে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন দেশের ভিতরে শিকারির ভয়ে পালাতে থাকা পশুর মত জীবন যাপন করেছিলেন। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রখ্যাত কবি শামসুর রাহমান তার কবিতায় লিখেছেন, "আমিও নিজেকে ভালোবাসি...।" আর সবার মত তারও অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তিনি নিজের দেশের মানুষের পাশে থেকে গিয়েছিলেন যাদের 'দিন আর রাত সব একাকার হয়ে গিয়েছিল।'

যখন বেঁচে থাকার প্রশ্ন সামনে চলে আসে তখন এমন কি কখনো কখনো পিতৃত্বের বন্ধনও দুর্বল হয়ে পড়ে। অনেক বাবাই সে সময় সন্তানদের ফেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই পরিবারের টানে দেশে থেকে গিয়েছিলেন। এক ভাই যখন ভারতে চলে গেছে, তখন হয়তো অন্য ভাই তাদের অসুস্থ বৃদ্ধা মাকে ফেলে পালিয়ে যেতে চায়নি। পালিয়ে যাওয়াটা এক হিসেবে সবচেয়ে স্বাভাবিক ঘটনা ছিল, অনেকেরই পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু পালিয়ে না গিয়ে থেকে যাওয়ার কারণগুলো এতোই জটিল যে কেবল একজন দক্ষ ঔপন্যাসিকের পক্ষেই সেগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করা সম্ভব।

একজন বাঙালী কূটনীতিক যিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক দিন আগেও সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ বিষয়ে পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণনা করছিলেন, তাকেই আবার দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প সময় পরে বাংলাদেশ সরকারের হয়ে কথা বলতে দেখে একজন ভারতীয় সাংবাদিক বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ সাংবাদিকটি প্রশ্ন রেখেছিলেন, "বাংলাদেশকে কি সুযোগ সন্ধানীদের সহায়তায় পাকিস্তানের মত করেই তৈরি করা হচ্ছে?" যদিও ঐ কূটনীতিকের নাম প্রকাশ করাটা অন্যায় হয়েছিল, তারপরও সাংবাদিকের প্রশ্নটি গুরুত্ববহ।

সুযোগ সন্ধানীরা সব সময়ই সুবিধা নেয়, তারা সব আমলেই কর্তৃত্বকে যথাযথ সেবা করে থাকে। এমনও হতে পারে ঐ কূটনীতিকের আচরণ ছিল পেশাদারী, হয়তো তার কাছে কয়েকদিন আগে যা বলেছিলেন তার ঠিক বিপরীত কথা বলাটা অনৈতিক বা অপমানকর মনে হয়নি।

অনেক বাঙালী কূটনীতিকই মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই অন্তর্বর্তীকালিন বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাদের পরবর্তী নির্দেশ

না দেয়া পর্যন্ত নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করতে বলা হয়েছিল। এভাবেই তারা বাংলাদেশকে সহায়তা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর পাশাপাশি এমন অনেক কূটনীতিকও ছিলেন যারা দেশ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের পক্ষে তো আসেনই নি বরং পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর ছেড়ে বাংলাদেশের সরকারের পক্ষে আসার আগে এ নিয়ে অনেক দর কষাকষিও করেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিয়েছিলেন দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রায় বছর খানেক পর।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরে চাকুরি করার সুযোগ সুবিধা ছেড়ে বাংলাদেশের পক্ষে এসে অনিশ্চিত জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেয়াটা বাঙালী কূটনীতিকদের জন্য কঠিন ছিল। একজন বাঙালী কূটনীতিক বলেছিলেন, "অনিশ্চিত জীবনের চেয়েও যে বিষয়টি নিয়ে আমরা বেশি ভাবিত ছিলাম তা হল, যদি আমরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করি তাহলে হয়তো দেশে থাকা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের নির্যাতন করা হবে।" তার এই যুক্তি খুবই গ্রহণযোগ্য।

যে সব বাঙালী কূটনীতিক পাকিস্তান বা তার বন্ধু রাষ্ট্রগুলোতে অবস্থান করছিলেন তাদের অবস্থা সে সময় সত্যিই খুব জটিল ছিল।

থার্ড সেক্রেটারীর মর্যাদা সম্পন্ন একজন বাঙালী কূটনীতিক রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের নিয়োগ দাবি করেন, কারণ তিনি অনেক আগেই 'বিশ্বাসঘাতকতা' করে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করেছিলেন। (এটাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলা যায় কেবল পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিতে, কিন্তু অনেক বাঙালী কূটনীতিক তাদের বাংলাদেশের পক্ষ নেয়াটাকে 'বিশ্বাসঘাতকতা' বলেন। এটাকি ভাষাগত ভুল, না কি তারা এভাবেই বিষয়টি দেখে থাকেন?)

অনেক বাঙালী কূটনীতিককেই ভুল করে পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বনকারী মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ কেউ আসলেই মনে প্রাণে পাকিস্তানপন্থী ছিলেন। কিন্তু পররাষ্ট্র দপ্তরের বাইরের কিছু কর্মকর্তা, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের জন্যও এ কথা প্রযোজ্য।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তরে কর্মরত অধিকাংশ বাঙালী কর্মকর্তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন তাদের কাজ অব্যাহত রেখেছেন, এদের মধ্যে অনেকের পদোন্নতিও হয়েছিল যুদ্ধ চলাকালিন। তবুও দুই একটি ব্যতিক্রম বাদে প্রায় সবারই চাকুরি দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও বহাল ছিল, এমন কি পাকিস্তান সরকারের বিশেষ কৃপা পেয়েছেন এমন অনেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে আসীন হয়েছিলেন যেখান থেকে তারা জাতীয় নীতিকে প্রভাবিত করতে পারতেন। বিতর্কিত অতীত রয়েছে এমন কর্মকর্তারা কিভাবে এসব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেলেন তা ব্যাখ্যাতীত।

কেন এসব বাঙালী কূটনীতিক যারা আগে থেকেই জনগণ থেকে অনেক দূরে ছিলেন, তাদের কাছ থেকে আরও বেশি কিছু আশা করা হবে? বরং সিএসপি

কর্মকর্তারা জেলা পর্যায়ে দায়িত্ব পালনকালে বাংলাদেশের মানুষের কাছে যাওয়ার এবং বাঙালী আবেগ অনুভূতি সম্পর্কে জানার কিছু সুযোগ পেতেন।

সবকিছু বিবেচনা করে বলা যায় কিছু বাঙালী কূটনীতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকেই তাদের নিজেদের জীবনের অনিশ্চয়তা আর দুর্দশার কথা না ভেবে নিজ নিজ চাকুরি থেকে ইস্তফা দেন। তাদের পদত্যাগের ঘটনা ব্যাপক প্রচার পায় এবং এর ফলে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম বেগবান হয়।

ইকবাল আতাহার নামে একজন জ্যেষ্ঠ অবাঙালী কূটনীতিকের কথাও এক্ষেত্রে উল্লেখ করতে হয়। পূর্ব পাকিস্তানে পাক বাহিনী যে জঘন্য হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছিল তার প্রতিবাদে ইকবাল আতাহার ১৯৭১ সালে কোন একটি ইউরোপীয় দেশে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত থাকা অবস্থায় পাকিস্তান পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে পদত্যাগ করেন। মুজিব তাকে মধ্য প্রাচ্য মুজিবের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তবে এটি একটি অস্থায়ী নিয়োগ ছিল এবং ইকবাল আতাহারের মনে এ নিয়ে কোন অলীক আশার জন্ম হয়নি।

দেশে পাকিস্তানি আগ্রাসনের সেই ভয়ঙ্কর অন্ধকারের সময় বাংলাদেশের মানুষের বিশ্বাস ছিল স্বাধীনতা এখন শুধু সময়ের ব্যাপার। সব কিছু যখন বাংলাদেশের বিপক্ষে যাচ্ছিল বলে মনে হচ্ছিল সে সময়ে এই দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই মানুষ টিকে ছিল। ১৯৭১-এর জুনে একজন এশীয় সাংবাদিক বলেছিলেন, "আন্তর্জাতিক পর্যায়ের চক্রান্তের কারণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা হয়তো বিলম্বিত হতে পারে, কিন্তু কোন কিছুই এদেশের স্বাধীনতা অর্জন থামিয়ে রাখতে পারবে না।" এ বিষয়ে প্রায় সবাই নিশ্চিত ছিল। এই সময়ে একজন বাঙালী কিভাবে এতোটা অদূরদর্শী হবেন যে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষে প্রচারণামূলক বক্তব্য লিখবেন? হয়তো তারা যদি 'পাকিস্তানের ধারণা'য় বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তখনই তাদের পক্ষে এমন কাজ করা সম্ভব, কিন্তু আগ্রাসন অভিযান শুরুর আগে তো এই সব ব্যক্তির সবাই প্রচণ্ড রকম বাঙালী জাতীয়তাবাদি ছিলেন। আসলে তাদের এসব জাতীয়তাবাদ ছিল ভণ্ডামি এবং তারা পাকিস্তানি প্রভুদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে আগ্রহী ছিলেন।

তাজউদ্দীন জোড় গলায় বলেছিলেন- এটা কোন গৃহযুদ্ধ নয়, বরং স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ছিল। এই পার্থক্যকরণ জরুরি ছিল, কিন্তু এই পার্থক্যটা এমন কি উচ্চ পর্যায়ের অনেক ব্যক্তিত্বের কাছেও স্পষ্ট ছিল না।

পাকিস্তানিদের চালানো ধ্বংসযজ্ঞের কারণে এমনকি প্রচণ্ড রকম পাকিস্তানপন্থী বাঙালীদের অনেকেও বাঙালী জাতিয়তাবাদের সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন, অন্তত যুদ্ধের নয় মাস সময়ের জন্য। কিন্তু যদিও বাঙালীরা পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগ তারপরও অনেক বাঙালী রণাত্মক ছিলেন, এমনকি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উপর ক্ষুব্ধ হওয়ার পরও।

আবু সায়িদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচর্য ছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১২ জানুয়ারি ১৯৭২-এ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন। তিনি বাঙালির উপর পাক বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ার কয়েকদিন পর লন্ডনে একজন সাংবাদিক কে বলেন, "আমি সব সময়ই মনে করতাম দেশের দুটি অংশ একসাথে থাকা উচিৎ। কিন্তু এত এত হত্যা করার পর এখন আর সে প্রশ্নই আসে না। সেনাবাহিনী যদি শুধু বাঙালি হওয়ার কারণে কাউকে হত্যা করতে পারে, তাহলে বাঙালিরা আর একই রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে না। আমার মত একজন বাঙালি যে সবসময়ই অবিভক্ত পাকিস্তানে বিশ্বাসী, সে যদি এভাবে কথা বলতে পারে, তাহলে অন্য বাঙালির মনজয় করা কি আদৌ পাকিস্তানিদের পক্ষে সম্ভব?"

২৩ বছর ধরে পাকিস্তানিরা বাঙালির সাথে প্রভু সুলভ আচরণ করেছে এবং সব সময়ই পাকিস্তানের প্রতি বাঙালির আনুগত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এমন কি একবারের মত একটু দেশপ্রেমের চিহ্ন দেখানোর সময়েও আবু সায়িদ চৌধুরী তার পাকিস্তানি অতীত আর পাকিস্তানিরা বাঙালিদের কাছে আনুগত্যের প্রমাণ দাবি করতে পারে এমন ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারেন নি।

একজন বাঙালি ব্যবসায়ী যিনি প্রায় নয় মাস ধরে বাঙালিদের উদ্ধার না করার কারণে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে অভিসম্পাত করছিলেন, তিনি বিজয়ের দিনে দুঃখে কেঁদে ফেলেন। তিনি তার প্রতিবেশিকে প্রশ্ন করেন, "আমরা কি পাকিস্তানের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেছি?"

যে পাকিস্তানের জন্য তিনি কাঁদছিলেন তা বহুদিন ধরেই ধুঁকছিল এবং ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ সেই পাকিস্তানের মৃত্যু হয়।

এই ব্যবসায়ীটি ছিলেন একজন মুসলিম লীগার, তিনি দেশভাগের সময় কোলকাতা থেকে ঢাকা আসেন এবং ঢাকায় তার ব্যবসার বেশ উন্নতি হয়েছিল। তার পরিচিত পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল এবং হঠাৎ তিনি অনিরাপদ বোধ করছিলেন।

তার স্থান তখন ছিল অতীতে। যারা নতুন আশা আর আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সামনে এগোনোর মত ছিল ভবিষ্যতটা তাদের জন্যই।

তাজউদ্দীন ছিলেন স্পষ্টভাষী এবং মাঝে মাঝে তিনি একদম সরাসরি অপ্রিয় সত্য কথা বলতেন । ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ তিনি এক সাতকারে বলে বসেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছে এবং তারা এদেশের সাথে প্রকাশ্য শত্রুতা দেখিয়েছে।

তারপরও, যখন তিনি তার প্রাথমিক তীব্র ক্ষোভ কাটিয়ে উঠেছিলেন তখন 'মার্কিন সংবাদ মাধ্যম, বুদ্ধিজীবী নেতা এবং আরও যারা অবিচারের বিরুদ্ধে দাড়িয়েছিলেন' তাদের কথা স্মরণ করতে ভোলেন নি। টাইম সাময়িকীকে তিনি

বলেন, "পাকিস্তান আমাদের দেশকে নরকে পরিণত করেছিল। আমরা দুঃখের সাথে লক্ষ করেছিলাম কিছু কিছু বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্রের প্রশাসন বাঙালী নিধনকারীদের সমর্থন দিয়েছিল। বংলাদেশের জনগণ নিক্সনের কাছ থেকে পাওয়া কোন ধরণের সাহায্য পছন্দ করবে না, তবুও আমরা মনের মধ্যে শত্রুতা পুষে রাখার বিপক্ষে।"

১৯৭১-এর ২৬ ডিসেম্বরে সরকারি বক্তব্যে বলা হয়েছিল, "দেশপ্রেম, সাহস এবং বীরত্বে অতুলনীয় মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রস্তাবিত নিরাপত্তা বাহিনীগুলোর জন্য উৎকৃষ্ট সদস্য হতে পারেন।" এই আবেদন মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের 'সমস্ত শক্তি ও সামর্থ একটি নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে বিনিয়োগ করতে' উৎসাহিত করে।

মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের দেশপ্রেম এবং সাহস ছিল প্রশ্নাতীত। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আদর্শবাদী তরুণ যারা একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাইতেন, কিন্তু তাদের একার পক্ষে কোন কিছু করা সম্ভব ছিল না। জাতীয় উদ্যোগের অংশ হিসেবেই তাদের শক্তি সামর্থ বিনিয়োজিত করা দরকার ছিল, আর এমন উদ্যোগ নেয়া কেবল সরকারের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

শুধু স্বাধীনতার যুদ্ধে অংশ নেয়ার মাধ্যমেই কেউ বিপ্লবী হয়ে যায় না। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ থেকে যেতে পারেন যারা হয়তো ভবিষ্যতে দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবেন। ক্যাস্ট্রো যখন সমাজবাদী কার্যক্রম শুরু করেন, তখন একদম যারা তার সাথে কিউবা বিপ্লবের সময় হাভানা দখলে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্য থেকেও কেউ কেউ তার বিপক্ষে চলে যান।

সশস্ত্র সংগ্রাম যদিও প্রয়োজনের সময় নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তারপরও নগুয়েন নগেহ'র ভাষায় 'এটি একটি বৃহত্তর বিপ্লবী সংগ্রামের অংশ মাত্র, এবং সেই বিপ্লবী সংগ্রাম সর্বোপরি ও মূলত রাজনৈতিক।' নগুয়েন নগেহ বলেন, "যখন কেউ সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে মনযোগ দিতে গিয়ে রাজনৈতিক ও আদর্শিক লড়াইকে উপেক্ষা করে তার ফলে তাকে হতাশ হতে হয়, বিশেষত বিজয় অর্জিত হওয়ার পর যখন শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় সে সময়ের জন্য এ কথা বেশি প্রযোজ্য।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ বিপ্লবের পূর্ব পর্যায় হতে পারতো যদি আগে থেকেই এ বিষয়ে রাজনৈতিক পরিকল্পনা থাকতো বা যুদ্ধ চলাকালিন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা থাকতো। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছাড়া যে কোন বিপ্লবী পরিস্থিতি নৈরাজ্যকর সংঘর্ষে পর্যবসিত হতে পারে। ঠিক এমনটিই ১৯৬৮-৬৯ সালের গ্রীষ্মে ঘটেছিল যখন সম্ভবত বিপ্লবের জন্য আরও বেশি অনুকূল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ নিশ্চিতভাবেই সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যদিও দেশ গড়ার কাজটি যুদ্ধ করার মত বীরোচিত মনে নাও হতে পারে। এটি ছিল অনেক দীর্ঘ আর শ্রম সাপেক্ষ। দেশ পুনর্গঠনের কাজে মুক্তিবাহিনীকে সংযুক্ত করা প্রয়োজনীয় ছিল, যাতে তারা অনুভব করতে পারে জাতীয় আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যথায় তারা হতাশার স্বীকার হতে পারতো অথবা তাদের শক্তি ভুল পথে চালিত হতে পারতো।

তাজউদ্দীন বলেছিলেন, সামনে যে দেশ গড়ার কাজ রয়েছে তা এমন কি স্বাধীনতার যুদ্ধের চেয়ে কঠিনতর হবে, কিন্তু তার সহকর্মীরা তাদের ক্ষমতা দখল যে একটি বৃহত্তর বিপ্লব বা স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি অংশ মাত্র সে বিষয়টি যথাযথ বুঝতে পেরেছিলেন কি না তা নিয়ে সন্দেহের সুযোগ রয়েছে। একদিকে তারা সশস্ত্র সংগ্রামকে মহান করে দেখতেন। আবার একই সাথে তারা এই সশস্ত্র সংগ্রামকে তাদের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়ার শুরুর চেয়ে বেশি কিছু মনে করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

সব ধরণের সংঘাতের প্রণোদনার জায়গাটি একই রকম হয়ে থাকে। যখন লড়াই করার অনুপ্রেরণা হারিয়ে যায়, তখন সংঘাত ভয়ঙ্কর চেহারা নিয়ে দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপের শত শত দেশপ্রেমিক পার্টিকর্মী আর যুদ্ধকালিন বীর নায়কেরা দস্যুবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়েন। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এমন হতে পারতো।

যুদ্ধের সময় মানুষের ভেতরের অবদমিত আকাঙ্ক্ষা বেরিয়ে আসে এবং অনেক সময় মানুষের ভিতরের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো এ সময় প্রকট হয়ে ধরা দেয়। এরকম সময় সব ধরণের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পায় আর সাধারণ মানুষ সংঘাতের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেনা, তাদের মধ্যে এ বিষয়ে অভ্যস্ততা তৈরি হয়। যে যুদ্ধে বাংলাদেশের ত্রিশ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছেন এবং হাজারো নারীর সম্ভ্রমহানী করা হয়েছে সেই যুদ্ধের পর সবকিছু আবার আগের মত হয়ে যাবার কোন কারণ ছিল না।

আন্দ্রে মালরো তার লেখায় জেনারেল দ্যা গলের বক্তব্য তুলে ধরেছেন এভাবে, "জাতি আর জাতীয়তাবাদের ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।" জাতীয়তাবাদকে শুভ কাজে যেমন লাগানো যায় তেমন এর অপব্যবহারও হতে পারে। সবার আশা ছিল বাংলাদেশের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ দেশ পুনর্গঠনের কাজে লাগবে। ইতিমধ্যেই ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করার অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছিল।

নতুন স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে নানা রকম আন্তর্জাতিক শক্তি ক্রিয়াশীল থাকবে, এবং এগুলোর মধ্যে সবগুলো বন্ধুভাবাপন্ন হবেনা এটাই স্বাভাবিক। শত্রুরা তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য বন্ধু রাষ্ট্রের নাগরিক বা এমনকি বাংলাদেশের

নাগরিকদেরকেও ব্যবহার করতে পারে–স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালিন এমন ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালিকে এ বিষয়ে একবারে অসচেতন মনে হয়েছিল। তাদের একমাত্র ভাবনা ছিল অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়ে- এবং সেটাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিয়েই ভাবা হচ্ছিল। এই জাতীয়তাবাদ ছিল 'আমি, আমার' কেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের চিকিৎসা দিয়েছেন এমন একজন নারী চিকিৎসক এ বিষয়ে সঠিক অনুধাবন করেছিলেন। তিনি বলেন, "আমাদের সকল বিদেশীকে বের করে দেয়া উচিৎ। অথচ আমরা সবাইকেই উল্টো আমন্ত্রণ জানিয়ে ভেতরে আসতে দিচ্ছি। যে সমস্ত দেশ এখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি সেসব দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া উচিৎ হবেনা।" তখন একজন বন্ধু তাকে বলেন, "তাহলে তো অধিকাংশ দেশের নাগরিকদের এদেশে ঢুকতে দেয়া যাবেনা।" জবাবে ঐ নারী চিকিৎসক বলেন, "তাতে কি আসে যায়। তাদের জানা উচিৎ আমাদেরও জাতীয় অহঙ্কার রয়েছে। যে সব দেশ সরাসরি আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে আমরা সেসব দেশের নাগরিকদেরও এখানে আসার অনুমতি দিচ্ছি। তারা মুক্তভাবে এদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের গতিবিধির উপর কে নজর রাখছে? আমাদের রাজনৈতিক অগ্রাধিকারগুলো ঠিক করার এখনই সঠিক সময়, আগামীকাল হয়তো অনেক দেরী হয়ে যাবে। আমরা নিজেদেরকে বিপ্লবী সরকার বলে দাবি করি, সেক্ষেত্রে আমাদের সবার এক হয়ে কাজ করা উচিৎ।"

কিছু কিছু মুক্তিযোদ্ধার ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ গভীর দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দেখা দিয়েছিল, এদের অনেকেরই কোন রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা ছিল না এবং তারা ক্রমেই প্রতিরোধমুখী হয়ে উঠছিলেন।

মুক্তিবাহিনীতে নানা রকম বিভাজন ছিল এবং এই বিভাজন তীব্র ছিল। এদের মধ্যে অনেকগুলো গোষ্ঠী দাবি করতে থাকা তারা বিপ্লব সম্পন্ন হওয়ার আগে পর্যন্ত ক্ষান্ত হবে না। মুক্তিবাহিনীর সামনের সারির সদস্যরা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন কারণ দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা কোন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাননি। নিজেদের এলিট সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে তারা তাদের নিজেদের নাম রেখেছিলেন 'দি মিশন'। তারা বলেছিলেন যতক্ষণ মুজিব ফিরে না আসবেন ততক্ষণ মুক্তিযুদ্ধ চলমান এবং ততক্ষণ তারা নিজেদের অস্ত্র সংবরণ করবেন না। কিন্তু শুধু তারাই মুজিবের প্রত্যাবর্তনের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন না।

তখন অনেক বালকও মুক্তিযোদ্ধা সেজেছিল। তারা বিজয়ের দিন ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে তৈরি হয়েছিল এবং তারা নিজেদেরকে ১৬তম ডিভিশন হিসেবে পরিচয় দিত। এদের সংখ্যা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের চেয়ে বেশি ছিল এবং প্রকৃত আর নকল মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের সবার কাছেই অস্ত্র ছিল।

ইতিমধ্যেই রাজাকার এবং আল-বদর দলের সদস্যদের মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মবেশে গ্রামাঞ্চলে লুটপাট চালানোর খবর পাওয়া যাচ্ছিল। পাকিস্তান সেনাবাহিনী যারা তাদের সহায়তা করেছিল তাদের প্রচুর অস্ত্র সরবরাহ করেছিল, কিন্তু যখন দেশের সর্বস্তরের মানুষ রাজাকার আর আল-বদর বাহিনীর বিপক্ষে ছিল তখন তারা লুটপাট চালানোর সাহস কোথায় পেল?

নিশ্চয়ই কোথাও কোন বিরাট ভুল হয়েছিল।

চীনে রেড আর্মি তাদের লংমার্চের সময় জন সমর্থন পেয়েছিল কারণ এ সময় যেসব দস্যু গ্রামাঞ্চলে লুটপাট চালাচ্ছিল তাদের দমনে রেড আর্মি গ্রামের মানুষদের সহায়তা করেছিল। কাস্ত্রোর বাহিনী হাভানার দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় যারা এ বাহিনীর নামে লুটপাট চালাচ্ছিল তাদের সাথে লড়াই করেছিল।

একজন বাঙালী ঔপন্যাসিক তার লেখায় বলেন, "আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম একবার যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পর এই সব তরুণেরা আবার পশ্চাদপটে চলে যাবে। কিন্তু তারা আমাদের নির্দেশ মান্য করতে আগ্রহী ছিল না। এতে আমরা ক্ষিপ্ত হচ্ছি, কিন্তু তার আগে আমাদের ভাবা উচিৎ এসব তরুণ যোদ্ধাদের কার্যক্রমের জন্য কি আমরাই দায়ী কি না। তাদের সামনে আমরা কি লক্ষ্য রাখতে পেরেছি? তারা ভেবেছিল তারা সমাজ বদলে দেবে। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা, এসব তরুণের সামনে তাদের নিজেদের সময়ের সমাজ বদলে দেবার কি এমন সুযোগ রয়েছে? তারা নিজেরা ছাড়া তাদের আর কিছুই নেই, আর তাদের হতাশা প্রশমিত করার একমাত্র পথ হল সংঘাত এবং এই এক ধরণের কাজই এই পরিস্থিতিতে তাদের করার আছে।

ভারতীয় সেনারা দুই তিনজনের ছোট দলে ভাগ হয়ে মুক্তভাবেই ঢাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রথম দিকে ভিন্ন ভাষায় কথা বলা এসব সৈনিকদের বিষয়ে মানুষের আগ্রহ থাকলেও, তারা এতোটাই কম কৌতুহলোদ্দীপক ছিল যে খুব দ্রুতই মানুষ তাদের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

১৯৫৮ এর ১ অক্টোবর পাকিস্তানে সেনা শাসন কায়েমের পর থেকেই সেনা বাহিনী সেদেশের সম্ভ্রান্ত শাসক গোষ্ঠীর অংশ হিসেবে ছিল। এমন কি পরাজয়ের পরও এসব সেনা কর্মকর্তাদের আচরণ ছিল অহমিকাপূর্ণ। অন্যদিকে তাদের তুলনায় ভারতীয় সেনা সদস্যরা ছিল খুবই বন্ধু বৎসল।

ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা এবং সৈনিকদের ব্যবহার এতোটাই ভাল ছিল যে তারা কিছু পশ্চিমা সংবাদ প্রতিনিধিরও প্রশংসা পায়। বিভিন্ন সামাজিক ক্লাবে ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা খুব ভদ্রভাবে বিনামূল্যে পানীয় পান করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন এবং সৈনিকেরা উপহার বা এমন কি বিনামূল্যে যান বাহনে চড়ার প্রস্তাবও গ্রহণ করতেন না।

ভারতীয় বাহিনীকে ধীরে ধীরে বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল।

লন্ডন টাইমস নামের একটি পাক্ষিকে পিটার হ্যাজেলহার্স্ট লিখেন, "জন প্রশাসনে নাক গলানো হয়েছে সামান্য বা একদমই নয়...। জনগণ সানন্দে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের উদ্ধারকারী হিসেবে গ্রহণ করেছে, আর ভারতীয় সেনা সদস্যরা তাদের উপর কড়া নির্দেশ থাকার কারণে প্রতিটি কোণায় বিনামূল্যে পাওয়া উপহার সামগ্রী প্রত্যাখ্যান করে যাচ্ছে।" তিনি আরও লিখেন, "...নয় মাস ধরে পাকিস্তানি সেনা বাহিনীকে দেখার পর বাঙালীরা প্রকাশ্যে ভারতীয় বাহিনীর পেশাদারী সংস্কৃতি আর তাদের দক্ষতার প্রশংসা করছেন।"

তারপরও ইতিমধ্যেই কিছু দাগ পড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সেনারা প্রশংসনীয়ভাবে যে কোন ধরণের প্রতিশোধমূলক তৎপরতা ঠেকানোর 'চমৎকার কাজটি করেছিল। কিন্তু মুজিব বাহিনী মনে করছিল ভারতীয় সেনারা বিহারীদের বাঁচাতে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি উদ্যোগ নিয়েছিল।

ভাষা একটি শক্তিশালী বন্ধন। মোহাম্মদপুর এবং মিরপুরে বিহারী কলোনীগুলো পাহারা দেয়ার সময় বিহারীদের মুখে তাদের নিজেদের ভাষা শুনতে পেয়ে ভারতীয় সেনা সদস্যরা বিহারীদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। অনেক বিহারীই ভারতীয় সেনাদের সাথে সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো ভারতীয় সেনা এবং বিহারীদের মধ্যে মাত্রাতিরিক্ত সৌহার্দ্য প্রদর্শিত হয়েছিল। কিন্তু যে বিদ্বেষের থেকে মুজিব বাহিনীর ভারতীয় সেনাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে নাক না গলানোর পরামর্শ দেয়ার কারণটি ছিল আরও গভীর। প্রতিটি মুক্তিযুদ্ধেই 'দখল করার স্বপ্ন' থাকে, ব্যর্থ হলে যেমন দণ্ডের ব্যবস্থা থাকে তেমন সাফল্য পেলে থাকে পুরস্কারের ব্যবস্থা, এবং প্রতিশোধের সুযোগ হল এসব পুরস্কারের মধ্যে অন্যতম।

একজন ভারতীয় জেনারেল যিনি তার বাঙালী প্রাক্তন সহযোদ্ধাদের মধ্যে এই বিদ্বেষ সম্পর্কে অবগত ছিলেন তিনি দেশ স্বাধীন হওয়ার পনেরো দিনের মধ্যে ভারতীয় বাহিনীকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ ধরণের সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য একজন জেনারেলের পদ অতোটা বড় ছিল না, তারপরও যেহেতু ঐ জেনারেল তখন মাঠ পর্যায়ে যেখানে সব ঘটছে সেখানে ছিলেন, তাই তার মতকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে।

১৯৭১ এর ১৬ ডিসেম্বর যখন পাক বাহিনী ঢাকায় যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করছে তখন জেড. এ. ভুট্টো ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। পাকিস্তানে থাকা তার শুভাকাঙ্ক্ষীরা চাইছিলেন তিনি যেন দ্রুত দেশে ফিরে আসেন, কিন্তু তিনি জানতেন মার্কিন সমর্থন ছাড়া তার পক্ষে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হওয়া সম্ভব নয়। পাকিস্তানে ফিরে আসার আগে ১৮ ডিসেম্বরে তিনি মার্কিন রাষ্ট্রপতি নিক্সনের সাথে একান্ত সাক্ষাৎ করেন।

১৯৬৯ সালের মার্চে সারা পাকিস্তানে আইয়ুব খান বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলন যখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে তখন তার পক্ষে আর রাষ্ট্রপতির পদ ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, তখন তিনি সে সময়কার পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনী প্রধান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা দিয়ে পদত্যাগ করেন । আইয়ুব ২৪ মার্চ ১৯৬৯ এ ইয়াহিয়াকে লেখা চিঠিতে বলেন 'পাকিস্তানের সেনা বাহিনী যা এই মুহূর্তে একমাত্র কার্যকর ও আইনসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান যা দেশের সকল বিষয়কে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারে, সেই বাহিনীর কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে পদত্যাগ করা' ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। তিনি ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করেন যেন ইয়াহিয়া শুধু বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশ রক্ষা নয়, পাশাপাশি দেশের ভেতরের অস্থিতিশীল অবস্থা থেকেও দেশকে বাঁচিয়ে তার 'আইনি ও সাংবিধানিক দায়িত্ব' পালন করেন।

এগারো বছর ধরে বিনা বাধায় দেশ শাসন করেছেন এমন একজন সেনা শাসকের পক্ষ থেকে এটি ছিল একটি ব্যর্থতার স্বীকারোক্তিমূলক পত্র। তারপরও তিনি আশা করছিলেন যা তিনি নিজে পারেন নি তা আরেকজন জেনারেল পারবেন।

পাকিস্তানের একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ জি. ডাব্লিউ. চৌধুরী বলেছিলেন যে আইয়ুব খান তার আসন ইয়াহিয়া খানের জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু স্বয়ং আইয়ুব যে সংবিধানের প্রবক্তা ছিলেন, সেই সংবিধানে রাষ্ট্রপতির অন্য কারও জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়ানোর কোন সুযোগ ছিল না, রাষ্ট্রপতিকে তার অক্ষমতার কারণে অভিশংসিত করা বা তাকে সরিয়ে দেয়ার সুযোগ সেখানে থাকলেও কোন ক্রমেই রাষ্ট্রপতিকে অন্য আরেকজনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে দাঁড়ানোর সুযোগ রাখা ছিল না । এর পাশাপাশি 'দেশের অভ্যন্তরের বিশৃঙ্খলা আর দাঙ্গা ঠোকনো'র দায়িত্বও সংবিধানে দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের উপর অর্পণ করার কথা লেখা ছিল না।

আইয়ুব খান দেশে সেনা শাসন কায়েম করতে চেয়েছিলেন। সেনাবাহিনীও সেনা শাসন কায়েমে আগ্রহী ছিল, তবে তারা আইয়ুব খানকে বাদ দিয়ে সেনা শাসন কায়েম করতে চাইছিল। ইয়াহিয়া খানের নিজেরই উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল এবং তিনিই আইয়ুব খানকে জোর করে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিলেন, ঠিক যে পদ্ধতিতে আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭ অক্টোবরে ইস্কান্দার মির্জাকে সরিয়ে গদিতে বসেছিলেন। জেনারেল জিয়াউল হকের ভাষায় পাকিস্তানের রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের সংস্কৃতি অব্যাহত ছিল।

পরে কোন এক সময় ইয়াহিয়া খান সৎ স্বীকারোক্তি দিয়ে বলেছিলেন, "জনগণ আমাকে ক্ষমতায় বসায়নি, আমি নিজেই ক্ষমতায় এসেছি।"

জনগণের কাছে তার কোন জবাবদিহিতা ছিল না। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর থেকে জনগণ নয় বরং পাকিস্তানি জেনারেলরাই দেশটির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলেন।

দ্বিতীয় দফায় আসা সেনা শাসন দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠতে থাকা গণ আন্দোলন দমন করতে সমর্থ হয়। সরকার তখন এমন কি গণতন্ত্রের ভেক ধরে থাকাও বন্ধ করে দেয়, এবং আইয়ুব খানের শেষ সময়ে সেনা বাহিনী যতটা ক্ষমতার অধিকারী ছিল তাদের ক্ষমতা তার চেয়ে বেড়ে যায়।

পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) দ্বিতীয় দফা সেনা শাসন কায়েম হওয়ার প্রথম থেকেই এর বিরুদ্ধে জনতা সোচ্চার হয়ে ওঠে। পূর্ব বাংলার বন্দর নগরী চট্টগ্রামে শ্রমিকরা ধর্মঘট শুরু করে, উত্তর বঙ্গে কৃষকরা মিছিল বের করে এবং পুলিশ স্টেশনগুলোতে হামলা চালায়। ঢাকা সহ পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদী দেয়াল লিখন দেখা যেতে থাকে। এরকমই একটি দেয়াল লিখনে লেখা ছিল, "আমরা বাংলায় দ্বিতীয় দফা পাঞ্জাবী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে।"

পাকিস্তানে ক্ষমতার পালাবদল নিয়ে ইকোনমিস্ট পত্রিকায় লেখা একটি সম্পাদকীয়'র শিরোনামটি বেশ মজার ছিল, "টুইডল খান ক্ষমতা দখল করেছেন।"

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ উইনস্টন চার্চিলের হাস্যকর অনুকরণ করে আইয়ুব খান বলেছিলেন, "আমি আমার দেশের ধ্বংস দেখতে চাই না।" দেশ ধ্বংসের যে অপকর্ম তিনি নিজে শুরু করেছিলেন তার অবশিষ্ট দায়িত্বটুকু তিনি তার অনুসারীর জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

ঢাকায় পাকিস্তানিদের লজ্জাজনক হারের পর, ইয়াহিয়া খানকে পদত্যাগ করতেই হত, কিন্তু ঠিক সাথে সাথেই আরেকজন জেনারেলের দেশ শাসনের দায়িত্ব নেয়া সম্ভব ছিল না। জেনারেলরা দেশ শাসনের জন্য ভুট্টোকে বাছাই করেছিলেন। ভুট্টোর যেমন সেনা বাহিনীর সমর্থন দরকার ছিল, তেমনি সেনা বাহিনীরও অন্তত তখনকার মত ভুট্টোকে প্রয়োজন ছিল।

ইয়াহিয়া খানের পরিবর্তে ভুট্টোর দায়িত্ব গ্রহণ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে ওয়াশিংটন ডেইলি নিউজে লেখা হয়, "সবকিছুতে ভজঘট পাকিয়ে ফেলেন এমন একজন ব্যক্তির পরিবর্তে একজন সুযোগ সন্ধানী লোককে পাওয়া গেছে।"

নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় পাকিস্তানের পরিণতির জন্য ভুট্টোকে দায়ী করা হয়, "কিন্তু" এর পাশাপাশি বলা হয়, "তার দ্রুত পক্ষ পরিবর্তন করার ক্ষমতা পাকিস্তানের নতুন প্রেসিডেন্ট এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের সেবায় কাজে আসতে পারে।"

ক্ষমতা ও ভণ্ডামী

তাজউদ্দীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মার্কিন সরকারের ভূমিকা নিয়ে অত্যন্ত বিতশ্রদ্ধ ছিলেন, তিনি ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ বলেন মার্কিন সপ্তম নৌ বহর নিশ্চয়ই মাছ ধরার জন্য বঙ্গোপসাগরে আসেনি।

ওয়াল স্ট্রীট জার্নালের মতে বঙ্গোপসাগরে পরমাণু শক্তি চালিত উড়োজাহাজ পাঠানোটা ছিল 'প্রাচীণপন্থী ও অদূরদর্শী' চিন্তার ফল। শুধু মার্কিন নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনার জন্যই এটি করা হয়েছিল কি না এ বিষয়ে ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল সন্দেহ প্রকাশ করে।

মাত্র কয়েকশো মার্কিন নাগরিককে সরিয়ে নেয়ার জন্য একটি আস্ত নৌ বহর পাঠানো হয়েছিল? যাই বলা হোক না কেন যে সব বিদেশী নাগরিক ঢাকা ত্যাগ করতে চেয়েছিলেন তারা সবাই ১১ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যেই ঢাকা ত্যাগ করেছিলেন।

ঐ পত্রিকায় বলা হয়, "সাধারণত এ ধরণের সিদ্ধান্তের পেছনে যে কারণ দেখানো হয়ে থাকে তা হলো, যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি 'পরাশক্তি' সেহেতু যখনই কোথাও গোলযোগ দেখা দেয় সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রদর্শন করা উচিৎ যাতে করে সংকট সমাধানের জন্য যে সিদ্ধান্তে পৌছানো হয় সেটিতে মার্কিন প্রভাব থাকে।" এখানে শুধুই পতাকা দেখানোর জন্য নৌ বহর পাঠানো হয়নি।

১৯৬৫ সালের এপ্রিলে মার্কিন মেরিন সেনারা ডমিনিকান রিপাবলিকে অবতরণ করেছিল, জ্যাক এন্ডারসেনের ভাষায় 'মার্কিন নাগরিকদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার নামে সেখানে আসলে মেরিন সেনারা যেসব বিদ্রোহীরা নির্বাচিত সরকারকে পুনর্বাসিত করতে লড়াই করছিলেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো।'

যে মার্কিন টাস্ক ফোর্স বঙ্গোপসাগরে মোতায়েন করা হয়েছিল তার নামকরণ করা হয়েছিল ভয়ঙ্কর ইঙ্গিতপূর্ণভাবে, "ওহ, কোলকাতা!"

আন্দ্রে মারলাউ মার্কিন রাষ্ট্রপতির কাছে লেখা খোলা চিঠিতে লিখেছিলেন, "যদি আপনার বিমানবাহী রণতরীর পক্ষে কোলকাতায় আক্রমণ করা সম্ভব হত, তারপরও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কখনোই মৃত্যুর মিছিলে থাকা জনতার সাথে লড়াইয়ে যুক্ত হতো না। এবং যখন পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবহিনী, অর্থাৎ আপনার দেশের সেনাবাহিনী ভিয়েতনামের নগ্নপদ যোদ্ধাদেরকে হারাতে পারেনি, তখন আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের দেশ থেকে ১২০০ মাইল দূরের একটি দেশ যা স্বাধীনতার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ছিল সেই দেশটি পুনর্দখল করতে সক্ষম হতো?"

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় বাংলাদেশে যে মানবিক বিপর্যয় ঘটেছিল তার তীব্রতা এতো বেশি যে, সি. এল. সুলজারবার্গের ভাষায় তা 'মানুষের সমবেদনা পরিমাপকারি ডলরিমিটারের সীমা' অতিক্রম করে গিয়েছিল। তবুও মার্কিণ নীতি নির্ধারকরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি।

অথচ ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর যখন মুক্তিযুদ্ধ খুব দ্রুত বেগে একটি পরিণতির দিকে যাচ্ছিল তখন কিসিঞ্জার পূর্ব বাংলায় অবস্থানকারি ১.৪ মিলিয়ন বিহারীর ভাগ্য নিয়ে এতোটাই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাদের বাঁচাতে 'একটি আন্তর্জাতিক মানবিক উদ্যোগ' নেয়ার পরামর্শ দেন। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে 'ব্যাপক রক্তপাত ঠেকাতে' একটি অভিযান শুরু করতে চেয়েছিলেন।

ঐ একই বৈঠকে জনসন এলেক্সিস বলেছিলেন, যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য একটি 'তলা বিহীন ঝুড়ি' হিসেবে দেখা দিবে। জবাবে কিসিঞ্জার নাকচ করে দিয়ে বলেন, "ঐ তলা বিহীন ঝুড়ির দায়িত্ব আমাদেরই নিতে হবে এমন নয়।"

কিসিঞ্জারের মানবিকতা বাঙালীর জন্য জেগে ওঠেনি। তার দরদ ছিল শুধু বিহারীদের জন্য যারা তার মতে ছিল ভালো পাকিস্তানি।

১৫ এপ্রিল জাকার্তা টাইমস এ লেখা হয়: "রাজনীতিক, চিন্তাবিদ, ছাত্র, চিকিৎসক, শিক্ষক এবং নারী ও শিশু সহ নিরস্ত্র মানুষজনকে পূর্ব পাকিস্তানে হত্যা করা হচ্ছে। সারা মুসলিম বিশ্ব কি এ কষ্ট ভোগ করবে? ইসলাম কি সশস্ত্র মুসলিমদের দ্বারা নিরস্ত্র মুসলিম নিধন অনুমোদন করে? ইসলামী আদর্শের দ্বারা কি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সংখ্যা গরিষ্ঠের দাবি সংখ্যালঘুদের দ্বারা দমন করা বৈধ করা যায়?"

মুসলিম বিশ্ব এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি; তারা কোন ধরণের প্রতিক্রিয়াই তখন পর্যন্ত দেখায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তেহরানের পত্রিকা কাহয়ান হঠাৎ বুঝতে পেরেছিল যে পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ মুসলিম বাংলাদেশে বসবাস করে। তবে অবশ্যই তারা বাংলাদেশে বসবাসকারি অবাঙালি মুসলমানদের নিয়েই ভাবিত ছিল।

১৯৭২ এর ১৫ মার্চ কাহয়ান পত্রিকা জেদ্দা কনফারেন্সের মাধ্যমে যে মীমাংসা মিশন নেয়া হয়েছিল তার আওতায় দ্রুত কাজ শুরু করে 'এ অঞ্চলে ভ্রাতৃহত্যা বন্ধের উদ্যোগ' এবং 'ঢাকা ও ইসলামাবাদের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের সূচনার উদ্যোগ' গ্রহণ করা উচিৎ বলে মন্তব্য করে।

যখন পূর্ব পাকিস্তানে পুরুষদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হচ্ছিল এবং নারীদের সম্ভ্রমহানি করা হচ্ছিল তখন তা ছিল সম্পূর্ণ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। কিন্তু যখনই বিহারী মুসলিমদের বিপদের সম্ভাবনা দেখা দিল তখনই ভ্রাতৃহত্যার কথা উঠল।

এটি ছিল সবচেয়ে জঘন্য দ্বি-মুখী নীতি।

তেহরানের এই পত্রিকাটি মুজিব বিষয়ে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে আরেকটু উদার হতে দাবি করছিল। তাদের মতে মুসলিম বিশ্ব যদি মুজিবকে সম্পূর্ণ বয়কট করে তাহলে, মুজিব আরও বেশি করে 'ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন, যে ভারত খুব সহজে মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়াবেনা।'

১৯ মার্চ ১৯৭২ এ-টুঙ্কু আবদুর রহমান মুজিবের কাছে 'আল্লাহ'র নামে' ফরিয়াদ জানান যেন মুজিব তার ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে বাংলাদেশের অবাঙালী মুসলিমদের রক্ষা করেন। তিনি অবাঙালী মুসলিমদের উপর যে নির্যাতন চালানো হয়েছে সে বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ছয় জাতির একটি প্রতিনিধি দলকে ঢাকায় আসার অনুমতি দেয়ার জন্য আবেদন করেন। ঐ প্রতিনিধি দলটিকে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে বঙ্গবন্ধু বলেন, "অত্যন্ত দুঃখের সাথে স্মরণ করতে হচ্ছে যে গত নয় মাসে যখন পাকিস্তানিরা ঠাণ্ডা মাথায় ত্রিশ লক্ষ বাঙালীকে হত্যা করে, তখন আপনারা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলামন রাষ্ট্রে নির্যাতিত নিরপরাধ মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের রক্ষার্থে কোন উদ্যোগ নেননি।" জবাবে টেঙ্কু আব্দুল রহমান জানান যে সে সময় পাকিস্তানিরা যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তা সম্পর্কে তাকে কিছু জানানো হয়নি।

সারা পৃথিবী যা জানতো তা তাকে আলাদা করে জানানো প্রয়োজন ছিল কি?

বাংলাদেশে দেশ বিভাগের সময় আসা শরণার্থীদের সিংহভাগ ভারতের বিহার থেকে এলেও, উর্দুভাষী শরণার্থী তা সে ভারতের যে অংশ থেকেই আসুক না কেন তাদের বাঙালীরা বিহারী হিসেবে চিহ্নিত করত। তাদের মধ্যে বেশিরভাগই ভয়ঙ্কর রকম ভারত বিদ্বেষী ছিলেন এবং পাকিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেতেন। তারা ছিলেন তুলনামূলকভাবে বেশি সুযোগ সুবিধাভোগকারি সংখ্যালঘু, এদেশে আসার পর তাদের উন্নতি হয়েছিল- তবে অবশ্যই তাদের সবার উন্নতি হয়নি। কিন্তু গড় পরতা সম্পদের অধিকারি বিহারীদেরকেও 'পাকিস্তানি প্রভুত্বের স্থানীয় প্রতীক' হিসেবে বিবেচনা করা হত, এমন কি ঢাকার উপর পাকিস্তানি বাহিনীর ভয়ঙ্কর আক্রমণের আগে থেকেই। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালিন অনেক বিহারীই পাক বাহিনীর তথ্য সরবরাহকারি হিসেবে কাজ করেছিল বা লন্ডন টাইমসে যেভাবে লেখা হয়েছিল, বিহারিরা "পাক বাহিনীর লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞে তাদের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তারা বৃহৎ সংখ্যায় 'রাজাকার' হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছিল, এই বাহিনীটি ছিল এক ধরণের অনুগত স্থানীয় বাহিনীর মত..."। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অপকর্মের সাথে বিহারীরা এত ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল যে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে যুদ্ধ শেষে তাদের উপর প্রতিশোধমূলক হামলা হতে পারে। স্বাধীনতার পর কিছু বিহারীকে হত্যা করা হয়, কিন্তু একইভাবে কিছু বাঙালী যারা

পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিল তাদেরও হত্যা করা হয়েছিল। ৯ মার্চ ১৯৭৩ এ লন্ডন টাইমস পত্রিকায় লেখা হয়, "এটা সবাইকেই অবাক করেছিল যখন ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিহারী জনগোষ্ঠীর ওপর কোন প্রতিশোধমূলক ব্যাপক হামলা হয়নি।"

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে একজন বাঙালী ঔপন্যাসিক বলেছিলেন, "এদেশে বিহারীরা আলজেরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশকারিদের মত- আসলে তার চেয়েও নিকৃষ্ট। তারা পূর্ব পাকিস্তানে বসবাস করে, কিন্তু সব সময় তাকিয়ে থাকে পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে। তারা নিজেদেরকে বাঙালীর চেয়ে উন্নততর মনে করে, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাদের কে অবজ্ঞা করে। তারা শাসক সামরিক জান্তার হাতের গুটি মাত্র, এই বোকারা বুঝতে পারেনা তারা ক্রমাগত ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং তাদের উপযোগিতা শেষ হয়ে গেলে তাদেরকে ছুড়ে ফেলা হবে। তাদের হয়তো আবার অভিবাসন করতে হবে, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান কখনো তাদের গ্রহণ করবে না।"

বিহারীরা পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ছিল এবং তারা বাংলাদেশের জন্য হুমকি স্বরূপ ছিল। তারপরও তাদের মধ্যে যারা বাংলাদেশে থেকে যেতে চেয়েছিল তাদের বাংলাদেশ সরকার গ্রহণ করে নিয়েছিল, এমন কি মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে তাদের ভূমিকা কি ছিল তা নিয়ে তাদের কোন প্রশ্নের মুখেও পড়তে হয়নি। এ বিষয়ে সন্দেহ ছিল এক প্রজন্ম পরেও এসব বিহারী বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাথে মানিয়ে নিতে পারবে কি না, কিন্তু তারপরও মুজিব তাদেরকে একটি মানবিক সমস্যা হিসেবে দেখেছিলেন এবং ভেবেছিলেন তিনি তাদের মন জিতে নিতে পারবেন।

কিছু কিছু পাকিস্তানি পত্রিকা বিহারীদের 'সত্যিকারের পাকিস্তানি' বলছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকার যে সব বিহারী পাকিস্তানে যেতে চেয়েছিল তার একটি খুব ক্ষুদ্র অংশকেই শুধু সে দেশে নিয়ে যেতে রাজি ছিল। লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকার সাংবাদিক পিটার প্রেস্টনকে ১৯৭২-এর ১ মার্চ ভুট্টো বলেছিলেন, "আহা হতভাগ্য বিহারীরা! তারা এ নিয়ে দুবার তাদের জন্য প্রতিশ্রুত ভূমিতে স্থানান্তরিত হয়েছেন। একবার দেশ বিভাগের সময়। এখন তারা স্বপ্ন দেখছেন পাকিস্তানে আসার। পশ্চিম পাকিস্তানে জাতীয়তা নিয়ে আমাদের নানা রকম সমস্যা রয়েছে এবং আমরা আমাদের নিজেদের দেশের মানুষের কাছেও অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছি।"

আহা হতভাগা বিহারী!

তাদের 'প্রতিশ্রুত ভূমি' তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিল। দেশ বিভাগের সবচেয়ে বড় বোকা ছিল এই বিহারীরাই।

১৯৭২ এর ১০ জানুয়ারির সাংবাদিক সম্মেলনে নিক্সন প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন, ঐ দিনই শেখ মুজিব দেশে ফেরত আসেন, সেদিন সংবাদ সম্মেলনে নিক্সন উদাত্ত কণ্ঠে বলেন, "আমরা এক নূতন সম্পর্ক গড়ে তুলতে যাচ্ছি যা হবে ভারত-মুখি, বাংলাদেশ-মুখি, পাকিস্তান-মুখি এবং সর্বপোরি শান্তি-মুখি।" তিনি আরও বলেন, "আমাকে ভারত বিরোধি বলা হলেও আমি মনে করি আমি যুদ্ধ বিরোধি। অবশ্যই আমাদের পক্ষ থেকে ভুল হয়েছে, কিন্তু আমাদের নীতির উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধ ঠেকানো, যখন যুদ্ধ চলমান ছিল তখন আমাদের পক্ষে যা কিছু সম্ভব ছিল আমরা করেছি এবং এখন যুদ্ধের শেষে আমরা যুদ্ধের ক্ষত সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছি।"

শান্তিকামী এবং যুদ্ধের ক্ষত সারানো নিয়ে অতি উদ্বিগ্ন নিক্সন মার্কিন কংগ্রেসের কাছে একটি রিপোর্টে নিশ্চিত করেন যে, "আমরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে নিশ্চয়তা পেয়েছি যে পাকিস্তানিরা মুজিবকে হত্যা করবে না।" তিনি বিস্তারিত কিছুই জানাননি। সে সময় ইসলামাবাদে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালনকারি জোসেফ ফারল্যান্ড ইতিহাসের পাতায় তার জায়গা হবে বলে দাবি করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "যখন ইতিহাস লেখা হবে তখন সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এবং তাদের আঞ্চলিক পর্যায়ের উদ্যোগের ফলেই যে মুজিবের জীবন রক্ষা পেয়েছিল তা উল্লিখিত থাকবে।"

মার্কিনরা মুজিবের জীবিত থাকার জন্য কৃতিত্বের দাবি করছিল, কিন্তু মুজিবের অক্ষত অবস্থায় ঢাকায় ফেরাটা তাদের অহমিকায় আঘাত করেছিল। মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে হেনরি কিসিঞ্জারের সহযোগী হিসেবে কাজ করা রজার মারসের মতে, মুজিবের ঢাকায় ফিরে বীরের সংবর্ধনা পাওয়াটা 'সম্ভবত ক্যাস্ত্রো একটি ট্যাঙ্কে চড়ে হাভানা প্রবেশ করার পর মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির জন্য সবচেয়ে অপমানকর মুহূর্ত।'

কিসিঞ্জারের 'বিদেশি শত্রু'র তালিকায় আলেন্দে, থিউ এবং মুজিব এই তিন জন ছিলেন তার সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি।

সালভাদার আলেন্দে চিলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগে ও পরে তার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করার যে অভিযান মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা (সিআইএ) চালিয়েছিল তার মূল পরিকল্পনাকারি ছিলেন কিসিঞ্জার। মার্কিন সিনেটের গোয়েন্দা তৎপরতা সংক্রান্ত কমিটির একটি রিপোর্টে বলা হয় সিআইএ ১৯৬৩ থেকে ১৯৭৩ এই সময় কালের মধ্যে চিলিতে আলেন্দে বিরোধী অপপ্রচার চালানোর জন্য ১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করেছে। আলেন্দে বিরোধী এই অভিযানের অংশ হিসেবে ১৯৭০ সালে আলেন্দে যেন রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করতে না পারেন সে জন্য একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর চেষ্টাও ছিল।

কিসিঞ্জারের ৪০ টি কমিটি এবং সিআইএ যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়েও আলেন্দের রাষ্ট্রপতি হওয়া ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, কিন্তু তারা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে 'যার ফলে চিলির উপর অর্থনৈতিক চাপ দেয়া হয় এই আশায় যা ভবিষ্যতে আরেকটি অভ্যুত্থানের পথ সুগম করবে।'

৮৭ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে চিলির বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে সমর্থন দেয়ার যে কর্মসূচি নেয়া হয়েছিল সেটির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক উৎস থেকে ঋণের সরবরাহ কমে যাওয়া এবং চিলির কপার খনিগুলোতে ধর্মঘটের ফলে দেশটির অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়ে।

১৯৭০ সালে আলেন্দের ক্ষমতায় যাওয়া ঠেকানো যায়নি, কিন্তু ১৯৭৩ সালে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়া গিয়েছিল।

কিসিঞ্জার মনে করতেন ছোট ছোট দেশগুলোর ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তার ছিল এবং তার পথে কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তিনি ধরে নিতেন তারা তার কাজকে কঠিন করে তুলছে। কিসিঞ্জারের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশ স্বাধীনতা পেয়েছিল। এটিকে তিনি নিজের ব্যক্তিগত পরাজয় হিসেবে দেখেছিলেন। মরিস বলেছিলেন যে 'কিসিঞ্জারের কূটনীতিতে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং সে কারণে প্রতিশোধও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ ছিল।' মুজিব সম্পর্কে কিসিঞ্জারের মূল্যায়ন ছিল যে 'মুজিব একজন গোঁয়ার প্রকৃতির রাজনৈতিক নেতা যিনি সমগ্র বিশ্ব নিয়ে কিসিঞ্জারের মহা পরিকল্পনা ভেস্তে দিচ্ছিলেন।'

নিক্সন তার নিজের স্বার্থ রক্ষায় যে কোন কিছু করার মত লোক ছিলেন। কিসিঞ্জার তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় এমন যে কাউকে বিনা দ্বিধায় হত্যা করতে পারতেন। তবে যাই হোক, ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের উপর মাত্রাতিরিক্ত মনযোগ দিলে তা ভুল দিক নির্দেশনা দিতে পারে।

মরিসের মতে বাংলাদেশ 'স্বাধীন হওয়াটা বিশ্বের ক্ষমতায় কোন বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসেনি এবং দীর্ঘ মেয়াদের বিবেচনায় বাংলাদেশের আবির্ভূত হওয়াটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য কোন কৌশলগত পরাজয়ও ছিল না।' কিন্তু ১৬ ডিসেম্বরে ১৯৭১-এ যখন ঢাকা স্বাধীন হল তখন মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাছে এমন মনে হয়নি।

১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বরে নিউইয়র্ক টাইমস ছাপে, "পূর্ব বাংলায় পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে সংকটে পড়েছে তা একই সঙ্গে মার্কিনীদের জন্যও একটি সেনা সংকট। শেষ মুহূর্তে হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে মস্কোকে তারা যেন ভারতকে নিবৃত্ত করে এমন বিফল সতর্কবার্তা পাঠানো বা বিমানবাহি রণতরী সমৃদ্ধ টাস্ক ফোর্সকে বঙ্গোপসাগরে পাঠানো–এসবের কোন কিছুই গণতান্ত্রিক বিশ্বের সামনে (এখানে বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছিল) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মান-মর্যাদা রক্ষার্থে এই দুর্যোগ লুকাতে বা দূরীভূত করতে কাজে আসেনি।

পত্রিকাটি আশঙ্কা প্রকাশ করে 'এই দুর্যোগের ফলে উন্নয়নশীল অন্যান্য দেশে প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বাধীনতার পক্ষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া সহায়তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে।'

স্বাধীন প্রতিষ্ঠান যেমন পাকিস্তানের সামরিক জান্তা?

যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে, তখন তাদের অন্যান্য অনুগত রাষ্ট্রগুলো কিসের ভিত্তিতে মার্কিন আশ্বাসের উপর ভরসা রাখবে?

পূর্ব পাকিস্তানে মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসেবে কর্মরত থাকা হারবার্ট স্পিভাক আশঙ্কা করছিলেন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর হয়তো এখানে মার্কিন কনসাল জেনারেলের পদটি অবৈধ হয়ে যাবে। ১৯৭১ সালের ৫ ডিসেম্বরে ওয়াশিংটনে পাঠানো এক তারবার্তায় তিনি লিখেন, "ঢাকা স্বাধীন বাংলাদেশের ভূ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এখানে দূতাবাসের কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কোন আইনি ভিত্তি থাকবে না এবং যে সমস্ত কর্মকর্তা এখানে থেকে যাবেন তাদের প্রতি জনতা ও সরাকরের দৃষ্টিভঙ্গি হবে বৈরি।"

যে সমস্ত মার্কিন কূটনীতিক ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন তাদের সৌভাগ্যক্রমে স্পিভাকের এই আশঙ্কা বাস্তবে রূপ নেয়নি। প্রায় সকল বাঙালীই নিক্সন প্রশাসনের উপর ক্ষুব্ধ ছিল, কিন্তু মার্কিন দূতাবাসের কর্মকর্তাদের তারা বাংলাদেশীর প্রতি সমব্যথী হিসেবেই জানতেন এবং দূতাবাসের লোকদের উপর তাদের কোন বিশেষ ক্ষোভ ছিল না।

১৯৭১ এর মার্চে পাক বাহিনী যখন নৃশংস হামলা চালায় তখন মার্কিন সরকার এ বিষয়ে নিশ্চুপ থাকায় এর প্রতিবাদ করে সে সময় মার্কিন দূতাবাসের কনসাল জেনারেল আর্চার কে.ব্লাড ওয়াশিংটনে একটি পিটিশন পাঠান।

জুন মাসে তাকে সরিয়ে দিয়ে স্পিভাককে দায়িত্ব দেয়া হয়। কিন্তু ব্লাড বাংলাদেশ ত্যাগ করার আগেই তিনি নিজে তৈরি করেছিলেন এমন একটি রিপোর্ট কনসাল জেনারেলের অফিসে কর্মরত একজন বাঙালী আরও তিন জন মার্কিন গবেষকের সহায়তায় বাইরে পাচার করতে পেরেছিলেন। এই রিপোর্টটির সাথে এর আগে গবেষকরা যেসব রিপোর্ট প্রস্তুত করেছিলেন সেগুলোর তেমন কোন পার্থক্য না থাকলেও, যেহেতু এর গায়ে 'অত্যন্ত গোপনীয়' কথাটি লেখা ছিল এবং যেহেতু এটি 'পাচার' করা হয়েছিল তাই এই রিপোর্টটি গুরুত্ব পায়।

এই রিপোর্টে বলা হয়, "দীর্ঘ মেয়াদে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভূত হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী মনে হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল তা ঘটার আগে কি পরিমাণ রক্তপাত ঘটবে। রাজনৈতিকভাবে এটা বোঝা যাচ্ছে যে স্বাধীনতা আসতে যত দেরী হবে ততোই মুক্তিযুদ্ধের নিয়ন্ত্রণ মধ্যমপন্থী আওয়ামী লীগের হাত থেকে আরও বেশি বামপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (যারা ১৯৭০-এর ডিসেম্বরের নির্বাচনে অংশ নেয়নি) কাছে চলে যাবে।"

সত্যি হলো ব্লাড চিনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)কে নিয়ে অপ্রয়োজনীয় দুশ্চিন্তা করছিলেন, এই ন্যাপ ১৯৭০-এর নির্বাচনে অংশ নেয়নি কারণ সে সময় বিচিত্রভাবে মার্কিন স্বার্থ এবং চীনের স্বার্থের সাথে পাকিস্তানের স্বার্থের অনেক খানিই মিলে গিয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালী নিধনের সময় পাকিস্তান, চীন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার মিত্রতা দেখে মার্কিন বিপ্লবী আই. এফ. স্টোন বলেছিলেন, "বিশ্ব বিচিত্র ধরণের সব মিত্রতা দেখেছে, কিন্তু এমন বিচিত্র এবং রক্তস্নাত মিত্রতা এর আগে দেখেনি।"

ব্লাডের সে রিপোর্টটি কৌতুককর মনে হয়েছে, "যে সামরিক শক্তি পাকিস্তানের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে সোভিয়েত ইউনিয়ন গত তিন বছরে তার প্রধান পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছে।" কিন্তু এর পাশাপাশি রিপোর্টে এও বলা হয়, "১৯৫১ সাল থেকে পাকিস্তান মার্কিন অর্থনৈতিক সহায়তার একজন প্রধান গ্রহিতা হিসেবে রয়েছে এবং ১৯৬৯ সাল নাগাদ এ অর্থ সাহায্যের পরিমাণ প্রায় ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।" রিপোর্টের তথ্য অনুসারে ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে পাকিস্তানকে দেয়া মার্কিন সামরিক সাহায্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১.৫ থেকে ২ বিলিয়ন ডলার। মার্কিন সরকার কি পাকিস্তানে গণতন্ত্রের স্বার্থে এই বিপুল পরিমাণ অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাঠিয়েছিল?

এই রিপোর্টটিতেই এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আছে, "পাকিস্তান যা এসইএটিও এবং সিইএনটিও এর প্রথম দিককার সদস্য ছিল, তাদেরকে মার্কিন সামরিক সাহায্য দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন পররাষ্ট্র নীতির ডুলস যুগে কম্যুনিস্টদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য যাতে এ সাহায্য ব্যয়িত হয়, কিন্তু ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে সীমান্তে সংক্ষিপ্ত যুদ্ধটি বাদে এসব উন্নত মানের অস্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়েছিল শুধু পূর্ব পাকিস্তানের নিরস্ত্র জনতার উপর।"

ব্লাড তার নোটে আরও লিখেছিলেন, "সোভিয়েত ইউনিয়ন আগেও বাঙালীর দাবী দাওয়ার বিষয়ে সংবেদনশীল ছিল না, এবং এখনও নতুন বাংলাদেশকে পরাশক্তিগুলোর প্রভাব বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হতে দিবে না।"

এই পর্যবেক্ষণটি পরবর্তী ঘটনাবলীর আলোকে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু যে সময়ে এই পর্যবেক্ষণটি দেয়া হয়েছিল তখনকার প্রেক্ষাপটে এটি যথোচিত ছিল। তখনো পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব বাংলার বিষয়ে বিশেষ কোন আগ্রহ দেখায়নি।

ব্লাড তার রিপোর্টে আরও লিখেছিলেন, "যে সব সরকার অসহায় মানুষের উপর অত্যাচার চালায় তাদেরকে মার্কিন অস্ত্র অবশ্যই সরবরাহ করা উচিৎ নয়।" দিল্লীতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কেনেথ কিটিংও মার্কিন সরকারের কাছে তাৎক্ষণিকভাবে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করতে অনুরোধ করেন।

নিক্সনের প্রতিক্রিয়া ছিল যেমনটি আশা করা যায় তেমনই। যেসব কূটনীতিক তাদের রিপোর্ট পাঠানোর পরিবর্তে 'পিটিশন' পাঠিয়েছিলেন তাদের উপর তিনি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তিনি কিটিংকে নিয়ে তামাশা করেছিলেন এবং ঢাকা থেকে ব্লাডের বদলির নির্দেশ দিয়েছিলেন।

নিক্সন তার 'সকল কর্মীদের জন্য নোট' এ বলেন: "এই মুহূর্তে ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবে না।"

ব্লাডের পরিবর্তে ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল হিসেবে নিয়োগ পাওয়া স্পিভাকের সঙ্গেও ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের মাঝে মাঝেই মতপার্থক্য হতো। স্পিভাক যেখানে ঘটনাগুলো ঘটছে সেখানে অবস্থান করছিলেন, কিন্তু ফারল্যান্ড ইসলামাবাদে থাকার কারণে ওয়াশিংটন গোটা বিশ্ব পরিস্থিতি কিভাবে দেখছে সে সম্পর্কে বেশি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগেছিল সে সময়টাতে ফারল্যান্ডের সাথে স্পিভাকের যে সর্বজন বিদিত মতদ্বৈততা ছিল তার কারণে স্পিভাকের বিশেষ সুবিধা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন ঢাকায় ফিরে আসেন তখন তাকে স্বাগত জানাতে স্পিভাক এয়ারপোর্টে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু এর দুদিন পর আবু সাইয়িদ চৌধুরী যখন রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন তখন স্পিভাক উপস্থিত ছিলেন না। তিনি বলেন তিনি এয়ারপোর্টে মুজিবকে দেখতে গিয়েছিলেন ব্যক্তিগত আগ্রহের কারণে।

ইতিমধ্যে ওয়াশিংটন থেকে মার্কিন কূটনীতিকদের বাংলাদেশ সরকারের সাথে যে কোন ধরণের যোগাযোগ করতে নিষেধ করা হয়।

সিনেটর এডলাই স্টিভেনসন ঢাকায় একটি সংক্ষিপ্ত সফর শেষ করে ৩১ জানুয়ারি ১৯৭১ এ বলেছিলেন যে পাকিস্তানিদের চালানো 'ধ্বংসযজ্ঞের তীব্রতা' এতো বেশি যে 'বিশ্বের ইতিহাসে এর কোন তুলনা পাওয়া যায় না।" তার মতে এটি ছিল, "বাঙালী সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্যে নেয়া পরিকল্পিত নীতি।"

১৯৭১ এ নয় মাসব্যাপী মার্কিন বিশেষজ্ঞরা পাক সেনাবাহিনীকে তাদের ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে সহায়তা করেছিলেন।

হিউ হাইটের নাম মেজর-জেনারেল রাও ফরমান আলীর সাথে জড়িয়ে ছিল। দৈনিক বাংলা নামের ঢাকার একটি দৈনিক ফরমান আলীর টেবিলে হিউ হাইটের নাম লেখা রয়েছে এমন একটি টেবিল ক্যালেন্ডারের ছবি ছাপার পর পর হাইট ঢাকা ত্যাগ করেন। ইউনাইটেড প্রেসের আর্নল্ড জেইটলিন বলেন, "ঐ ছবিটির সাথে হাইটের একটি সুনির্দিষ্ট জীবন বৃত্তান্ত ছাপা হয়েছিল যেটিতে সিআইএর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে বলে জানা গিয়েছিল।"

হাইট চলে গিয়েছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিদেশি এজেন্টরা নিশ্চয়ই ঢাকায় তাদের তৎপরতা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সরকারকে তাদের নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত মনে হয়নি।

যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখনো প্রকাশ্যে বাংলাদেশের বিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছিল, তবুও দুই একজন বাঙালী মার্কিন সরকারের নিমন্ত্রণে সেখানে সফরে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার হুমকি দিলেও, পরবর্তীতে তাদের কে কিছুই করা হয়নি। বাংলাদেশ সরকারের ভিতরেই তাদের ক্ষমতাধর শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

ডাও জোনস অর্থনীতি বিষয়ক সাপ্তাহিক ব্যারন'স এ ছাপা হয়, বাংলাদেশ, ঐ দেশটির নেতার কল্পনায় আর ভুল পথে চালিত জনমতেই শুধু একটি রাষ্ট্র।" ঐ সাপ্তাহিক পত্রিকাটির মতে বাংলাদেশ 'সোভিয়েত এবং চাইনিজ কম্যুনিজমের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধের জন্য বিদেশের মাটিতে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে' পরিণত হতে যাচ্ছিল।

১৯৭১-এর মার্চে এইসব মার্কিন সংবাদ প্রতিনিধিরাই পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র কম্যুনিস্টদের আনাগোনা দেখতে পাচ্ছিলেন। আইন ও সংসদীয় বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন জানিয়েছিলেন আওয়ামী লীগ বামপন্থী চাপ মোকাবেলা করার জন্য তরুণদের দলভুক্ত করছিল।

জেইটলিন তার প্রতিবেদনে কম্যুনিস্ট আর আওয়ামী লীগারদের মধ্যে দড়ি টানাটানির খেলা এবং মুজিব আর তাজউদ্দীনের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলছিল বলে উল্লেখ করেছিলেন। মস্কোপন্থী বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি এবং ন্যাশনার আওয়ামী পার্টি (মুজাফফর) আওয়ামী লীগকে সমর্থন জানিয়েছিল। চীনপন্থী কম্যুনিস্ট দলগুলো তখনো বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। তাজউদ্দীন মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এটা ভাবাটা ছিল বিরাট বোকামী। যদিও মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাজউদ্দীনের ভাবমূর্তি বেড়েছিল, তারপরও মুজিবের স্থান তারচেয়েও অনেক উর্ধ্বে ছিল। আওয়ামী লীগের ভেতরেই তাজউদ্দীনের অনেক শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল, যারা তার উপর প্রতিশোধ নিতে মরিয়া ছিল।

যাই হোক এ ধরণের প্রতিবেদন প্রকাশের ফলে এগুলোর প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল: এর ফলে মুজিব এবং তাজউদ্দীনের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হচ্ছিল।

বিজয়ীর প্রত্যাবর্তন

মুজিব নিরাপদ আছেন এমন ইঙ্গিতটি প্রথম পাওয়া যায় ২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ। ইয়াহিয়া খানকে সরিয়ে ভুট্টো পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের দুদিন পর, ভুট্টো ঘোষণা করেন যে মুজিবকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে। একই দিনে মার্কিন এসোসিয়েটেড প্রেসে খবর ছাপা হয় যে, ভুট্টো কয়েকজন পশ্চিম ইউরোপীয় এবং দক্ষিণ আমেরিকান কূটনীতিকের কাছে বলেছিলেন যে মুজিবের মনের অবস্থা তিনি জানেন না। ঐ কূটনীতিকরা ভুট্টোর ভাষ্য হুবহু তুলে ধরেন, 'যতদূর আমার মনে হয়, মুজিব আমাকে নরকে যেতে বলতে পারেন।"

ভুট্টো মুজিবকে ভালোভাবে চিনতেন; সে কারণেই তিনি এমন উত্তর প্রত্যাশা করছিলেন।

ইয়াহিয়া খানের বন্ধু এবং তার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন হিসেবে পরিচিত ফারল্যান্ডের কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে, ইয়াহিয়া খান তাকে গ্রীষ্মের শুরুর দিকে বলেছিলেন, 'আপনার আমাকে বিশ্বাস করাতে হবে যে মুজিবকে হত্যা করা হবে না।" কিন্তু প্রতিশ্রুতি তো চিরকালের জন্য দেয়া হয় না।

যখন ইয়াহিয়া খানকে পদচ্যুত করা হয়, তার আগে আগে তিনি মুজিবের মৃত্যু পরোয়ানায় স্বাক্ষর করেছিলেন যাতে তার পরে যিনি রাষ্ট্রপতির আসনে বসবেন তাকে সে পরোয়ানাটি কার্যকর করতে হয়। কিন্তু ভুট্টো যথেষ্ট বিবেচনাবোধ সম্পন্ন হওয়ায় এ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হতে দেননি। অনেকেই ভুট্টোর এ আচরণকে তার মহত্ত্ব হিসেবে দেখাতে চাইলেও, প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল শুধুই বিবেচনাবোধ থেকে নেয়া সিদ্ধান্ত। যদি মুজিবকে হত্যা করা হতো তাহলে বাংলাদেশে থাকা ৯০,০০০ এরও বেশি যুদ্ধবন্দীর মধ্য থেকে একজনকেও পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হতো না, জেনেভা কনভেনশনে যাই লেখা থাকুক। এবং যেই মুজিব হত্যার দায় কাঁধে নিক না কেন, এই অপকর্মের কুফল ভুট্টোকেই ভোগ করতে হতো।

নয় মাস ধরে কনডেম সেলে বন্দী থাকার পর মুজিবকে যখন গৃহবন্দী করা হলো তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তানে কোন একটি নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, কিন্তু তখনো তাকে বাইরের দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল এবং আসলে কি ঘটছে তা জানার কোন উপায় তার ছিল না । যখন ভুট্টো প্রথমবারের মত মুজিবকে দেখতে এসেছিলেন তখন মুজিব বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। 'আমি এখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধান সেনা প্রশাসক" ভুট্টোর একথার জবাবে মুজিব বলেছিলেন, 'আপনাকে আবার কবে থেকে একজন জেনারেল বানানো হলো?"

একজন বেসামরিক ব্যক্তি কিভাবে প্রধান সেনা প্রশাসক হতে পারেন তা কোন ক্রমেই মুজিবের বোধগম্য হচ্ছিল না।

ভুট্টো প্রাণপণে চাইছিলেন পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের একটি সম্পর্ক থাকুক, আর তাই মুজিবের প্রতি তিনি খুব সহানুভূতিশীল আচরণ করছিলেন। তিনি মুজিবকে একটি ট্রানজিস্টর সেট উপহার দেন।

ততক্ষণ পর্যন্ত মুজিব কি ঘটে গেছে তা সম্পর্কে শুধু ভুট্টোর ভাষ্যটিই জানতেন। ট্রানজিস্টরটি পেয়ে তখন তার জন্য বাংলাদেশ সম্পর্কে কিছু নির্ভরযোগ্য সংবাদ শোনার সুযোগ তৈরি হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি প্রথম যে কণ্ঠটি শোনেন তা তার জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনার কণ্ঠ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এক পক্ষ কেটে যাওয়ার পরও তার বাবার কোন খবর পাওয়া যায়নি বলে হাসিনাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছিল। তিনি সাক্ষাতকার গ্রহিতাকে বলেন তার বিয়ের সময়ও তার বাবা কারাবন্দী ছিলেন এবং তার প্রথম পুত্রের জন্মের সময়ও তিনি কারাবন্দী ছিলেন। হাসিনা জানান; 'আমার বাবা বলেছিলেন যে আমার একটি ছেলে হবে এবং আমি যেন তার নাম রাখি জয়।' তিনি তার বাবাকে নিয়ে এতোটাই উদ্বিগ্ন ছিলেন যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ঠিকভাবে কথা বলতে পারছিলেন না।

মুজিব খুবই আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তার একটি নাতি হয়েছে: জয়। জয় বাংলা! হাসিনা নিরাপদে আছে। তার অন্য চার সন্তান, তার স্ত্রী এবং তার বৃদ্ধ পিতা-মাতার কি অবস্থা? তিনি হাসিনার সাক্ষাৎকারের একটি অংশ শুনেছিলেন শুধু, এবং তার সিংহভাগ জুড়ে তাকে নিয়েই কথা হয়েছিল। অনেক প্রশ্নের উত্তরই অজানা থেকে গিয়েছিল।

মুজিবের সাথে কয়েকবার দেখা করার পর ভুট্টো জানান, তার আগে দায়িত্বে থাকা কর্তৃপক্ষ মুজিবের উপর নির্যাতন চালিয়েছে। তিনি সমবেদনার সাথে আরও বলেন, 'মুজিবের এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন, কিন্তু আমার সন্দেহ আছে তিনি সে সুযোগ পাবেন কি না।"

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি মুজিবের ভাগ্যে কি ঘটবে তা নিয়ে ভুট্টোর একটি ঘোষণা দেয়ার কথা ছিল। ৩ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমসে লেখা হয়েছিল, 'মুজিবকে দ্রুত ঢাকায় ফেরত পাঠানোতেই সবার জন্য মঙ্গল। ভুট্টো আজ মুজিবের ভাগ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার জন্য সারাবিশ্ব অপেক্ষা করে থাকবে।" ঐ একই দিনে নিউজ উইক, এডওয়ার্ড বিলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যে সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তা ছাপে। বিলো প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'যদি এখন মুজিবের মুক্তি হয় তাহলে কি তিনি বাংলাদেশের নেতৃত্বের যে দ্বিধা-বিভক্তি দেখা দিয়েছে তা ঠিক করতে পারবেন?" এটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে করা একটি প্রশ্ন।

বিলো সম্ভবত মোস্তাকের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন, কিন্তু মোস্তাকের কোন রাজনৈতিক প্রভাব ছিল না এবং তার রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল আরও কম। তিনি আসলে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন লোক ছিলেন না।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে সারা বিশ্বের মতামতের প্রতি সম্মান জানিয়ে তারা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে যাচ্ছে। ঢাকায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয়েছে এবং তিনি দেশে ফিরে আসছেন এ বিশ্বাস থেকে হাজারো জনতার ঢল রাস্তায় নেমে আসে, তারা নেচে, গেয়ে, বাতাসে ফাঁকা গুলি চালিয়ে এবং 'জয় বাংলা!' স্লোগান দিতে থাকে। শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে এয়াপোর্টে জড়ো হতে থাকে। কিন্তু তারা একটু বেশি আগেই উদযাপন করতে শুরু করেছিল।

মুজিবের জন্য প্রতীক্ষা কবে শেষ হবে?

৩ জানুয়ারি রেডিও পাকিস্তান থেকে মুজিব দেশে ফিরে যা যা করবেন তা বর্ণনা করতে থাকে। সেখানে বলা হতে থাকে মুজিব দেশে ফিরে প্রশাসনের দায়িত্ব বুঝে নেবেন এবং 'পূর্ব পাকিস্তান' থেকে ভারতীয় সেনা বাহিনী প্রত্যাহার করতে বলবেন।

সবকিছুর চেয়ে ব্যবসা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। লন্ডন থেকে প্রকাশিত ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকার প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল বাংলাদেশ থেকে পাটের সরবরাহ কমে যাওয়ায় ক্ষতির মুখে পড়া ডান্ডির পাটকলগুলোর ভাগ্যে কি ঘটবে।

১৯৭২ সালের ৩ জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার যতোগুলো পাট চুক্তি করেছিল তার সবগুলো বাতিল ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকার। কোন নতুন চুক্তি করার আগে বাংলাদেশ সরকার কি পরিমাণ পাট দেশে রয়েছে তা খতিয়ে দেখতে চেয়েছিল। ৪ জানুয়ারিতে ফাইনান্সিয়াল টাইমস লেখে যে বাংলাদেশ সরকারের এমন সিদ্ধান্তে ব্রিটেনের সবচেয়ে বড় আশঙ্কাটি সত্য হল।

৮ জানুয়ারি ১৯৭২ এ খুব সকালে পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে করে রাওয়ালপিন্ডি থেকে শেখ মুজিবকে কোন একটি অপ্রকাশিত গন্তব্যের উদ্দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। ভুট্টো নিজে রাওয়ালপিন্ডি থেকে শেখ মুজিবকে বিদায় দেয়ার কয়েক ঘণ্টা পরে সেই দুর্বোধ্য ঘোষণাটি দেন: 'পাখি উড়ে গেছে।" পাকিস্তানি সেনারা ১৯৭১-এর ২৫/২৬ মার্চে তাদের নিজস্ব গোপন ভাষায় যে 'পাখি'কে খাঁচায় আটকে ছিল সেটি এখন মুক্ত।

যখন সাংবাদিকরা ভুট্টোর কাছে জানতে চাইছিলেন কেন মুজিব লন্ডনে গিয়েছিলেন, জবাবে ভুট্টো বলেছিলেন, 'আপনারা নিজের মতো করে এর কারণ বুঝে নিন।" ভুট্টো জানতেন অন্তত কিছু সাংবাদিক তার কথার ইঙ্গিতটি ধরতে পারবেন এবং তিনি সাংবাদিকদের তাদের নিজেদের মতো করে গল্প তৈরি করতে

সাহায্য করার জন্য তাদের জানান যে পুরো প্রাক্রয়াটি মুজিবের নিজের ইচ্ছানুসারেই করা হয়েছে। তেহরান থেকে প্রকাশিত কায়হান ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকায় ছাপা হয়, 'মুজিবের যাত্রা নিয়ে যে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হয়েছে তা মুজিবের নির্দেশেই করা হয়েছে।"

লন্ডনে পৌছে মুজিব তার পরিবারের সদস্যদের ফোন করেন, যুদ্ধের নয় মাস তিনি তাদের কোন খবরই পাননি।" ফোনে পুত্র কামালকে অত্যন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে মুজিব প্রশ্ন করেন, 'তোমরা কি বেঁচে আছো? তোমাদের মা কেমন আছে?" বেগম মুজিব এতোটাই আবেগে আক্রান্ত ছিলেন যে প্রথমবারে তিনি মুজিবের সাথে ফোনে কথাই বলতে পারেন নি।

মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন একটু দেরীতে শুরু হয়েছিল। লন্ডনে কারিজ হোটেলে মুজিব অবস্থান করছিলেন, সেখানে সমবেত হওয়া সাংবাদিকদের সামনে প্রথমে তিনি একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে শোনান। তার প্রথম বাক্যটি ছিল: "আজ আমার নিজের দেশের মানুষের সাথে স্বাধীনতার আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয়ার জন্য আমি মুক্ত হয়েছি।" তার শেষ কথা ছিল, 'আমি আবারও নিশ্চিত করে বলতে চাই বাংলাদেশের অস্তিত্ব এখন একটি সন্দেহাতীত বাস্তবতা এবং এই বাস্তবতার নিরিখেই আমরা অন্যান্য রাষ্ট্রেগুর সাথে যে কোন ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করবো।"

মুজিবকে প্রথমেই যে প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল তার মধ্যে অন্যতম ছিল, 'আপনি কেন ঢাকায় যাওয়ার আগে লন্ডনে এলেন?" মুজিব সাথে সাথেই তিক্ততার সাথে জবাব দিয়েছিলেন, "আপনি কি জানেন না আমি আমার নিজের ইচ্ছায় নয়, বরং পাকিস্তান সরকারের ইচ্ছায় বন্দী ছিলাম।" তিনি আরও যোগ করেন, "আমার নিজের জনগণের কাছে ফিরে যেতে আমার আর তর সইছে না।"

মুজিবকে দেখতে ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত লাগছিল, কিন্তু একজন সাংবাদিক বলেন তাকে দেখে বোঝা যাচ্ছিল, 'তার উপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তারপরও তখনো চেতনার দিক' থেকে তিনি সজিব ছিলেন'। তাকে একটি কনডেম সেলে রাখা হয়েছিল, বহির্বিশ্বের সাথে তার কোন যোগাযোগ ছিল না, তারপরও তার মধ্যে সেরকম কোন তিক্ততা ছিল না। 'তার সাথে যে ভয়ঙ্কর আচরণ করা হয়েছে তারপরও' পাকিস্তানের জনগণের প্রতি তার কোন রকম বিদ্বেষ দেখা যায়নি। তিনি ভুট্টোর বিরুদ্ধে সরাসরি কোন বিষোদগারেও যান নি, তিনি বলেন, 'আমি তার জন্য শুভ কামনা করি।"

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য মুজিব তাকে ফোন করেছিলেন, তিনি বলেছিলেন, "আমি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।" জবাবে ইন্দিরা গান্ধীও মুজিবকে '২৫ বছরের অন্ধকার সময়ের পর ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য' তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বেগম মুজিব চাইছিলেন তার স্বামী যেন যতো দ্রুত সম্ভব দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু মুজিব ভেবেছিলেন তার অন্তত দিল্লীতে যাত্রা বিরতি দিয়ে ভারতের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের সবচেয়ে দুর্যোগের সময় পাশে দাঁড়ানোর জন্য কৃতজ্ঞতা জানানো উচিৎ।

১০ জানুয়ারি সকাল ৮ টায় যখন মুজিব দিল্লীতে পৌছান তখন তাকে ব্যাপক সংবর্ধনা জানানো হয়। ভারতীয়দের কাছেও তিনি একজন নায়কের মর্যাদা পেয়েছিলেন।

মুজিব যখন ভারতের মাটিতে নামেন তখন তাকে 'জয় বাংলা", 'শেখ মুজিবুর রহমান জিন্দাবাদ" এবং 'মুজিব দীর্ঘজীবী হোন" চিৎকার করে এসব জয়ধ্বনি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। গোলন্দাজ বাহিনী ২১ বার তোপধ্বনি করে তাকে সম্মান জানায় এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সদস্যরা এয়ারপোর্টের টারমাকে মুজিবকে এক নজর দেখার জন্য ভিড় জমায়। আমন্ত্রিত অতিথিদের যখন তাদের জন্য বরাদ্দকৃত চেয়ারগুলোর কথা মনে পড়ে তখন তারা সেগুলির উপর উঠে দাড়িয়ে যান মুজিবকে আরেকটু ভালোভাবে দেখবার জন্য। এই ব্যাপক জয়ধ্বনির জবাবে মুজিব তার ডান হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান।

সবার সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন সেই মহান নেতা–যিনি উপমহাদেশের ইতিহাস বদলে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এক সপ্তাহ আগেও তিনি জানতেন না তার নিজের ভাগ্যে কি ঘটতে যাচ্ছে, অথচ ঐ মুহূর্তে তার হাসিমুখ দেখে হাজারো মানুষের হৃদয় জানুয়ারি মাসের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সকালেও উষ্ণ হয়ে উঠছিল।

একটি ব্যান্ড দল 'আমার সোনার বাংলা" এবং 'জনগণ মন" বাজিয়েছিল, এগুলো বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। এ দুটি সঙ্গীতই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ও সুর করা ছিল, এবং এই প্রথমবারের মতো একই অনুষ্ঠানে বাজানো হচ্ছিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতির স্বাগত ভাষণের জবাবে মুজিব বলেন, 'অবশেষে আমি আমার স্বপ্নের সোনার বাংলায় যাচ্ছি নয় মাস পরে, এই নয় মাসে আমার দেশের মানুষ কয়েক শতাব্দি পাড়ি দিয়েছে।" মুজিবের যাত্রা ছিল 'বন্দীদশা থেকে মুক্তির দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, হতাশা থেকে আশার দিকে; এবং মুজিব ভারত ও এর জনগণের প্রতি 'তাদের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টা এবং সাহসী ত্যাগের' যেগুলোর কারণে মুজিবের এই যাত্রা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল সে জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন।

মুজিব বলেন, 'আমার জন্য এটি একটি ব্যাপক কৃতজ্ঞতাময় মুহূর্ত। আমি দেশে ফেরার পথে আপনাদের মহান রাষ্ট্রের ঐতিহাসিক রাজধানীতে যাত্রা বিরতি করেছি। কারণ, আমি মনে করি আপনাদের মহৎ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী'র নেতৃত্বাধীন ভারত সরকার এবং ভারতের জনগণ যারা আমার দেশের মানুষের শ্রেষ্ঠ বন্ধু তাদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে আমার সম্মান প্রদর্শনের জন্য অন্তত এতোটুকু আমার করা উচিৎ।"

তিনি তার নিজের দেশের মানুষের কাছে ফিরে যাচ্ছিলেন যেখানে গিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে তাকে বিশাল কর্মকাণ্ডের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে হবে। তিনি বলেন, "আমি কারও প্রতি কোন বিদ্বেষ মনে নিয়ে নিজ দেশে যাচ্ছি না, বরং আমার মধ্যে কাজ করছে আত্মতৃপ্তি, কারণ অবশেষে অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের, উন্মাদনার বিরুদ্ধে সুস্থতার, ভীরুতার বিরুদ্ধে সাহসের, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের এবং সর্বোপরি মন্দের বিরুদ্ধে ভালোর জয় হয়েছে।"

এয়ারপোর্টে সংবর্ধনার পরে কুচকাওয়াজের ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে মুজিব তার ভাষণ ইংরেজিতে দিতে শুরু করেছিলেন কিন্তু তিনি কেবল 'লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান" পর্যন্ত বলতে পেরেছিলেন। জনতার মধ্যে তখন গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল, তারা চাইছিল তিনি যেন তার মাতৃভাষা বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন। মুজিব হেসেছিলেন, তার মাতৃভাষায় ভাষণ দেয়ার চেয়ে ভালো তার কাছে আর কি হতে পারে। শ্রোতাদের মধ্যে সিংহভাগই তিনি বাংলায় যা বলছিলেন তা বুঝতে পারছিলেন না, কিন্তু তার প্রতিটি কথাতেই তারা এমন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছিল যেন তারা কোন সঙ্গীত উপভোগ করছেন; যখন মুজিব পাকিস্তানিদের অপকর্মের কথা বলছিলেন তখন তারা যেমনিভাবে তার বেদনাটুকু অনুভব করছিলেন, তেমনি যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা বলছিলেন তখন তারা তার আনন্দের সাথে একাত্মতা অনুভব করছিলেন। 'জনগণ এতো নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে তারা একে অপরের নিশ্বাসের শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছিল।"

জনসভা থেকে মুজিব রাষ্ট্রপতি ভবনে যান ইন্দিরা গান্ধীর সাথে আলাপচারিতার জন্য এবং সেখান থেকে তিনি আবার এয়ারপোর্টে ফেরত আসেন দেশের উদ্দেশে যাত্রা করার জন্য। মুজিব আকাশ থেকে তার সোনার বাংলা দেখতে চেয়েছিলেন। তার অনুরোধে রাজকীয় বিমানবাহিনী (আরএএফ)-এর বিমানটি ঢাকার আকাশ একবার চক্রাকারে ঘুরে এয়ারপোর্টে অবতরণ করে। আবেগে আর্দ্র হয়ে মুজিব কেঁদে ওঠেন, 'আমি এখন কি করবো? আমাকে বলে দাও, আমি এখন কি করবো?"

ঢাকা তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল। হাজার হাজার মানুষ নাচছিল আর হর্ষধ্বনি করছিল। রাতের অন্ধকারে এই এয়ারপোর্ট থেকেই পাক সেনারা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই এয়ারপোর্টেই তিনি ফিরছিলেন দিনের আলোতে তার প্রিয় জনতার কাছে। জনতার বিজয় তখন পূর্ণাঙ্গ হয়েছিল, তাদের আনন্দ তখন সব সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এই স্বাগত জানানোর উৎসবের মতো কোনকিছু পৃথিবীতে খুব অল্পই দেখা গিয়েছিল।

যখন দুপুর একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মুজিবের বিমানটি অবতরণ করে তখন প্রহরীদের উপেক্ষা করে হাজার হাজার মানুষ বিমানটির দিকে এগিয়ে যায়। দশ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে মুজিব বিমান থেকে নামতে পারছিলেন না। এমনকি

যখন কূটনীতিকদের সাথে তাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছিল তখনও জনতা তাকে চেপে ধরতে চেষ্টা করছিল। শোরগোলের মধ্যে দুজন পাকিস্তানী সেনা সদস্য এয়ারপোর্টের প্রান্তে পৌছে গিয়েছিল। তারা নিরস্ত্র ছিল, এবং সম্ভবত তারা মুজিবকে এক নজর দেখতেই পাশের ঢাকা সেনানিবাস থেকে সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু তারা সেখানে পৌছালো কিভাবে? সৌভাগ্যক্রমে একজন ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা তাদের চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন, তা না হলে জনতা হয়তো তাদের ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলত।

এয়ারপোর্টে এবং এর আশে পাশে সেদিন যারা মুজিবকে স্বাগত জানাতে হাজির হয়েছিল তাদের মধ্যে হয়তো আরও কিছু বন্ধুভাবাপন্ন নয় এমন চোখ ছিল। মনে হচ্ছিল যেন ঢাকার সব জনতাই যেন সেদিন এয়ারপোর্ট এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে (রেসকোর্স ময়দানে) জড়ো হয়েছিল। হাজারো মানুষ তখন আশে পাশের জেলাগুলো থেকে বা আরও দূরবর্তী অঞ্চল থেকে মুজিবকে দেখতে এসেছিল। ছাত্রনেতারা যারা আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে তারা এয়ারপোর্টে কিছু বিচারপতি এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তার চেহারা দেখতে চান না, তারা মুজিবের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি প্রশাসনের উপর ছেড়ে দেননি। শত শত ছাত্র সেদিন জনতার কাতারে মিশে ছিলেন যাতে করে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা না ঘটে।

মুজিব একটি খোলা ট্রাকে চড়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার রাজনৈতিক সহযোগীরা তাকে ঘিরে রেখেছিলেন। পুরো ট্রাকটি ফুল দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছিল, শুধু তার সামনের কাচের মধ্যে একটি ছিদ্র সাম্প্রতিক ভয়াবহ অতীতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

ট্রাকটি যখন এয়ারপোর্ট থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের দিকে যাচ্ছিল তখন 'জয় বাংলা', 'বঙ্গবন্ধু দীর্ঘজীবী হোন' এসব স্লোগানের পাশাপাশি ছন্দে ছন্দে 'জন্ম নিল নতুন দেশ- বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' বলা হচ্ছিল। তিন কিলোমিটারের কম দূরত্ব যেতে সেদিন ট্রাকটি সময় লেগেছিল দুই ঘণ্টারও বেশি।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যান ছিল একটি বিশাল এলাকা, এখানেই মুজিব ৭ মার্চ ১৯৭১-এ বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম।' কিন্তু সেদিন যখন তিনি ভাষণ শুরু করতে চাচ্ছিলেন তখন তার চোখজোড়া ছিল অশ্রুসজল। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তিনি প্রায়ই ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিলেন। তার সেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠা সেদিন তার কথার চেয়েও বেশি আবেদনময় ছিল।

তিনি বলেছিলেন, 'আমার বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার সারা জীবনের স্বপ্ন সত্য হয়েছে।" তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সালাম জানান আর ঘোষণা করেন তাদের রক্ত বৃথা যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন, "হে বঙ্গ জননী, ৭ কোটি বাঙালীকে বাঙালী করেছ, মানুষ করোনি।" কিন্তু মুজিব সেদিন বলেছিলেন, এ কথা তখন আর সঠিক ছিল না। বাংলাদেশের মানুষ সে সময় প্রমাণ করেছিল তারা একটি বীরের জাতি।

মুজিব বলেছিলেন তার সহকর্মীরা তাকে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাজউদ্দীন এবং অন্যান্যরা কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু যে জনগণ তার কাছে তার প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের ছেড়ে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন নি।

মুজিব বলেন, "আমি তাজউদ্দীনকে তার কাজ চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলাম।" তিনি তাজউদ্দীন এবং অন্যান্যকে তাদের 'দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার জন্য' সাধুবাদ জানান। স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার সহকর্মীদের যাদের প্রচণ্ড কষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানিরা নির্দোষ লোকদের হত্যা করেছিল এবং নারীদের সম্ভ্রমহানি ঘটিয়েছিল। ঐ কাপুরুষের দল! তারা নিজেদের মুসলিম বলে দাবি করে। মুজিব জনতার কাছে আবেদন রাখেন, 'ওদের প্রতি তোমরা করুণা অনুভব কর।" যারা অপরাধ করেছিল তাদেরকে বিনা দণ্ডে ছেড়ে দেওয়ার কথা মুজিব ভাবেননি, কিন্তু তার মনে পাকিস্তানের জনগণের প্রতি কোন বিশেষ বিদ্বেষ ছিল না। তিনি তাদের ভালোই চাইছিলেন।

মুজিব বলেন তার মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল এবং তার জন্য একটি কবরও খোড়া হয়েছিল; কিন্তু তারপরও তিনি পাকিস্তানিদের সামনে মাথানত করে করুণা ভিক্ষা করেননি। তিনি একজন মুসলমান হিসেবে, একজন বাঙালী হিসেবে হাসতে হাসতে মরতে প্রস্তুত ছিলেন এবং মৃত্যুর মুখেও তিনি বলতে চাইছিলেন: 'জয় বাংলা!" মুজিব পাকিস্তানিদের বলেছিলেন, "তোমাদের আমাকে মেরে ফেলতে হলে মেরে ফেল, শুধু আমার দেহটি বাংলাদেশে পাঠিও।"

ভাষণ দেয়ার সময় মুজিব কথা এলোমেলো করে ফেলছিলেন, তিনি একই কথা বারবার বলছিলেন, প্রায়ই ভেঙ্গে পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন, কিন্তু তারপরও তার এই ভাষণটি সবাইকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। কান্না চেপে তিনি বলেছিলেন, "আজ আমি আর বেশি কিছু বলতে পারবো না।"

তারপর একটি আবেগঘন পারিবারিক পুনর্মিলনী ঘটে। মুজিব তার মাতা এবং কন্যাদ্বয়কে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তারা তার জন্য বাড়িতেই অপেক্ষা করছিলেন।

ধানমণ্ডির ১৮ নাম্বার সড়কে যে বাড়িটিতে পাক বাহিনী তার পরিবারকে আটকে রেখেছিল, রাতে খাবার খেয়ে মুজিব সেখান থেকে পায়ে হেঁটে রাস্তার বিপরীত দিকের একটি বাড়িতে যান, ঐ বাড়িটি তিনি ফিরে আসার ঠিক আগের দিন তার পরিবারের সদস্যরা থাকার জন্য ভাড়া করেছিলেন। ঐ অন্য বাড়িটিতে কেউ ছিল না।

মুজিবের মেয়ের জামাই ওয়াজেদ দৌড়ে গিয়ে প্রহরীদের জানান যে মুজিব অন্য বাড়িটিতে যাচ্ছেন। "এটা বাংলাদেশ" একথা বলে মুজিব সেদিন ওয়াজেদকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

বাংলাদেশ, মুজিবের অতি প্রিয় বাংলাদেশ।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ যদি মুজিবকে সরাসরি ঢাকায় উড়িয়ে নিয়ে আসত তাহলে সেটা হতো সরাসরি না হলেও একভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়া। এছাড়াও আরও ব্যবহারিক সমস্যা ছিল। একটি পাকিস্তানী বিমান কিভাবে ঢাকায় অবতরণ করতো?

পাকিস্তান সরকার মুজিবকে পাঠানোর জন্য বেশ কয়েকটি স্থানের কথা বিবেচনা করেছিল এবং তাদের কোনটিই খুব গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। শেষ পর্যন্ত লন্ডনকেই তাদের পছন্দ হয়েছিল, এর বিষয়ে কারও তেমন কোন আপত্তি ছিল না।

জানুয়ারি মাসে সংবাদ সম্মেলনেই মুজিব এটা স্পষ্ট করেছিলেন যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষই তাকে লন্ডনে পাঠিয়েছিল এবং একজন বন্দী হিসেবে এক্ষেত্রে তার কিছুই করার ছিল না। এ বিষয়ে আবারও জোর দিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'আমার নিজ দেশে ফিরে যেতে আমার আর তর সইছেনা।' কিন্তু তার এমন সোজাসাপ্টা উত্তর অনেক ব্রিটিশ সাংবাদিকের মনঃপুত হয়নি।

ডেইলি মেইল পত্রিকা ১০ জানুয়ারিতে ছাপে, "পৃথিবীতে সর্বশেষ যে দেশটি স্বাধীন হয়েছে সেটির নেতা মুক্তির পর তার প্রথম দিনটি লন্ডনে কাটিয়েছেন, ব্রিটিশ সরকার নিশ্চয়ই এ সুযোগের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করেছে। আমরা যদি দ্রুতই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন না করি, তাহলে পৃথিবীর ঐ অংশে প্রভাব বিস্তারের জন্য মুখিয়ে থাকা ক্রেমলিন আমাদেরকে হারিয়ে দিয়ে আগেই বাংলাদেশের মন জয় করে নিবে।" দৈনিক টেলিগ্রাফে লেখা হয়, 'এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে ভারত যে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করতে থাকবে তার বিপরীত একটি প্রভাব বলয়' খুঁজে বের করার লক্ষ্যেই মুজিব তার যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশে ফেরত যাবার আগে ব্রিটেন সফর করেছিলেন। বাংলাদেশ 'ভারতের বশ্যতা'র মধ্যে চলে যেতে পারে বলে ইকোনমিস্ট পত্রিকা আশঙ্কা প্রকাশ করে। গার্ডিয়ান সাময়িকীর সাংবাদিক মার্টিন ওয়ালকট লিখেছিলেন, মুজিব তার দেশের স্বাধীন নেতা হিসেবে প্রথম রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, 'ভারতীয় বিমান বাহিনীর একটি বিমানে করে ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং কোলকাতায় যাত্রাবিরতি করে সেখানে একটি জনসভায় ভাষণ দেয়ার প্রস্তাব বাতিল করে।' এবং তিনি দাবি করেন আওয়ামী লীগের একজন উপদেষ্টাও তার সাথে একমত। এই 'উপদেষ্টা'র বক্তব্য তিনি এভাবে তুলে ধরেন, 'মুজিবের বিবেচনাবোধ আগের মতোই কাজ করছে।"

এই 'উপদেষ্টা' জানতেন না যে বাংলাদেশ সরকার মুজিব লন্ডনে পৌছেছেন খবর পেয়ে বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে এয়ার ইন্ডিয়ার (ভারতীয় বিমান বাহিনীর নয়) একটি বিমান বুকিং দিয়ে রেখেছিল, কিন্তু যখন ব্রিটিশ সরকার মুজিবকে ঢাকায় পৌছে দেয়ার প্রস্তাব করে তখন আর ভাড়া করা বিমানের কোন প্রয়োজন পড়েনি।

ঢাকায় ফেরার পথে মুজিব ভারতের সরকার ও জনগণের কাছে তার কৃতজ্ঞতা জানাতে দিল্লীতে যাত্রা বিরতি করেছিলেন। মুজিবের এই পদক্ষেপ ভারত উষ্ণতার সাথে প্রশংসা করেছিল। কোলকাতায় তাকে আবার থামতে অনুরোধ করাটা তার উপর অতিরিক্ত চাপ হয়ে যেত। অবশ্যই মুজিবের নিজের দেশের লোক যারা তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, তাদের দাবিই সবচেয়ে অগ্রগণ্য ছিল। প্রথম সুযোগেই মুজিব নিশ্চয়ই কোলকাতা সফর করবেন।

গার্ডিয়ান পত্রিকায় এই প্রতিবেদন পড়ে ঢাকায় অনেকেই হেসেছিলেন। কিন্তু এরকম একটি চাতুর্যপূর্ণ বিকৃতি, তা যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন, এরকম ঘটানোর ফলে ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত ঘটতে পারে এবং এর ফলে মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। একজন ভারতীয় সম্পাদক যিনি ওয়ালকটের লেখার সমালোচনা করে কলাম লিখেছিলেন তিনি বছর খানেক পরে প্রশ্ন করেছিলেন কি কারণে মুজিব একটি ভারতীয় বিমান প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও একটি ব্রিটিশ বিমানে চড়ার সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন। এটি আসলে কোন অগ্রাধিকারের বিষয় ছিল না। ঐ মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকার মারাত্মক অর্থ সংকটে ছিল, এবং এ কারণে তারা ব্রিটিশ সরকারের মুজিবকে ঢাকায় পৌছে দেয়ার প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেছিল। কে-ই বা ভেবেছিল এমন একটি সামান্য বিষয়ও ভুলভাবে ব্যাখ্যা করা হতে পারে?

মুজিবের ঢাকা ফেরা বিষয়ে রিপোর্টে অবজারভার পত্রিকার গ্যাভিন ইয়ং লিখেছিলেন, "কেউই মুজিবের অনুপস্থিতিতে নিরাপদ বোধ করছিলেন না।" তিনি লিখেছিলেন, 'বামপন্থী বাঙালীদের থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম বা সিলেটে কর্মরত ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানী বা চা কোম্পানীর লোকেরা যাদের একমাত্র চিন্তা ছিল দ্রুত ব্যবসায়িক কার্যক্রম শুরু করা, পাগড়ি মাথায় দেয়া ভারতীয় শিখ জেনারেলরা, যাদের কাজ ছিল যুদ্ধবন্দীদের দেখভাল করা বা সাধারণ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা তারা সবাই চাইছিল যেন মুজিব ফিরে আসেন।' (ইয়ং এর মনে হয়েছিল সব ভারতীয় জেনারেলই হয়তো পাগড়ি পড়া শিখ)

বাংলাদেশের জন্মের সময় ইয়ং 'কিছু সাধু ধরণের' লোক খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিবেচনাবোধ এবং আলোকিত মানুষ হিসেবে গণ্য হওয়ার মতো ছিলেন মুজিব নিজেই।' মুজিবের এমন ভুয়সী প্রশংসা করার পর ইয়ং হয়তো ভেবেছিলেন মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিপক্ষে মত দিবেন। তিনি তার পাঠকদের উদ্দেশে লিখেছিলেন, 'স্বাধীনতা মুজিবের লক্ষ্য ছিল না- অন্তত নিকট ভবিষ্যতের লক্ষ্য ছিল না।' তিনি আরও লিখেছিলেন, 'সম্ভবত

মুজিব সেই ব্যাপক আবেগঘন সময়ও অনুধাবন করতে পারছিলেন যা পেয়েছে তার জন্য কি ভিষণ মূল্য বাঙালীদের জীবন দিয়ে দিতে হয়েছে। এর পাশাপাশি এই বিজয়ের মুহূর্তেও আর সব বাঙালীর মতো আনন্দে ভেসে না গিয়ে কিছু কিছু চিন্তাশীল আওয়ামী লীগার এবং বাঙালী পাকিস্তানের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নিয়ে খুব একটা সন্তুষ্ট হননি সেটাও হয়তো তার মাথায় খেলা করছিল।'

ইয়ং এসব 'আওয়ামী লীগার এবং বাঙালী'দের চিহ্নিত করতে স্বভাবতই ব্যর্থ হলেও, তার মতে এরা ছিলেন চিন্তাশীল।

তখন হয়তো এমন কিছু বাঙালী ছিলেন যারা পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় 'আনন্দে ভেসে' যাননি এবং এদের মধ্যে হয়তো কিছু আওয়ামী লীগারও ছিলেন। কিন্তু বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালীই খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু ইয়ং এর মতে তারা সবাই ছিলেন অগভীর চিন্তার অধিকারী এবং অগুরুত্বপূর্ণ। যে বাঙালীর কথা ইয়ং বলছিলেন তারা 'নিশ্চয়ই ইসলামাবাদের ভয়ঙ্কর জেনারেলদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নিয়ে দুঃখ করছিলেন না'- এ কথা বলে ইয়ং সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। এবং এরপরই তিনি আসল কথায় আসেন। ইয়ং এর বাঙালীরা আসলে চিন্তিত হচ্ছিলেন একটি বিশাল মুসলিম রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে থাকার ফলে 'এই বিছিন্ন মুসলিম ভূখণ্ডটি কৌতুহলোদ্দীপকভাবে বন্ধনের মধ্যে থেকেও যে অপরিমেয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিল' তা নিয়েই। ইসলামের নামে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালীর উপর যে বর্বরতা চালিয়েছিল তারপরও ইসলামিক বন্ধনের কারণে প্রাপ্ত অপরিমেয় সুযোগ সুবিধার প্রসঙ্গ তোলা হচ্ছিল? মাতাল অথবা সুস্থ যে কোন অবস্থায় একজন পাকিস্তানী জেনারেলের মন্তব্যের সাথে ইয়ং এর এই জঘন্য বক্তব্যের তুলনা করা যেতে পারে।

মুজিব সম্পর্কে লন্ডন টাইমস মন্তব্য করেছিল, 'কেবল তিনিই পারেন এই তিক্ততাময় অবস্থায় আশা সঞ্চার করতে।' কিন্তু পশ্চিমের সকল সাংবাদিক মুজিবের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন না। দুই একজন তো তাকে নেতা হওয়ার অযোগ্য বলে ঘোষণা করে বসেছিলেন। দৈনিক গার্ডিয়ানের একজন সাংবাদিক হ্যারল্ড জ্যাকসনের প্রতিবেদন যেটির শিরোনামে কৌতুক করে লেখা হয়েছিল "ঈশ্বর প্রেরিত উদ্ধারকারীর জন্য প্রতিক্ষা", সে প্রতিবেদনে মুজিব উপকথায় পরিণত হয়েছিলেন এবং নেতা হিসেবে তার সম্ভাবনা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফাইনান্সিয়াল টাইমসে কেভিন রাফেরতি মুজিবকে একজন 'গোঁয়ার ও স্বেচ্ছাচারী' ব্যক্তি হিসেবে দেখিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন যে মুজিব কোন যুক্তি শুনতে আগ্রহী ছিলেন না এবং তাকে সহজে প্রভাবিত করা যেত না বা তার মত পরিবর্তন করা সম্ভব হতোনা। রাফেরাতির মতে একটি চমৎকার শুরু হওয়া সত্তেও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ছিল ভঙ্গুর। তিনি লিখেছিলেন, 'যে শুভ সূচনা বাংলাদেশের জন্য দরকার তা করার সুযোগ বাংলাদেশকে দেয়া হবে কি না সেটাই এখন প্রধান প্রশ্ন।'

কে বাংলাদেশকে সুযোগ দিবে?

কিছু কিছু পশ্চিমা সাংবাদিক ধারণা করেছিলেন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক দাবা খেলায় নতুন গুটি হতে যাচ্ছে।

একজন 'নিরপেক্ষ সমালোচক'-এর বরাত দিয়ে নিউজউইক ছেপেছিল, 'একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে মুজিব এবং একজন প্রশাসক হিসেবে মুজিব দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু।" এ কথা হয়তো সত্য, কিন্তু যখন ঐ সমালোচক বলেছিলেন, 'একটি বেশ কৌতুহলোদ্দিপক উপায়ে মুজিব ইতিমধ্যেই অতীতে পরিণত হয়েছেন' সেটি ভুল ছিল।

ঐ সাপ্তাহিকে লেখা হয়েছিল, 'কাজেই মুজিবকে আবার শুরু থেকে দেশের জনগণের কাছে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তার অবিশ্বাস্য ক্যারিশমা এবং তার প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা নিশ্চয়ই তার পক্ষে কাজ করবে। কিন্তু তারপরও বাঙালীর অনেকে মনে করেন যে সমস্ত নেতারা মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী সরকার পরিচালনা করেছিলেন তারা খুব সহজে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইবেন না। তারা হয়তো মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু'র সম্মান দিয়ে তাকে কোন একটি অলঙ্কারিক পদে বহাল করে রাখতে চাইবেন। কিন্তু যারা মুজিবকে ভালোভাবে চিনতেন তারা নিশ্চিত ছিলেন যে, কারাবাসের কারণে যদি মুজিবের চেতনা ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়ে থাকে তাহলে মুজিব যে জাতি গঠনে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে জাতি পরিচালনার কোন কেন্দ্রীয় দায়িত্ব ছাড়া শান্ত হবেন না।'

মুজিবের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিনে নিউ ইয়র্ক টাইমস পত্রিকার ফক্স বাটারফিল্ড সঠিকভাবে বলেছিলেন, 'শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তা এতোই বেশি যে তার মুখের কথাই অনেক বাঙালীর কাছে আইনের মর্যাদা পায়। বাংলাদেশের মন্ত্রীসভায় মুজিবের যে সমস্ত অনুসারীরা ছিলেন তাদের কারও জনপ্রিয়তাই মুজিবের জনপ্রিয়তার ধারে কাছে ছিল না এবং তারা সবচেয়ে কঠিন সিদ্ধান্তগুলো যাতে মুজিব ফিরে আসার পর নেয়া হয় সে জন্য সেগুলো ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।'

আওয়ামী লীগাররা মুজিবকে 'প্রধানতম নেতা' মনে করতেন। কেউ যদি ভেবে থাকে যে আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে কোন নেতা মুজিবের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে তবে তা হবে ইচ্ছাপ্রসূত কল্পনা মাত্র। কোন আওয়ামী লীগ নেতা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে শেখ মুজিবের বিরোধিতা প্রকাশ্যে করেন নি। যদি কোন প্রতিযোগিতা থেকে থাকে তবে তা ছিল দ্বিতীয় স্থান দখল করা নিয়ে, এবং সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত যদি নিতেই হয়– তা নেবেন মুজিবই।

একজন সংবাদদাতা তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, 'বাঙালীরা গভীর দ্বিধার মধ্যে ছিল। একজন বাঙালী বন্ধু আমাকে বলেছিলেন যে বাঙালীর একদিকে ভারতীয়দের বিষয়ে ঘৃণা আর ভীতি, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিষয়ে ঘৃণা

আর ভাত বাঙালাকে পাড়া দিচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন যে এখন এখানে অনেক গোলযোগ ঘটবে–অভ্যুত্থান এবং হত্যা, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ইত্যাদি। এই ব্যক্তিটি একজন প্রবল আওয়ামী লীগ সমর্থক এবং একটু বামঘেঁষা। শেখ মুজিবুর রহমান ফিরে আসুন এই ব্যক্তিটি তাই চাইছিলেন, কিন্তু একই সাথে মুজিবকে হত্যা করা হতে পারে এমন ভয়ও তিনি পাচ্ছিলেন।'

তখনকার হিসেবে এই ভয়কে হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদের বিবেচনায় এই ভীতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে বলে স্বীকার করতে হবে।

বাঙালীর কেউ কেউ তখন ভারতীয়রা পাকিস্তানিদের স্থানে অধিষ্ঠিত হবে বলে মনে করলে, সাধারণের ভারতীয়দের উপর আস্থাই ছিল। অধিকাংশেরই এমন বিশ্বাস ছিল যে খুব শিঘ্রই ভারতীয়রা নিজেরাই বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যেতে চাইবে।

ব্রিটিশ সাংবাদিকরা মুজিব তার মুক্ত জীবনের প্রথম দিনটি লন্ডনে কাটানোর 'সিদ্ধান্ত' নেয়ার ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন। উইলিয়াম জে কফলিন বলেছিলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুজিবের বেঁচে থাকার কিছু কৃতিত্ব দাবি করবে বলে আশা করা হচ্ছিল' আর ভারত কি করবে? ভারত বাংলাদেশের ১০ মিলিয়ন মানুষকে নয় মাস ধরে আশ্রয় দিয়েছিল এবং শত শত ভারতীয় সেনা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য তাদের জীবন বিলিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ভারত ছিল এই নতুন রাষ্ট্রের জন্মকালের ধাত্রির মতো। কিছু কিছু বিদেশী সাংবাদিক এমন অভিযোগও করেন যে এই ধাত্রি যদি তার পক্ষে নবজাতকটিকে নিয়ন্ত্রণ করা বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে তবে এটিকে হত্যাও করতে পারে।

১২ জানুয়ারিতে মুজিবের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করা আবু সাইয়ীদ চৌধুরী এক সপ্তাহ পরে জানিয়েছিলেন মুজিব তাকে বলেছিলেন, "আমি এই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে চাইনা। আমি আপনাকে রাষ্ট্রপতি করতে চাই এবং অন্য কাউকে প্রধানমন্ত্রী করতে চাই।" হয়তো দেশে ফেরার মাত্র একদিন পর প্রচণ্ড ক্লান্তির কারণে মুজিব এমন কথা বলে থাকতে পারেন, কিন্তু সুস্থ কোন মানুষের পক্ষে মুজিবের এ কথাগুলো গুরুত্বের সাথে নেয়া সম্ভব নয়।

১৪ জানুয়ারি মুজিব জানান যেহেতু তিনি তখন দেশের প্রধানমন্ত্রী তাই তাকে আওয়ামী লীগের প্রধানের পদটি ছেড়ে দিতে হবে। আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে কোন ব্যক্তির একই সঙ্গে দলের এবং সরকারের প্রশাসনিক পদে থাকার বিধান ছিল না। কিন্তু মুজিবকে দলের প্রধানের পদ থেকে পদত্যাগ করার সুযোগ দেয়ার চেয়ে দলের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে মুজিবকে রেখে দেয়ার ব্যাপারেই সবার আগ্রহ ছিল।

একজন পিতৃসুলভ ব্যাক্তত্বের যে মর্যাদা মুজিব সে তুলনায় অনেক বেশি সজীব ও সতেজ ছিলেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড তার জন্য কোন 'আলাদা' কিছু ছিল না, বরং এসব কর্মকাণ্ডই ছিল তার 'পুরো অস্তিত্ব জুড়ে'। তিনি স্বভাবগতভাবেই অবসর নেয়ার মত লোক ছিলেন না, এবং এমনকি সাময়িকভাবে তাকে লোকচক্ষুর আড়ালে ভাবাটা দুষ্কর ছিল। তার সহকর্মীদের সহায়তাকারীর ভূমিকায় রেখে নিজেই প্রধান ভূমিকা নেয়া ছাড়া আর কোন কিছুতেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন না।

আওয়ামী লীগ কর্মীদের উদ্দেশে ১৫ জানুয়ারিতে শেখ মুজিব বলেছিলেন, 'আমি চেয়েছিলাম সরকারের বাইরে থেকে দেশের মানুষের সেবায় আমার পুরো সময় ব্যয় করতে।' কিন্তু বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে তখনো যেসব চক্রান্ত চলমান ছিল সেগুলো ঠেকাতেই তাকে বাধ্য হয়ে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল।

প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার প্রথম সংবাদ সম্মেলন করেন ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে। তিনি একটি লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনান, যার শুরুতেই দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করা হয়, 'বাংলাদেশ এখন বিশ্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।' ঐ মুহূর্তে দেশ যে সমস্ত সমস্যার মুখোমুখি ছিল সেগুলো সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'জনগণের স্বপ্ন' বাস্তবায়ন সম্ভব শুধু একটি 'সমাজবাদি অর্থনীতি' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এবং নতুন অর্থনীতির পরিকল্পনার মধ্যে 'কৃষি, শিল্প এবং আর্থিক খাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'

প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হলেও সেজন্য তখনও হাতে সময় ছিল। ত্রাণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যাগুলো আরও প্রকট ছিল এবং এগুলো যতো দ্রুত সম্ভব সমাধান করা দরকার ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান জানিয়েছিলেন এ বিষয়ে জরুরি ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হতে যাচ্ছে। এজন্য বাংলাদেশের সহায়তার দরকার ছিল। তিনি বিশ্ব সম্প্রদায়ের কাছে উদাত্ত কণ্ঠে আবেদন জানান, 'নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি যেগুলো আমাদের জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন সেগুলোসহ অন্য সকল ক্ষেত্রে আমাদের সহায়তা করার জন্য সকল রাষ্ট্র, বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোকে আমরা আহবান জানাচ্ছি।'

বাংলাদেশের যে পরিমাণ সহায়তা প্রয়োজন ছিল তা সম্ভবত কেবল একটি বহুজাতিক উদ্যোগের মাধ্যমেই করা সম্ভবপর হতো। এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কোন্ দেশ থেকে সাহায্য আসছিল সে বিষয়ে তাজউদ্দীন আহমেদের মতো কোন বিশেষ সংস্কার ছিল না।

শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নৈতিক এবং বস্তুগত সহায়তা দেয়ার জন্য পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী জনতার কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জানান, তবে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি। তিনি যোগ করেন, 'আমি এ সুযোগে বিশ্বের মুক্তিকামী জনতা, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই এবং এদের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকেরাও আছেন যারা আমাদের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন।"

লিখিত বক্তব্যের কোথাও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়নি। চারদিন আগে ঢাকায় ফিরে তার দেয়া ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলে গিয়েছিলেন, সেদিনের সংবাদ সম্মেলনে তিনি সে ভুল শুধরে নিয়েছিলেন।

তিনি বলেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের বিরুদ্ধে তার মনে কোন বিদ্বেষ ছিল না, কিন্তু মাঝে মধ্যে 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু নীতি তার মনে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট দিয়েছে'। এটা এমন কি সে অর্থে কোন সমালোচনাই করা হয়নি।

তবে চীনের বিষয়ে মত দেয়ার ব্যাপারে শেখ মুজিবুর রহমান তখনো খুব সতর্ক ছিলেন। খুব মৃদু ভাষাতেও চীনের কোন সমালোচনা করা হয়নি, এমনকি চীন যে বাংলাদেশের উপর পাকিস্তানী বর্বরতা সমর্থন করেছিল সে জন্য কোন বেদনা বা ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়নি।

'আমি আশা করবো', শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'গণপ্রজাতন্ত্রী চীন যে দেশটি নিজেরাই যুদ্ধবাজ এবং সামন্তীয় এবং ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে তারা বাংলাদেশের মানুষের জাতীয় সংগ্রামের এই বীরোচিত সাফল্যকে স্বীকৃতি দিবে।

একজন পশ্চিমা সংবাদ প্রতিনিধি জানতে চাইছিলেন কবে নাগাদ ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ছেড়ে যাবে। জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন "ভারতীয় বাহিনী কোন দখলদার বাহিনী নয়, বরং এটি যৌথ বাহিনীর অংশ। যখন আমি চাইব তখনই ভারতীয় বাহিনী এদেশ ছেড়ে চলে যাবে।"

আর যদি কেউ শেখ মুজিবুর রহমানকে চিনে থাকেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারবেন সেই দিন খুব দ্রুতই চলে আসবে।

আরেকজন সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কি 'বৃহত্তর বাংলা' নিয়ে ভাবেন?' শেখ মুজিবুর রহমান এতোটাই খুশি ছিলেন যে তিনি ক্ষিপ্ত না হয়ে বরং হাসি মুখে উত্তর দেন, 'আমরা যা চেয়েছি তা পেয়েছি এবং আমরা এটি নিয়েই খুশি আছি।'

তিনি বলেন, 'আমরা আমাদের দেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।' হয়তো তিনি শুধু এটুকুই বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তিনি বাংলাদেশকে সুইজারল্যান্ডের মতো 'শান্তিময় ও উন্নত' দেখতে চান। কিন্তু তার এই কথা অনেকভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এমন নয় যে এ সম্ভাবনার কথা শেখ মুজিবুর রহমানের মনে আসেনি এবং হয়তো তার এই বক্তব্য যে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল তা পড়ে তিনি হেসেছিলেন।

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত বাংলাদেশের জন্য শান্তির প্রয়োজন ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ নিশ্চয়ই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্নতার নীতি বেছে নিতে চায়নি। মুক্তির সংগ্রামের সময় অনেক দেশের কাছ থেকেই বাংলাদেশ সাহায্য পেয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন বাংলাদেশের মানুষ 'ধারাবাহিকভাবেই বিশ্বের সর্বত্র মুক্তিকামী মানুষকে সমর্থন করেছে' এবং এখন তারা আশা করে বিভিন্ন রাষ্ট্র, বিশেষত যারা নিজেরা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হয়েছে তারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে।

শেখ মুজিবুর রহমানের এমন মন্তব্যের ব্যাখ্যায় কিছু কিছু বিদেশি সংবাদকর্মী মত প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশ কোন বিশেষ রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে চায় না বরং তারা কঠোরভাবে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখতে চায়। তারা আসলে বলতে চাইছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের এই বক্তব্য মূলত ভারত বিরোধী। তারা এমনটাই বিশ্বাস করতে চাইছিলেন।

কিছু কিছু লোক যারা বিশ্বাস করতেন যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে সহায়তা নিয়ে একটি সমাজবাদী রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব নয় তারা শেখ মুজিবুর রহমানের অবস্থানে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তারা মত প্রকাশ করেন যে এটি এক ধরনের পশ্চাদপসরণ এবং পূর্ব ঘোষিত নীতিগুলোর বিপরীত দিকে যাত্রা। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্তৃত্ব ছিল চূড়ান্ত এবং কেউই সকল দেশের কাছে সহায়তার আবেদনের সিদ্ধান্তটির প্রকাশ্যে বিরোধিতা করার কথা ভাবেনি।

কেউ কেউ ভেবেছিলেন হয়তো যুদ্ধের নয় মাস কারাবন্দী থাকার কারণে শেখ মুজিবুর রহমান যে কোন পক্ষ থেকে সহায়তা গ্রহণে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না।

যদিও সংবাদ সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কিছু কিছু বন্ধু রাষ্ট্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছিলেন, তারপরও তার বক্তব্যে তিনি যেসব রাষ্ট্র সর্বান্তকরণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন দিয়েছে এবং যেসব রাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করেছে তাদের মধ্যে কোন স্পষ্ট বিভাজন করেনি।

শেখ মুজিবুর রহমান এমন ব্যক্তি ছিলেন যিনি সব সময় যে কোন ঘটনার ভালো দিকটি দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন, এবং সংবাদ সম্মেলনে তিনি সৌম্য আচরণ করেন নি। কারাবন্দী অবস্থা থেকে মুক্তির মাত্র এক সপ্তাহের মতো সময় পার হওয়ার পরপরই তাকে বেশ আশান্বিত এবং উৎফুল্ল দেখে খুব ভালো লাগছিল। তারপরও কারও কারও মনে হতে পারে সামনের কঠিন সময় নিয়ে তার মনে থাকা শঙ্কাগুলো লুকানোর জন্যই হয়তো তিনি বেশ উৎফুল্ল ভাব দেখাচ্ছিলেন। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল না যে মুক্তিযুদ্ধের ফলে দেশের যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়েছে এবং সামনে যে বিপুল বিশাল প্রতিবন্ধকতা আছে তা তিনি যথাযথভাবে বুঝতে পেরেছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসার আগে পর্যন্ত বিদেশি সহয়তার বিষয়ে যে নীতি ছিল, সব দেশের কাছে সহায়তার আবেদন করার ফলে তা থেকে সরে আসা হয়েছিল, কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের এই সিদ্ধান্তকে কেউ চ্যালেঞ্জ করেনি।

সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া দেশের সাধারণত যে সব সমস্যা থাকে সেগুলোই সে সময় বাংলাদেশের সমস্যা ছিল। দেশের তাৎক্ষণিক ত্রাণ ও পুণর্বাসন সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলায় বিদেশি সহয়তা প্রত্যাশা করা গেলেও, সশস্ত্র যুদ্ধের ফলে যে সমস্ত সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলোর সমাধান বাঙালির নিজেদেরই করতে হতো।

পাকিস্তান এবং চীনের মধ্যকার শক্তিশালী বন্ধনের কারণ ছিল এ দুটো রাষ্ট্রের ভারত-বিদ্বেষ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল চীনের আত্মসম্মানের উপর একটি বিরাট আঘাত এবং চীন এই স্বাধীনতা যুদ্ধকে 'সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায়' পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসন বলে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ২১ ডিসেম্বরে নিরাপত্তা পরিষদে 'সকল সংঘাতপূর্ণ এলাকায় একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং অন্য সব ধরনের বৈরিতা বন্ধ করার দাবি জানিয়ে' একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়। যদিও ততোদিনে সব ধরনের বৈরি সংঘাতের অবসান হয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর পর চীনের পক্ষ থেকে বলা হয়, 'আরেকটি দেশ ভেঙ্গে দিতে পেরে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদীরা এবং ভারতীয় সম্প্রসারণবাদীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আছে।' আরও বলা হয় 'ঢাকার পতন' হবে তাদের 'পরাজয়ের শুরু'। ২৩ ডিসেম্বর তারিখে ভুট্টোকে লেখা টেলিগ্রামে চৌ এন-লাই বিদেশি আগ্রাসন ঠেকাতে পাকিস্তানকে সহযোগিতা করার চীনের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।

যদি চীনের মন জয় করা শেখ মুজিবুর রহমানের লক্ষ্য হয়ে থাকতো, তাহলে তিনি ভুল পথে চেষ্টা করছিলেন। যে চীন তার নিজের স্বার্থে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে মেনে নেয়নি, তারা কি করে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'একটি বিরোচিত সাফল্য' হিসেবে স্বীকৃতি দিবে? বরং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সাথে চীনের বিপ্লবকে তুলনা করা নিয়েই ক্ষুব্ধ হবে?

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ যখন শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আসেন এবং ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ যখন আবু সাইয়ীদ চৌধুরী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তার কোনটিতেই ঢাকাস্থ চীনের কূটনীতিরা উপস্থিত ছিলেন না। চাইনিজ কূটনীতিকরা শেখ মুজিবুর রহমানের সংবাদ সম্মেলনের ১০ দিন পর ২৪ জানুয়ারিতে রেঙ্গুন হয়ে দেশে ফিরে যান। তারপরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ আশাবাদী ছিলেন যে চীন খুব শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ আব্দুস সামাদ আজাদ তার সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'আমাদের মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারে।' তিনি নিশ্চিত ছিলেন না, সেই মুহূর্তটি কখন আসতে যাচ্ছে, কিন্তু অনেকেরই মনে হয়েছিল চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে। আব্দুস সামাদ আজাদ আরও বলেছিলেন, 'চীনের জনতার প্রতি আমাদের রয়েছে অগাধ শ্রদ্ধা। আমরা চাইনিজ নেতাদের প্রশংসা করি এবং আমরা তাদের বিপ্লবকেও সমর্থন করেছি।' এতো প্রশংসাও যেন যথেষ্ট হয়নি। এরপরও সামাদ স্মরণ করিয়ে দেন যে আওয়ামী লীগ সরকারই প্রথম চৌ এন-লাইকে ঢাকায় রাষ্ট্রীয় সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছিল এবং শেখ মুজিবুর রহমান চীন সফরকারী একটি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং একটি সফরকারি দলের সদস্য ছিলেন। সামাদ নিজেও চীন সফর করেছিলেন।

নিক্সনের চীন সফরের সময়, মাওলানা ভাসানী চেয়ারম্যান মাও সে তুং এবং প্রিমিয়ার চৌ এন-লাইয়ের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তার অল্প সময় পরেই মোস্তাক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার দাবি নিয়ে চীন সফর করেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান একটি জনসভায় বলেছিলেন রাষ্ট্রপতি নিক্সন বেইজিং এ বসে এশিয়ার ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবেন না।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চলার লক্ষ্যে চীনের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চাইছিল, এর কারণ অবশ্যই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু চীনের প্রতি বাংলাদেশের এই আবেদন নিবেদন অসহায় আত্মসমর্পণের সাথে তুল্য ছিল।

ইসলামিক বর্ষ গণনা শুরু হয় মোহররমের মাস দিয়ে এবং এই মাসের দশম দিনটি হলো আশুরা যেদিনটি ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়ার দিন হিসেবে পালন করা হয়ে থাকে। এই দিনটি মুসলমানদের জন্য ধর্মীয় গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার মতো যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানেও এ দিনটি ছুটির দিন। কিন্তু আশুরার দিনকে বাংলাদেশ সরকারের প্রকাশিত ছুটির তালিকায় ছুটির দিন হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়নি।

অনেক মুক্তিযোদ্ধা তাদের তিক্ততার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরপরই মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস দেশের মানুষ যে ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছিল তারপর আর মোহররম পালন করা গুরুত্বপূর্ণ মনে করছিলেন না। যে কারণেই হোক, আশুরাকে সরকারি ছুটি হিসেবে তালিকাভুক্ত করাটা ছিল একটি বিরাট ভুল। অন্যান্য ধর্মীয় বিশেষ দিবসগুলোকে ছুটি ঘোষণা করার কারণে এ ভুলটি আরও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পর পর এ ভুলটির কারণে সে রকম কোন গণ প্রতিক্রিয়া দেখা না দিলেও, আরও পরে ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ মোহাররমের দিনে এ ভুলটির প্রতিক্রিয়া ঠিকই দেখা দিত। বিভিন্ন ধর্মীয়গোষ্ঠী যারা যুদ্ধ শেষ হওয়ার ঠিক পরপর শান্ত ছিল, তারা ঠিকই এ ইস্যুতে উত্তেজনা ছড়াতো। তারা এমন সুযোগ নিশ্চয়ই হাতছাড়া করতো না এবং যে সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দিন আহমেদকে পছন্দ করতেন না এবং তুলানমূলক কট্টোরপন্থী ডানের দিকে যাদের ঝোঁক ছিল তারাও নিশ্চয়ই এসব ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলোকে এ কাজে সহায়তা করতেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় ফিরে আশুরাকে সরকারি ছুটির তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করেছিলেন।

মুহিত মজুমদার বলেছিলেন আওয়ামী লীগের ভেতরে থাকা 'অতি অসাম্প্রদায়িক' লোকেরা 'রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অসাম্প্রদায়িকতার দর্শনের সাথে ঐতিহ্য অনুসারে জনগণের নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেন নি' এবং এ ধরনের লোকেরা শেখ মুজিবুর রহমানের কাজ কঠিন করে তুলছিল। তিনি আরো বলেন, 'এই সংকটের দ্রুত সমাধান অত্যন্ত জরুরি ছিল এবং মুজিব খুব দ্রুতই এমন কিছু সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন, যা ছিল খুবই সঠিক।'

শেখ মুজিবুর রহমান একাই এসব সংকটের কার্যকর সমাধান করেছিলেন বলে মুহিত মজুমদার যে দাবি করেছিলেন তা যথার্থ। কিন্তু এ কথাও সত্য যে অতি অসাম্প্রদায়িকরা যেমন খুব দ্রুত এগোতে চাইছিলেন, তেমনি শেখ মুজিবুর রহমানও মাঝে মাঝে খুব বেশি পেছনে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের এ পশ্চাদপসরণ কৌশলগত হলেও, তাঁর এসব সিদ্ধান্তের ফলে যেসব আওয়ামী লীগার দলের কেন্দ্র থেকে এতোটাই ডানদিকে সরে ছিলেন যে তাদের অসাম্প্রদায়িক পেশা সত্ত্বেও তাদেরকে মুসলিম লীগার থেকে আলাদা করা কঠিন হতো। শেখ মুজিবুর রহমানের কারণেই তারা এমন সাহস পাচ্ছিল।

সরকারি ছুটির তালিকা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান নবান্ন দিবস যা ১৭ ডিসেম্বর পালিত হওয়ার কথা সেটিকে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন।

নবান্ন, যার অর্থ হলো নতুন ফসল, এ দিনটি পালিত হতো ফসল ঘরে তোলার উৎসব হিসেবে। পঞ্চাশের দশকে যখন পূর্ববঙ্গে কৃষক আন্দোলন বেশ জোরদার হচ্ছিল তখন এ দিনটি রাজনৈতিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে। পাকিস্তানি সরকার নিষ্ঠুরভাবে এ আন্দোলন দমন করলেও আন্দোলনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিকগুলো ঠিকই টিকে যায়।

১৭ ডিসেম্বরকে নবান্ন দিবস হিসেবে পালন করার চিন্তাটি এসেছিল বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে। এই লেখকের কাছে এসব বুদ্ধিজীবীদের একজন পরে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, 'আমরা ১৭ ডিসেম্বরকে নবান্ন দিবস হিসেবে পালন করার কথা ভেবেছিলাম। এ দিনটি ছিল নতুন আশার প্রতীকের মত। বিজয় দিবসের ঠিক পরের দিন পালন করা গেলে দিনটির মাহাত্ম আরও বৃদ্ধি পেত, নয় কি?' মুজিব বিষয়টিকে অন্যভাবে দেখায় তিনি খুবই হতাশ হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'কিছু আওয়ামী লীগ নেতা এর বিপক্ষে থাকলেও মুজিব দেশে ফেরার আগে তারা এর সরাসরি বিরোধিতা করার সাহস পাননি। মুজিবের যুক্তি ছিল, বাংলাদেশে একই সময় ফসল কাটা হয়না এবং কোথাও কোথাও ১৭ ডিসেম্বরের পর ফসল কাটা হয়। এ কথা সত্য। কিন্তু এখানে এটিই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল না। ১৯৪৮ সাল থেকেই সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। এর ফলেই সমগ্র জাতির মধ্যে জাতীয়তার বোধ জাগ্রত হয়েছিল এবং অসাম্প্রদায়িকতাকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের রাজনীতিকীকরণ হচ্ছিল। এখন সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো পশ্চাৎপসরণ করছে। আমরা যদি ওই অপশক্তিগুলোর পুনর্জাগরণ না চাই তাহলে এখনই আমাদের জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিজেদের সংগ্রামের প্রতি সৎ থাকতে হবে। কিন্তু মুক্তি সংগ্রামের সাংস্কৃতিক দিকটি অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতাই বুঝে উঠতে পারেন নি। এমনকি যে বিপ্লব ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে তাও তাদের কাছে বোধগম্য হয়নি।'

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফেরার আগে পর্যন্ত চুপচাপ ছিলেন এমন একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেছিলেন, 'নবান্ন উৎসব পালন করার পুরো ধারণাটির মধ্যেই কম্যুনিস্ট সুর পাওয়া যায়। কিছু কিছু কম্যুনিস্ট দিনটিকে সরকারি ছুটি ঘোষণার পায়তারা করছিল। এতোদিন পর্যন্ত তারা সরকারি নীতি তৈরি করেছে। তাজউদ্দিন আহমেদ সম্পূর্ণ তাদের প্রভাবের মধ্যে ছিলেন।'

অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা বামপন্থার দিকে ঝুঁকে থাকলেও, অনেক আওয়ামী লীগ নেতাই কট্টর বাম-বিরোধী ছিলেন, যদিও তারা প্রায়ই সমাজতন্ত্রের কথা বলতেন।

যখন শেখ মুজিবুর রহমানের কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী প্রবাসী সরকারের সদস্যরা দেশ স্বাধীন হওয়ার ছয়দিন পরে ঢাকায় আসার ফলে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল সে কথা জানান। জবাবে মুজিব চোখ টিপে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি হলে জেনারেল অরোরা'র আগে ঢাকা পৌঁছাতাম।'

শেখ মুজিবুর রহমান থাকলে আসলেই তিনি তাই করতেন, তিনি ছিলেন অসম সাহসী ব্যক্তিত্ব।

তাহলে কেন তিনি ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ তার দলের নেতাদের ঢাকা ছেড়ে নিজ নিজ এলাকায় যাওয়ার পরামর্শ দিয়ে নিজে ঢাকায় থেকে গিয়েছিলেন? এ প্রশ্ন হয়তো কখনোই থামবে না।

সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট ১৮ জানুয়ারি ১৯৭২-এ একটি টিভি সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমানকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'আপনি হয়তো কোলকাতা যেতে পারতেন।' জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে হলে আমি যে কোন জায়গায় যেতে পারতাম...।' কিন্তু তিনি কিভাবে নিজের জনগণকে ছেড়ে যেতেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন তাকে খুঁজে না পেলে পাকবাহিনী পুরো ঢাকা তছনছ করে ফেলতো।

এটা কোন বিলম্বিত ভাবনা ছিল না।

২৫ মার্চ ১৯৭১-এ সন্ধ্যায় পাকসেনা কমান্ডোরা শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িটি ঘিরে ফেলে এবং বাড়িটির উপর তীব্র আলো ফেলে।

শেখ মুজিবুর রহমানের একজন আত্মীয় বলেছিলেন, 'যতোক্ষণ পাকসেনারা নিশ্চিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান বাড়িটির ভিতর ছিলেন, ততক্ষণ তারা অন্য নেতাদের খুঁজতে যায়নি। বঙ্গবন্ধু তাঁর নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাকি নেতাদের রক্ষা করেছিলেন। নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তিনি মহৎ সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন। এরপরও তার এই নিঃস্বার্থ কাজের প্রশংসা না করে অনেকে এর সমালোচনা করে থাকেন।'

২৫ মার্চের সে রাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়িতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়ে বিতর্ক চলতেই থাকে। কিন্তু এটা বলা খুবই অন্যায় যে মুজিব সে রাতে

বাড়িতে থেকে গিয়েছিলেন কারণ তিনি ভেবেছিলেন সেটা করাই তার জন্য নিরাপদ হবে।

১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথমবারের মত সেনাশাসন কায়েম হওয়ার পর থেকেই সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার আতঙ্ক শেখ মুজিবুর রহমানের মনে ছিল। ১৯৭১ এর মার্চে তিনি ক্রমাগত সেনাবাহিনীর হাতে নিহত হওয়ার কথা বলছিলেন। অনেকবারই তিনি জনতাকে তার অনুপস্থিতিতেও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রায়ই বলতেন, 'কারাগার আমার কাছে দ্বিতীয় গৃহের মতো।' শেখ মুজিবুর রহমানের স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠ কন্যা শেখ হাসিনা যখনই তাঁর গ্রেফতার হওয়া আশঙ্কা থাকতো তখনই তার ব্যাগ আগে থেকেই গুছিয়ে রাখতেন, এবং এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটতো। শেখ মুজিবুর রহমান একজন সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী নেতা ছিলেন, কিন্তু তাকে গোপনে থেকে রাজনীতি করছেন এমন নেতা হিসেবে কল্পনা করাই কঠিন ছিল। যখন পঞ্চাশের দশকে তার কিছু শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে পালিয়ে গিয়ে গোপনে রাজনীতি চালিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন, জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমি মণি সিংহ নই।'

মণি সিংহ নামের একজন বিখ্যাত কম্যুনিস্ট নেতা বেশ কয়েক বছর আত্মগোপনে থেকে রাজনীতি চালিয়ে যেতে পেরেছিলেন কারণ পাকিস্তানি গোয়েন্দা বাহিনীর খুব কম লোকই তাকে চিনতো। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালিদের তুলনায় দীর্ঘকায় ছিলেন এবং এমন কি পঞ্চাশের দশকেও এতোটাই জনপ্রিয় ছিলেন যে তারপক্ষে লুকিয়ে থেকে রাজনীতি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এছাড়াও কিছু মানসিক দিকও এখানে বিবেচ্য ছিল। শেখ মুজিবুর রহমান আত্মগোপনে যাওয়া বা নির্বাসিত হওয়ার চেয়ে মৃত্যুবরণ করতে প্রস্তুত ছিলেন।

২৫ মার্চের রাতে বা পরদিন সকালে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হতে পারতো। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি অংশ শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে চাইছিল, কিন্তু অনেক পাকিস্তানি জেনারেল ভাবছিলেন সেটা খুবই বিপদজনক একটি কাজ হবে।

ঢাকা সেনানিবাসে অবস্থিত আদমজী স্কুলে শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ২৫ মার্চ রাতে। পরদিন ২৬ মার্চ সকালে তাকে যখন পাহারা দিয়ে বাথরুমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তখন একটি বুলেট তার শরীর ঘেঁষে দেয়ালে আঘাত করে। তার পাহারায় থাকা সেনারা তখনই তাকে ঘিরে ফেলে।

এর অল্প পরেই শেখ মুজিবুর রহমানকে ফ্যাগস্টাফ হাউসে সরিয়ে নেয়া হয় এবং তিনদিন পর বিমানে করে করাচি নিয়ে যাওয়া হয়।

যখন শেখ মুজিবুর রহমানের বিষয়ে কি 'ব্যবস্থা' নেয়া হবে তা নিয়ে 'জটিলতা' দেখা দেয় তখন সাদিক সালিকের বন্ধু মেজর বিলাল এক প্রশ্ন করেন কেন তিনি তাকে তাৎক্ষণিকভাবে হত্যা করেননি। জবাবে বিলাল বলেন, 'মুজিবকে জীবিত গ্রেফতারের জন্য জেনারেল মিথা ব্যক্তিগতভাবে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।'

দেশে ফেরার পর ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত'র পুত্র সঞ্জীব যখন শেখ মুজিবুর রহমান তার সাথে দেখা করতে যান, তখন শেখ মুজিবুর রহমান তার উপর ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, 'তুমি তোমার বাবাকে ফেলে কোলকাতায় চলে গিয়েছিলে। তুমি তাকে ফেলে না গেলে তার নিহত হতে হতো না।' এটি একটি অমূলক অভিযোগ ছিল, সঞ্জীব যদি ঢাকায় থাকতেন তাহলে তাকেও তার বাবা ও ভাইয়ের মতো পাকবাহিনীর হাতে খুন হতে হতো। কিন্তু কি জবাব দেবেন তা হয়তো সঞ্জীব ঐ মুহূর্তে ভেবে পান নি। কিন্তু সঞ্জীবের কন্যা বুয়া এটা সহ্য করতে পারেন নি। তিনি ক্ষোভান্বিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমানকে বলেছিলেন, 'আপনি পাকবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন না করলে আমার দাদা আর কাকাকে নিহত হতে হতো না।' বঙ্গবন্ধুর সাথে এভাবে কথা বলায় সেখানে উপস্থিত অনেক মন্ত্রী ওই মেয়েটির দিকে কড়া চোখে তাকাচ্ছিলেন। সঞ্জীবও তাঁকে থামাতে চাইছিলেন, কিন্তু মুজিব আন্দোলিত হয়েছিলেন। তিনি সঞ্জীবকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার বাবাকে হারিয়েছ আর আমি আমার ভাইকে।'

১৯৭২ সালে ঢাকায় একটি সংক্ষিপ্ত সফর শেষে করাচি থেকে প্রকাশিত ডন পত্রিকার সাংবাদিক মাজহার আলী খান লিখেছিলেন, 'যদিও কেউ এটা স্বীকার করছে না তারপরও এটাই সত্য যে বঙ্গবন্ধু সরাসরি মুক্তির সংগ্রামে অংশ না নিয়ে পাকিস্তানের কারাগারে থাকায় দেশবাসী ঐ নয় মাস মানসিকভাবে পঙ্গু অনুভব করেছিল।' তিনি আরও যোগ করেছিলেন, 'এই সত্যটি সামনে নিয়ে এসেছে তুলনামূলকভাবে বেশি যুদ্ধংদেহী ছাত্র নেতারা।'

'কারাগারে থাকা' শব্দগুলো এখানে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল যে মনে হতে পারে শেখ মুজিবুর রহমান আরাম আয়েসের মধ্যে ছিলেন, যা খুবই পক্ষপাতমূলক আচরণ। মাজহার আলী খান হয়তো কোন অসাধু উদ্দেশ্যে এভাবে লেখেন নি, তারপরও তিনি সম্ভবত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যারা যুদ্ধের নয় মাস মুজিব নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করেছেন বলে প্রচার করে তাদেব বক্তব্যকে সমর্থন করেছিলেন।

নয় মাস কনডেম সেলে কারাবন্দী থাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের ওজন ২০ কেজি কমেছিল এবং আট জানুয়ারি যখন শেখ মুজিবুর রহমান রাওয়ালপিণ্ডি থেকে লন্ডন পৌছান তখনও তিনি ক্লান্ত আর বিধ্বস্ত ছিলের না। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমানের যে ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল তার তুলনায় স্বাস্থ্যের এ অবনতি সামান্যই।

দুই মাসের বেশি সময় কনডেম সেলে বন্দী থাকার ফলে অনেক সময় বন্দীরা মানসিকভাবে বিকারগ্রস্ত হয়ে যায়। এই দীর্ঘ কারাবাস শেখ মুজিবুর রহমানকে ভেঙ্গে না ফেললেও, যুদ্ধে অঙ্গ হারানো একজন সৈনিকের মতোই তিনিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। কনডেম সেলে থেকেছেন এমন লোকের পক্ষেই শুধু ওই কষ্ট বোঝা সম্ভব।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এ যখন শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার সংবাদ জানা যায় তখন ভুট্টো তাঁর আনন্দ পুরোপুরি গোপন করতে পারেন নি। কিন্তু তিন বছর পর যখন ভুট্টো নিজে মৃত্যুর অপেক্ষায় কারাগারে বন্দীর জীবন যাপন করছিলেন, তখন তাঁর শেখ মুজিবুর রহমানের কথা মনে পড়েছিল। তখন হয়তো তাঁর বোধদয় হয়েছিল।

১৯৭৮-এর ৯ অক্টোবরে ভুট্টো রাওয়ালপিণ্ডির জেলা কারাগারের সুপারিনটেনডেন্টকে লেখা চিঠিতে লিখেছিলেন, '১৫ থেকে ২০ জন সৈনিক সারাদিন পর্যায়ক্রমে কুচকাওয়াজ করে। তাদের ছন্দবদ্ধ পায়ের শব্দ এবং মাটি খোড়ার শব্দ ইত্যাদির কারণে সামান্য একটু ঘুমানোও অসম্ভব। এসবের কারণে ১৯৭২ সালে মুজিব তাঁর কারাবন্দী অবস্থায় যে দুর্দশার বর্ণনা করেছিলেন সেগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। তিনি বলেছিলেন এটি তাকে মানসিকভাবে দুর্বল করার কৌশলের অংশ ছিল।'

সাত বছর আগে শেখ মুজিবুর রহমান যা বুঝতে পেরেছিলেন তা এতোদিন পর ভুট্টো বুঝতে পেরেছিলেন।

এরপরও ভুট্টোর অবস্থা শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়ে ভালো ছিল বলতে হবে, কারণ তিনি ছিলেন নিজের দেশে, চাইলেই তাঁর স্ত্রী আর কন্যার সাথে দেখা করতে পারছিলেন এবং কারাগারে শুধু লিখতে পারছিলেন তাই নয় সে লেখা তিনি পাচারও করতে পারছিলেন। নয় মাস ধরে শেখ মুজিবুর রহমান তার স্ত্রী আর সন্তানদের কোন খবরই পান নি।

২৮ জানুয়ারি ১৯৭২ নিউইয়র্ক টাইমস ছেপেছিল, 'এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে মুজিব বাংলাদেশে একটি কার্যকর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন। সারাদেশে গেরিলা যোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ, ভারত থেকে লাখো শরণার্থীর ফেরৎ আসা এবং বাংলাদেশ থেকে পর্যায়ক্রমে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহার– এসব থেকে নতুন সরকারের সক্ষমতা ও কার্যকারিতা বোঝা যায়।'

এটি ছিল তখনকার পরিস্থিতির নিরপেক্ষ মূল্যায়ণ। মাত্র চল্লিশ দিন আগে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া একটি দেশের কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু প্রত্যাশা করা ঠিক হতো না।

দেশ থেকে প্রথম দফা ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার শেষ হয়েছিল যথার্থ সময়েই, ১৯৭২-এর জানুয়ারির শেষদিকে, ৩০ হাজার ভারতীয় সেনা দেশে ফিরে যায়।

এরপরও আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের ট্যারেন্স খু একজন তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধার বরাত দিয়ে ছাপেন, 'আমি বিদায় বলবো না। তুমি এক বছরের মধ্যেই আবার ফিরে আসবে– যখন আমাদেরকে ভারতীয় সেনাদের তাদের দেশে ছুঁড়ে দেয়া শুরু করতে হবে।'

খু আর তার মতো আরও পশ্চিমা সাংবাদিক যারা ভারতীয় সেনা আর মুক্তি বাহিনীর মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ নিয়ে প্রতিবেদন লিখতে হবে বলে আশা করছিলেন তাদের হতাশ হতে হয়েছিল। তারা যতোটা কল্পনা করতে পারেন তার চেয়ে অনেক দ্রুতই ভারতীয় সেনারা নিজ দেশে ফেরত গিয়েছিল।

আমার ভালোবাসা নিও

শেখ মুজিবুর রহমান জানতেন ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশেষভাবে অবদান রেখেছিল, তার প্রতি এ রাজ্যগুলোর বিশেষ দাবি করার অধিকার ছিল। দেশে নানা রকম সমস্যা সত্ত্বেও ঢাকায় ফেরার মাত্র চার সপ্তাহের মাথায় শেখ মুজিবুর রহমান কোলকাতা সফর করেন।

যখন ১৯৭২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি মুজিব কোলকাতায় দু'দিনের সফরে যান তখন হাজারো মানুষ তাকে উষ্ণ হৃদয়ে অভ্যর্থনা জানাতে আসে। কোলকাতার মানুষের কাছেও তিনি একজন নায়ক ছিলেন। যে মানুষটি তার নিজের দেশের মানুষকে স্বাধীন করেছেন এবং পুরো উপমহাদেশের দৃশ্যপট বদলে দিয়েছিলেন তার প্রশংসা ছিল কোলকাতাবাসীর মুখে মুখে।

শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাগত জানাতে যে জনতার ঢল নেমেছিল তা দেখে সাংবাদিকদের ১৯৫৫ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে যখন বুলগানিন এবং ক্রুশ্চেভ কোলাকাতা সফর করেছিলেন সে সময়ের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু এর আগে কোন সফরকারী নেতা কোলাকাতায় শেখ মুজিবুর রহমানের মতো অভ্যর্থনা পাননি।

শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কোলকাতায় সেদিন যে নৈশভোজ আয়োজন করেছিলেন সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমার জীবনের শুরুর দিকে ছাত্র অবস্থায় এবং পরবর্তীতে ছাত্রনেতা থাকা অবস্থায় আমি এ শহরে কিছু চমৎকার সময় কাটিয়েছি। ওই সময়েই আমি নিজেকে গড়ে তুলেছিলাম বলে মনে করি।'

১৯৪৭-এ দেশ বিভাগের পর শেখ মুজিবুর রহমান কোলাকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসেছিলেন, তারপরে তিনি নেতা হিসেবে আরও অনেক পরিপক্ক হয়েছিলেন। তারপরও তার রাজনীতিতে একটি ধারাবাহিকতা ছিল, তিনি সব সময়ই তাঁর জনগণের পক্ষে লড়াই করেছেন।

কোলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ৬ ফেব্রুয়ারির জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান 'ভারতের মহান জনগণ' এবং ভারত সরকারের কাছে মুক্তিযুদ্ধের সময় যে ১০ মিলিয়ন লোক শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল তাদের 'থাকার জায়গা, খাদ্য, বস্ত্র এবং আশ্বাস' দেয়ার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেছিলেন 'এ ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না', আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় তিনি বলেছিলেন–

'নিঃস্ব আমি, রিক্ত আমি
আমার শুধু প্রেম আছে, তুমি তাই নাও।'

এই সহজ সরল দু'টি চরণে যা বলা হয়েছে সেই আবেগই সেদিন শেখ মুজিবুর রহমান অনুভব করেছিলেন। এ কথাগুলো সরাসরি শ্রোতাদের হৃদয়ে পৌঁছেছিল।

শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের মানুষের শুধু প্রশংসা করেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি আলাদা করে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মেঘালয় এবং আসাম, এ রাজ্যগুলোর কথা বলেন যারা আশ্রয় দেয়ার পাশাপাশি নিজেদের খাবার বাংলাদেশিদের সাথে ভাগাভাগী করে খেয়েছেন এবং বাংলাদেশিদের ক্রমাগত আশ্বস্ত করে গিয়েছেন। এমন সর্বাত্মক সহযোগিতা ছিল নজিরবিহীন এবং তা কখনোই ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বাস করতেন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার বন্ধুত্ব অটুট এবং এটি চিরকাল এ রকমই থাকবে।

'আমার দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িক নয়' শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানি অপশক্তিগুলোই এদেশে সাম্প্রদায়িকতাকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। তিনি ভারতের জনগণের কাছে সাম্প্রদায়িকতার শেষ শিকড়টুকুও উপড়ে ফেলতে আহবান জানান।

নিজের অবস্থান সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা রাখেন এমন ব্যক্তির পক্ষেই প্রকৃত অর্থে কৃতজ্ঞ হওয়া সম্ভব। শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশের প্রতি এবং নিজের প্রতি আস্থার কারণেই তিনি জানতেন যে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ফলে বাংলাদেশের জাতীয় চেতনাকে অপমান করা হবে না।

একই সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় চেতনার উপরে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। ১৯৭২ এর ৬ ফেব্রুয়ারিতে কোলকাতার ওই জনসভায় তিনি বলেছিলেন, 'অসাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র এগুলোই দু'টি দেশের প্রধানতম আদর্শ। আমাদের দুই দেশের বন্ধুত্বও এসব আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই আমাদের সুসম্পর্কে চির ধরাতে পারবে না।'

বাংলাদেশ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারক। কিন্তু জাতীয়তাবাদের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে সবার কাছে পরিস্কার করে দিয়েছিলেন যে জাতীয় স্বার্থ সব সময়ই তার কাছে অগ্রগণ্য হবে।

এই কোলকাতা সফরের সময়ই শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে আলাপ হয় যে ভারতীয় বাহিনী ২৫ মার্চ ১৯৭২-এর মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে সরিয়ে নেয়া হবে। বাংলাদেশ যেদিন প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে সেদিন কোন বিদেশি সেনাই দেশটিতে থাকবে না।

যেসব ভারতীয় সেনা কর্মকর্তা দেশে ফেরার জন্য উদগ্রীব হয়েছিলেন তাদের নিশ্চয়ই এ সিদ্ধান্ত জানতে পেরে স্বস্তিবোধ হয়েছিল। এদের মধ্যেই একজন লি লিসেজকে বলেছিলেন, 'আমাদের সুনাম এখনও নিঃশেষিত হয়ে যায়নি, কিন্তু আমরা যথার্থ সময়েই এদেশ ছেড়ে যাচ্ছি।' আরেকজন পশ্চিমা সাংবাদিক

একজন ভারতীয় জেনারেলের বক্তব্য হিসেবে ছাপেন, 'ইস্টারের ছুটিতে জওয়ানদের নিয়ে বাড়িতে যেতে পেরে আমি খুবই খুশি।' নিশ্চয়ই কোন ভারতীয় জেনারেল এমন কথা বলতে পারেন না, কিন্তু হয়তো ওই সাংবাদিক কোরিয়ায় যুদ্ধ চলাকালীন জেনারেল ম্যাক আর্থার যেমন 'ক্রিসমাসের ছুটিতে বাড়িতে যাওয়ার' কথা বলেছিলেন সে কথারই প্রতিধ্বনি করেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার একপক্ষ কালের মধ্যে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহারের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তা সমাপ্ত হয় ১২ মার্চ ১৯৭২-এ নির্ধারিত সময়ের চেয়ে ১৩ দিন আগে।

১২ মার্চ ১৯৭২-এ ভারতীয় সেনাদের জন্য দেয়া বিদায়ী ভাষণে শেখ মুজিবুর রহমান অনেক আবেগে ভরা একটি বক্তব্য রেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমাদের সবচেয়ে বিপদের সময় আপনারা যে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তার কথা আমরা সর্বোচ্চ কৃতজ্ঞতাসহ স্মরণে রাখবো সব সময়।' মুক্তি বাহিনীর পাশে থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর যে বীর কর্মকর্তা ও জওয়ানরা তাদের জীবন দিয়েছিলেন তাদের প্রতি শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চালানো ধ্বংসযজ্ঞের পর এদেশের মানুষ নিঃস্ব হয়ে যাওয়ায় তারা ভারতীয় বাহিনীর প্রতি যতোটা আতিথেয়তা দেখানো প্রয়োজন ততোটা করতে পারেনি। কিন্তু আপনাদের জন্য তাদের মনে রয়েছে ভালোবাসা। আমি আপনাদের আহবান করবো আপনারা আপনাদের হৃদয়ে বাংলাদেশের মানুষের এই ভালোবাসা বয়ে নিয়ে যাবেন।'

একজন পশ্চিমা সংবাদকর্মী বলেছিলেন, 'এমনকি ভারতীয়দের রুচির জন্যও কিছু কিছু রান্না অত্যন্ত মসলাদার হয়ে যায়। এর আগে বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনারা অনেকদিন থাকবে বলে তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তিনি মনে কষ্ট পেয়েছিলেন, আর এই সস্তা কথাটি বলে তিনি সান্ত্বনা খুঁজছিলেন।

বাংলাদেশে পাকিস্তানিরা প্রাথমিক ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর একটি বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধি দল পরিস্থিতি মূল্যায়নের জন্য এখানে আসে এবং তাদের মতে কয়েকটি শহরের অবস্থা ছিল 'পারমাণবিক আক্রমণের পরবর্তী সকালের মতো।' পরবর্তী নয় মাসের পাকিস্তানি দখলদারিত্বের সময় এ ধ্বংস আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

টাইম পত্রিকা তাদের ১৭ জানুয়ারি ১৯৭২-এর মূল প্রতিবেদনে ছেপেছিল, এক মাস আগে পাকিস্তানি বাহিনী আত্মসমর্পণের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেশটিতে ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহত ছিল। যুদ্ধের শেষ দিকে পশ্চিম পাকিস্তানি বৃহৎ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলো কার্যত তাদের প্রায় সকল অর্থ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার করে নেয় এবং এদের অনেকেরই এখানে অনেক বকেয়া ছিল।' ফ্যাক্টরীর গুদামগুলো

নিঃশোষিত হয়ে গিয়েছিল এবং খুচরা যন্ত্রাংশের তীব্র অভাব ছিল। পাকিস্তান সেনারা এমনকি যখনই সুযোগ পেয়েছিল তখনই ব্যাংক নোটও ধ্বংস করে দিয়েছিল। টাইমস সাময়িকীর ভাষায়, 'বন্দরগুলো বন্ধ হওয়ার আগেই ব্যক্তিগত গাড়ি জব্দ করা হয়েছিল এবং গাড়ির বিক্রয় কেন্দ্রগুলো থেকে গাড়ি তুলে নেয়া হয়েছিল।'

কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক এবং আধা-সামরিক বাহিনীর সকল লুটপাটের কথাই ভুলে যাওয়া হয়েছিল দ্রুতই। অনেকে এমন প্রশ্ন করেছিলেন যে এতো অল্প সময়ে পাকিস্তানিরা এগুলো কিভাবে পাচার করেছিল।

এমনকি যে সব পশ্চিমা সাংবাদিক ভারতীয় অফিসারদের প্রশংসা করেছিলেন তারাও প্রতিবেদনে লিখেছিলেন যে, ভারতীয় সৈনিকেরা পাট, ধান, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, গাড়ি, টিভি সেট, রেফ্রিজারেটর, কার্পেট লুটে নিয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ তাদের পক্ষে বহন করা সম্ভব এমন সবকিছুই তারা নিয়ে গিয়েছিল।

এমন প্রতিবেদনগুলো বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল এবং এমন কি 'বুদ্ধিজীবীদের' মধ্যেও কোন যাচাই ছাড়াই এসব সংবাদ বিশ্বাস করেছিলেন। এর মধ্যে কিছু সংবাদ নিশ্চয়ই সত্য ছিল, কিন্তু অনেকগুলোই ছিল অতিরঞ্জিত। বদরুদ্দীন উমরের ভাষায়, 'এটা হতেই পারে এসব খবরের অনেকগুলোই মিথ্যা এবং কিছু কিছু নিছক গুজব।' এসব খবরের মধ্যে কিছু কিছু শুধুই গুজব নয়, বরং এগুলো ছিল অসৎ উদ্দেশ্যে তৈরি করা গল্প।

ওমর তার পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন, 'বর্তমান ভারতীয় সেনাবাহিনী তার গঠন এবং প্রকৃতিতে নিশ্চয়ই সাধু সন্তদের নিয়ে গঠিত কোন সংগঠন নয়।' তিনি বলেছিলেন যে, ভারতীয় বাহিনীকে প্রথমে স্বাধীনতা নিয়ে আসার জন্য ব্যাপক প্রশংসা করে জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছিল এবং এ সুযোগে 'তারা হয়তো অতিরিক্ত অনেক কিছু করে ফেলেছিল এবং তাদের এসব কর্মকাণ্ড দেখে দেশবাসীর পাকবাহিনীর অত্যাচারের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল, ফলে মানুষ হয়তো গুজব ছড়াচ্ছিল।'

কোন সেনাবাহিনী, তার বৈশিষ্ট্য বা গঠন প্রক্রিয়া যেমনটিই হোক না কেন, সাধু সন্তদের সংগঠন হয় না। তাছাড়া সেনাবাহিনীতে সাধু সন্তদের থাকার কারণটাই বা কী?

পাকিস্তানি দখলদারদের তুলনায় অতিরিক্ত করা মানে খুন, ধর্ষণ, অত্যাচার, লুটপাট, জ্বালাও-পোড়াও।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিশেষত প্রথম দুই সপ্তাহ ভারতীয় বাহিনী যে সুযোগের মধ্যে ছিল সে তুলনায় তারা যথেষ্ট ভদ্র আচরণ করেছিল। পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে ভারতীয় বাহিনীকে তুলনা করাটাই ছিল জঘন্য অন্যায়।

'একটি নতুন ভারত' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে সানডে টেলিগ্রাফে ১২ ডিসেম্বরে ছাপা হয়, যে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করা হয়েছিল তা থেকে 'পরোক্ষ সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে আসা হয়েছে'। সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত মতানুসারে, 'উপমহাদেশে ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজনের সমাপ্তি ঘটার প্রক্রিয়াটি এখান থেকে শুরু হয়েছিল।'

পত্রিকাটিতে আরও ছাপা হয়, 'এখন দিল্লী যদি হত বিহ্বল পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে তাহলে হয়তো খুব শিগগির-ই সিন্ধু আর পাঞ্জাবের মুসলমানরাও মহান ভারত পরিবারের অংশ হতে চাইবে, এই পরিবারটি থেকেই ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় (এ অংশে বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল) ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের বিতর্কিত স্বপ্নদ্রষ্টা জিন্নাহ এ দুটি অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন।

কিন্তু দ্বি-জাতি তত্ত্ব ব্যর্থ হয়েছে– এটা মেনে নিতে তখনো অনেক পশ্চিমা সাংবাদিক প্রস্তুত ছিলেন না। তারা তখনো সাম্প্রদায়িকতার সুর বাজিয়ে যাচ্ছিলেন এবং এ দিয়ে যা অর্জন সম্ভব তা করে নিচ্ছিলেন, এ কারণেই মাঝে মাঝে তারা ভয়ঙ্কর সব মিথ্যা প্রচার করছিলেন।

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২-এ আমেরিকান ফোর্সেস নেটওয়ার্ক (এএফএন) রেডিও তাদের ৮.৩০-এর খবরে বাংলাদেশের নতুন শাসকগোষ্ঠীকে হিন্দু বলে চিহ্নিত করে। এ ভুল অসতর্কতা বশত হয়নি। এটি বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা অভিযানের অংশ ছিল।

এই সংবাদ সম্প্রচারে বলা হয়েছিল :

'দশ হাজারেরও বেশি লোককে এই নবগঠিত রাষ্ট্রটিতে গ্রেফতার করা হয়েছে। একজন সরকারি মুখপাত্র বলেছেন তাদেরকে পাকবাহিনীকে সহায়তা করার অপরাধে সন্দেহ বশত গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে প্রতিটি মামলা খতিয়ে দেখা হবে। এই সন্দেহভাজনরা সবাই মুসলিম... আর নতুন শাসকরা হিন্দু... তাদের মধ্যে কোন ধরনের সম্পর্ক নেই।'

এই সম্প্রচারের শেষ লাইনটি প্রচারের পেছনে যে অসাধু উদ্দেশ্যটি বুঝতে না পারার কোন কারণ নেই।

এখানে ১৪ জানুয়ারি পাকিস্তান রেডিও থেকে প্রচারিত আরেকটি বাংলা সম্প্রচার এখানে তুলে ধরা জরুরি: 'বাংলার মুসলমানরাই সর্ব প্রথম উপমহাদেশে হিন্দুদের একচেটিয়া সুফলভোগের প্রতিবাদ করেছিল। সে কারণেই হয়তো আজ তাদেরকেই হিন্দু, রাশিয়ান, ব্রিটিশ এবং ইহুদিদের যৌথ চক্রান্তের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হতে হয়েছে। 'পূর্ব পাকিস্তানে'র উপর আক্রমণের পুরো নকশাটিই করেছেন জায়নবাদী ইহুদি জেনারেল জ্যকব, যাকে এ জন্য ইসরায়েলে প্রশিক্ষণ

দেয়া হয়েছে।' পাকিস্তানি রেডিও-র ধারাভাষ্যকার আরও বলেন, 'কিন্তু আমাদের বিশ্বাস খুব শিগগির-ই শুধু অবাঙালি হওয়ার দোষে যে বিপুল সংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে, বোমা মেরে নির্দোষ শিশু এবং বিশ্বস্ত পাকিস্তানিদের খুন করা হয়েছে তার প্রতিশোধ নিতে বাংলার মুসলমানরা জেগে উঠবেন।'

নির্লজ্জ মিথ্যাচার এরচেয়ে বেশি করা সম্ভব নয়।

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের আগে শেখ মুজিবুর রহমান দশ বছরেরও বেশি সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। এমনকি তাকে একাকী বন্দী করেও বাইরের দুনিয়া থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়নি, যতক্ষণ তাকে বাংলাদেশের কারাগারে আটক করা হয়। যখন তাঁর বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা চলমান ছিল তখন এক সাংবাদিক ভয়ে তার সম্ভাষণের উত্তর না দেয়ায় তিনি বলেছিলেন, 'যদি বাংলাদেশে থাকতে হয় তাহলে আপনাকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কথা বলতেই হবে।' এমনই ছিল তাঁর আত্মবিশ্বাস।

একজন কম্যুনিস্ট যিনি মুজিবের সাথে এক বছরেরও বেশি সময় কারাগারে ছিলেন, এ লেখককে বলেন, 'কারাগারেও তিনি একজন নেতা ছিলেন। তিনি কারও উপর নিজেকে চাপিয়ে দিতেন না। তিনি আমাদের প্রেরণা দিতেন এবং আমরাও তাঁর উপর আস্থা রাখতাম। তিনি সহজেই মিশতে পারতেন। যখন তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় তখন কারাগারের কর্মীদের মধ্যে সবাই খুশি হলেও, দুই একজনের চোখে জল ছিল। তিনি প্রচণ্ড স্নেহ পরায়ন এবং দয়ালু ছিলেন। কারাগার মানুষের জন্য এক কঠিন পরীক্ষার মতো, একজন মানুষের সব গুণ আর দুর্বলতা কারাগারে পরীক্ষার মুখে পড়ে যায়। আমার দীর্ঘ কারাবাসের সময় আমি শেখ মুজিবুর রহমানের মতো কাউকে পাইনি। আমাদের কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যে এমন কেউ থাকলে খুব চমৎকার হতো।'

কিন্তু যে নয় মাস শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানে তার পরিবারের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কারাবাস করার পরও শেখ মুজিবুর রহমান যে তিক্ততাপূর্ণ হয়ে ওঠেন নি এবং তখনো যে কোন কিছুরই ভালো দিকটি দেখতে পারছিলেন– এটি ছিল সত্যিই একটি কাকতালীয় ব্যাপার।

শেখ মুজিবুর রহমান সব সময়ই বন্ধু আর ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতে ভালোবাসতেন। পাকিস্তানি কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায় তিনি যে বন্ধু আর ভক্তদের সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন মুক্তির পর তিনি তা পুষিয়ে নিচ্ছিলেন। তিনি সমস্ত প্রধানমন্ত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে সহজে কাছে পাওয়া যায় এমন ছিলেন এবং দেশের সব স্থান থেকেই লোকে তার কাছে আসছিল। একজন বিখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতা একবার প্রশ্ন করেছিলেন, 'সারাক্ষণ জনগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকলে তিনি কাজ করেন কখন?'

শেখ মুজিবুর রহমান জনগণকে ভালোবাসতেন, কিন্তু তারচেয়েও বড় বিষয় হলো তিনি কাউকেই ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। তিনি বলতেন, 'ওদেরকে দেয়ার মতো আমার কাছে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই।'

মুজিব ছিলেন একজন স্নেহপ্রবণ পিতা আর অনুরক্ত পুত্র। তার দীর্ঘ কারাবাস নিশ্চয়ই তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু এ নিয়ে কথা বলা তাঁর পছন্দ ছিল না। একজন সাংবাদিক একবার তাঁকে ভুল করে জিজ্ঞেস করেছিলেন মানুষের সঙ্গ যার এত পছন্দ সেই শেখ মুজিবুর রহমান কি করে কারাগারে তাঁর দীর্ঘ একাকীত্ব কাটিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ কালো হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেছিলেন। ওই সাংবাদিক বুঝতে পারেন নি যে তিনি কাঁচা ঘায়ে আঘাত করেছিলেন।

১৯৭২-এর ১০ জানুয়ারি মুজিব তাঁর ভাষণে যখন দেশদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁর বিচার চলছিল তখন যারা তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাদের চিনি, আপনারাও তাদের চিনেন।' কিন্তু দীর্ঘ নয় মাসের কারাবাসও শেখ মুজিবুর রহমানের মনে তিক্ততা সৃষ্টি করেনি, এবং যারা শেখ মুজিবুর রহমানকে ঠিক মতো চিনতেন তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে যারা সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাদের তিনি কোন রকম দণ্ড দিবেন না।

শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এমন একজন সাংবাদিক শেখ মুজিবুর রহমান ফেরার আগে তার চাকরি হারিয়ে ছিলেন। যখন ওই সাংবাদিকের শ্বশুর তার পক্ষে শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তদবির করেছিলেন তখন সাংবাদিক তাঁর চাকরি ফিরে পান। শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়া আরেকজন ব্যক্তি যখন সরাসরি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান তাকে উপদেশ দেন, 'কয়েক দিন চুপচাপ থাকুন।' মুজিব বলেছিলেন, 'আপনার প্রতি আমার কোন অভিযোগ নেই, কিন্তু অন্যদের কথা আমি বলতে পারি না।' এক সময় এই ব্যক্তিটির সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা ছিল।

কিন্তু মুক্তিবাহিনী সে সময় যুদ্ধংদেহী মনোভাবে ছিল এবং যারাই পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিয়ে নিতে পারতো।

শেখ মুজিবুর রহমান তার মাথার চেয়ে হৃদয়ের দাবিই বেশি শুনতেন। তিনি যেমন দ্রুত ক্ষিপ্ত হতেন তেমনি দ্রুতই আবার ক্ষমা করতেন এবং যার প্রতিই তিনি কখনো ক্ষুব্ধ আচরণ করেছিলেন তার প্রতি তিনি পরবর্তীতে দয়া দেখাতেন।

১৯৭৩ সালের পহেলা জানুয়ারি একটি মার্কিন বিরোধী মিছিল করার সময় ছাত্র ইউনিয়নের কর্মীদের উপর গুলি চালানোর প্রতিবাদে ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল, এ খবরটি টেলিগ্রাম আকারে প্রকাশ করার কারণে একটি সরকারি মালিকানাধীন দৈনিকের প্রধান সম্পাদক এবং নির্বাহী সম্পাদককে শেখ মুজিবুর রহমান পদচ্যুত করেন। এর পরপরই এ দুজনকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সম্পাদককে কূটনৈতিক দায়িত্ব এবং নির্বাহী সম্পাদককে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রেস সচিবের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘে একটি প্রতিনিধি দল পাঠায়। এ প্রতিনিধি দলটির দায়িত্ব ছিল জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে কথা বলা, মাহমুদ আলী এবং শাহ আজিজুর রহমান নামে দুজন বাঙালি যথাক্রমে দলটির প্রধান এবং উপপ্রধান ছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর যেদিন বাংলাদেশ মুক্ত হয় সেদিন মাহমুদ আলী পাকিস্তানে ছিলেন। একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী পর্যায়ের পদ দিয়ে পাকিস্তান সরকার তাকে পুরস্কৃত করেছিল। শাহ আজিজুর রহমান সে সময় ঢাকায় ছিলেন, তাকে পাকিস্তানি সামরিকজান্তার সাথে সহায়তা করার অপরাধে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

আজিজুর রহমানের স্ত্রী তার স্বামীর মুক্তির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে আবেদন জানান। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে জবাবে বলেছিলেন আইন তার নিজস্ব গতিতে চলবে। এসএম আলীর প্রতিবেদনে বলা হয়, 'এ সময় শেখ মুজিবুর রহমান তার ব্যক্তিগত সচিবকে চমকে দিয়ে নির্দেশ দেন যেন প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে যেন আজিজুর রহমানের স্ত্রীকে প্রতি মাসে সংসার চালানোর জন্য ৫০০ টাকা করে দেয়া হয়।' কতোদিন পর্যন্ত? যতদিন পর্যন্ত আদালত আজিজুর রহমান বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত না নেয়।

একজন সাংবাদিক তাঁর ভগ্নিপতির কারামুক্তির জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে যান। শেখ মুজিবুর রহমান ওই সাংবাদিকের কথা থামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, 'আমার কাছে ওর বিষয়ে কোন কথা বলো না, ওর সম্পর্কে আমি জানি; ওর বিরুদ্ধে অভিযোগের ফাইলটি অনেক মোটা। অন্য কোন বিষয় থাকলে আমার সাথে কথা বলতে পারো।'

যখনই কেউ কোন পাকবাহিনীর সহায়তাকারীকে মুক্ত করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে তদবীর করতেন তার প্রথম প্রতিক্রিয়া এমনই হতো। কিন্তু একটু পরেই তিনি নরম হতেন। প্রায়শই বন্দী থাকা রাজনীতিকদের পরিবারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ তহবিল থেকে নিয়মিত ভাতা প্রদানের নির্দেশ দিতেন।

যখন ওই সাংবাদিকটি বুঝতে পেরেছিলেন যে শেখ মুজিবুর রহমানের রাগ একটু কমে এসেছে তখনই তিনি পাশের কক্ষে অপেক্ষারত তার বোনকে শেখ মুজিবুর রহমান কাছে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দেন।

তখন স্নেহভরা কণ্ঠে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে প্রশ্ন করেন, 'আমি তোমার জন্য কি করতে পারি?' তখন সাংবাদিকের বোন উত্তর দেন, 'আমার স্বামী গত ছয় মাস যাবৎ কারাগারে আছে। আমি এটা আর সহ্য করতে পারছি না।' শেষে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রশ্ন রাখেন, 'আমি আর আমার সন্তানদের অপরাধ কি?'

শেখ মুজিবুর রহমান এ কথা শুনে অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। তখন তিনি প্রশ্ন করেন, 'তোমার ভাই কোথায়। সে তোমাকে এখানে নিয়ে এসে নিজে কেটে পড়েছে। চিন্তা করো না। তোমার ভাইকে বল সে যেন আমাকে আগামীকাল ফোন করে।' পরদিন ওই নারীর স্বামীকে ছেড়ে দেয়া হয়।

শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে কিভাবে আবেদন জানাতে হবে যারা সেটা ঠিক মতো জানতো তারা তাকে দিয়ে প্রায় যে কোন কিছুই করিয়ে নিতে পারতো। পাকবাহিনীকে সহায়তা করে কুখ্যাত ছিলেন এমন এক ব্যক্তির স্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের সামনে কিভাবে কান্নাকাটি করবেন তা আগে থেকে অনুশীলন করে নিয়েছিলেন, এবং তিনি এত ভালো অভিনয় করেছিলেন যে মুজিব বাধ্য হয়ে ঐ ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যখন ডি. তার কাছে ওই অপরাধীকে মুক্তি দেয়ার কারণ জানতে চেয়েছিলেন তখন শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, 'আমি আর কিইবা করতে পারতাম। ওই ব্যক্তি আমার বন্ধু ছিলেন। ভাবী বাচ্চাদের সাথে নিয়ে এসেছিলেন এবং তারা আর্থিক কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন।' ডি. তখন আবার বলেছিলেন, 'সে আমারও বন্ধু ছিল, তারপরও তার সবার শেষে মুক্তি পাওয়া উচিৎ ছিল। তাকে মুক্তি দিয়ে আপনি আর সবাইকে কারাগারে আটকে রাখতে পারেন না। তার পরিবারতো ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল না। যাই হোক, এভাবে যদি আপনি অপরাধীদের ক্ষমা করতে থাকেন তাহলে তো যে কোন খুনী বা চোর যারা তাদের পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাদের কখনোই কোন দণ্ড হবে না।'

পরবর্তীতে তিনি তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলেছিলেন, 'এটা আসলে কোন ব্যক্তিগত বিষয়ই নয়। শেখ মুজিবুর রহমান এখন ঠিকই বুঝতে পাচ্ছেন দেশ বিরোধীদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করে তিনি জাতির কি ক্ষতি করেছেন। তিনি এখন আর শেখ মুজিবুর রহমান ভাই নন, তিনি একটি জাতির নেতা। ক্ষমাশীল হওয়ার চেয়েও তার জন্য এখন ন্যায় পরায়ণ হওয়া জরুরি। অল্প কয়েকজনের প্রতি দয়া দেখাতে গিয়ে তিনি সংখ্যা গরিষ্ঠদের প্রতি অন্যায় করছেন। প্রশাসনে আবেগের কোন জায়গা নেই, এ কথা সশস্ত্র সংগ্রামের পরের সময়ের জন্য আরও বেশি প্রযোজ্য। স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তিগুলো ক্রিয়াশীল আছে।'

শেখ মুজিবুর রহমান বলতেন, 'পরিবারের এক ভাই পাকিস্তানিদের সহায়তাকারী হলে দেখা যায় আরেক ভাই মুক্তিযোদ্ধা। প্রতিটি পরিবারই অনেক ভুগেছে। আমি তাদের ভোগান্তি আর বাড়াতে চাই না।' এটি আসলে একটি আংশিক ব্যাখ্যা।

কেউ কেউ বলে থাকেন শেখ মুজিবুর রহমান তখন আহত করতে প্রস্তুত হলেও আঘাত করার মানসিকতা তার ছিল না। নিজ দেশের মানুষের ভালোবাসা পেতে তিনি এত উদগ্রীব ছিলেন যে কাউকেই তিনি আঘাত করতে চাইতেন না। তিনি বুঝতে পারছিলেন না 'যে দুষ্টকে রক্ষা করে সে শিষ্টের প্রতি অন্যায় করে।'

একজন বিক্ষুব্ধ তরুণ বলেছিলেন, 'মুজিব মনে করেন বাংলাদেশ শেখের রাজত্ব।' তিনি আরও বলেছিলেন, 'একজন সামন্ত প্রভু যেই তার কাছে নিরাপত্তা চায় তাকে রক্ষা করে থাকে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে সামন্তীয় সংস্কৃতি আর বিভ্রান্ত ক্ষমাশীলতার জায়গা থাকতে পারে না।' এই তরুণ নিজে একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং পাকিস্তানপন্থীদের বিষয়ে তিনি ছিলেন আপোষহীন। 'আমরা যদি এখনই নির্মূল না করি, তাহলে সুযোগ পাওয়া মাত্রই ওরা আমাদের ধ্বংস করে দিবে।'

কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র জাতির পুনঃএকত্রীকরণে বিশ্বাস করতেন। তিনি সত্যিই উষ্ণ এবং দয়ালু প্রকৃতির ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ক্ষমতায় আসার আগে যারাই তাকে সহায়তা করেছিল তিনি তাদের কারও কথাই ভোলেন নি। কোন একটি সংলাপ বলার ক্ষেত্রে তার ভুল হলেও, কারও চেহারা চিনতে তার কখনো ভুল হতো না। শুধু নাম মনে রাখা নয় শেষ কবে দেখা হয়েছিল সেটি মনে রেখে তিনি অনেককে চমকে দিতেন।

১৯৭৪ সালে লাহোর সফরের সময় ১৯৭১-এর আগে শেখ মুজিবুর রহমানের পরিচিত ছিলেন এমন দু'একজন সাংবাদিকের সাথে সখ্যতা দেখানোর কারণে সে সময় শেখ মুজিবুর রহমান বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। আলজিয়ার্সে জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে এক বাংলাদেশি সাংবাদিককে সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান নিরাপত্তা সমস্যা তৈরি করে ফেলেছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান কিছু সমালোচক বলতেন, শেখ মুজিবুর রহমানকে লোকে ভালোবাসলেও তাকে সম্মান করতো না। শ্রদ্ধার সম্পর্কের মধ্যে একটু দূরত্ব থেকে যায়, শেখ মুজিবুর রহমানের লুকিয়ে রাখার মতো কিছু ছিল না। তিনি ভালোবাসতে অনুপ্রাণিত করতেন, ভয় পেতে নয়।

যারাই শেখ মুজিবুর রহমানকে এমন কি মোটামুটি কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন তারাই তাকে একজন স্নেহপ্রবণ ব্যক্তি হিসেবেই জানতেন, এবং তারচেয়ে এমন কি দুই তিন বছর কম বয়সের বন্ধুরাও তাকে ভালোবেসে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন।

মুক্তিযুদ্ধের আগে এবং এর কিছু পরে পর্যন্তও লোকে তাকে 'মুজিব ভাই' হিসেবেই চিনতো। ১০ জানুয়ারি ১৯৭২-এ দেশে ফেরার পর ভাষণে তিনি নিজেকে এ নামেই সবার সামনে হাজির করেছিলেন। এই সম্বোধনটিই তাকে মানাতো।

কিন্তু এই অতি পরিচিত 'মুজিব ভাই' সম্বোধনের জায়গায় ধীরে ধীরে 'বঙ্গবন্ধু' আর 'বঙ্গপিতা' চলে আসে, এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিজেও নিজেকে 'বঙ্গবন্ধু' বলতেন। এর ফলে তার অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। হো চি মিন ছিলেন হো চাচা, শেখ মুজিবুর রহমানের উচিৎ ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ভাই হয়েই থাকা। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে একজন স্নেহশীল পিতা হিসেবে ভাবতে ভালোবাসতেন, কিন্তু প্রায়শই তিনি একজন দায়িত্বজ্ঞানহীন পিতার মতো আচরণ করতেন, বিশেষত অবাধ্য সন্তানদের বিষয়ে। অনেকেই ভাবতেন শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো আর সব পিতার মতো নিজের সন্তানদের ব্যাপারে পক্ষপাতদুষ্ট।

পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তা করেছিলেন এমন একজন সাংবাদিক মুক্তিবাহিনী তাকে হত্যা করবে ভেবে ভয় পেয়েছিলেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গিয়ে তিনি তার পায়ে পড়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে রেগে গিয়ে বলেছিলেন, 'যাও! তুমি এমন করবে আমি আগেই জানতাম, তোমার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি কিছু আশা করা যায় না।'

একজন লেখক রেগে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'মুজিব কি নিজেকে এ কালের যিশু খ্রিস্ট মনে করেন।'

শেখ মুজিবুর রহমান ওই সাংবাদিককে তিরস্কার করেন নি বা তাকে সুপথে আসতেও বলেন নি। বরং তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের দয়ালু মনের কথা বোঝা গেলেও, বিতর্কিত অতীত রয়েছে এমন ব্যক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো কি দরকারী ছিল?

১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান কিছু সাংবাদিকের উদ্দেশে বলেছিলেন, 'আপনাদের কি মনে হয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তি মালিকানাধীন পুঁজি বলতে কিছু থাকবে?' সন্দেহ নেই এটি একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান কি ভেবেছিলেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় আপোষ করেছিলেন এমন লোকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে? এসব লোক যদি পেশাদারিত্বের দিক থেকে খুব দক্ষ বা সবার কাছে পরিচিত মুখ হতেন তখন না হয় তাদের নিয়োগ পাওয়ার এক ধরনের ব্যাখ্যা থাকতো, কিন্তু এরা সবাই ছিলেন অযোগ্য এবং কেউই তাদের সম্মান করতো না।

একটি প্রবাদ আছে, 'যে একবার তোমার প্রতি অন্যায় করেছে সে কখনোই তোমাকে ক্ষমা করবে না।' শেখ মুজিবুর রহমান যদি ভেবে থাকেন যে যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের প্রতি ক্ষমাশীল আচরণ করায় তারা তাঁর প্রতি অনুগত থাকবে তাহলে তিনি একটি বিরাট ভুল করেছিলেন। বিশ্বস্ততা কি জিনিস তা এসব লোক জানতেনই না।

ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন প্রথম বিদেশি নেতা যিনি বাংলাদেশ সফর করেছিলেন। কিন্তু তিনি সে অর্থে বিদেশি ছিলেন না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর ভূমিকা ছিল অপরিমেয় এবং বাংলাদেশের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন একজন অদম্য সাহসী নেতা যিনি প্রচণ্ড আন্তর্জাতিক চাপ সহ্য করেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সহায়তা করে গেছেন।

১৯৭২ সালের ১৭ মার্চ ইন্দিরা গান্ধী যখন ঢাকা সফর করেন তখন তাকে যে ব্যাপক সংবর্ধনা দেয় হয় তা ছিল এদেশের মানুষের মনে তার জন্য যে ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা ছিল তারই বহিঃপ্রকাশ। বাংলাদেশের লাখো মানুষ সেদিন যে নেতা তাদের সবচেয়ে দুর্যোগের মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁকে এক নজর দেখার জন্য জড়ো হয়েছিলেন।

ভারতের দরিদ্রদের মধ্যেও যারা সবচেয়ে দরিদ্র তারা মুক্তির সংগ্রামের সময় যে দশ মিলিয়ন বাঙালি ভারতে শরণার্থী হয়েছিল তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন ভারতের প্রতীক।

ইন্দিরা গান্ধীর ঢাকা সফরের তারিখটি ছিল একটি আনন্দের দিন, কারণ ১৭ মার্চ ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন।

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সেদিনের জনসভায় ইন্দিরা বলেছিলেন, 'আজকের দিনটি বিশেষভাবে উদ্‌যাপন করার মত। কারণ, আজ শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন, শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বঙ্গবন্ধুই নন পৃথিবীর সর্বত্র জুলুমবাজের নির্যাতনের স্বীকার মানুষেরই তিনি ভাই।'

ইন্দিরা গান্ধী সঠিকভাবেই বলেছিলেন, 'ভারত যদি আপনাদের সহযোগিতা করে থাকে তা করেছে আপনাদের আহ্বান শুনে, আপনাদের উপর যে নিপীড়ন চলেছে তা সহ্য করতে না পেরে। আমরা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি আমাদের নিজেদের প্রতি সৎ থাকার জন্য এবং বহু বছর ধরে যে আদর্শ আমরা আকড়ে ধরে আছি তা তুলে ধরার জন্য। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দুটি দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে মুক্তিযুদ্ধে আমরা যে সহযোগিতা আপনাদের করেছি তার ভিত্তিতে নয়, বরং দুটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের পারস্পরিক সাম্য ও সুযোগ-সুবিধার ভিত্তিতে।'

কিছু ভারতীয় কর্মকর্তা চেয়েছিলেন যেন ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের মধ্যে দিয়ে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে 'চিরস্থায়ী' চেহারা দিতে। প্রথমে এ প্রস্তাবের সমালোচনা করলেও পরে ইন্দিরা টিএস কাউলকে বলেন যেন বিষয়টি 'অনানুষ্ঠানিকভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে জানিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিক্রিয়া নেয়া হয়।'

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব টিএ করিম এরকম একটি চুক্তি করার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি আশঙ্কা করছিলেন এমন একটি চুক্তি চীনকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান এই প্রস্তাবে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ১৯ মার্চ ১৯৭২-এ যখন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সহায়তা ও শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তার আগে শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তির খসড়াটিতে কিছু পরিবর্তন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। চুক্তিতে যেন 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির উল্লেখ থাকে সেটি শেখ মুজিবুর রহমান দাবি করেছিলেন এবং ইন্দিরা গান্ধী এতে সম্মত হয়েছিলেন। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমান চুক্তিপত্রটির একটি বাংলা কপি চেয়েছিলেন।

ইংরেজিতে ঐ চুক্তিটির প্রথম বাক্যটি ছিল :

Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, so
and nationalism..."

একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে অস্থায়ী সরকারের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণায় সকল প্রশাসনিক এবং সাংবিধানিক কর্তৃত্ব তার উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের প্রধান ব্যক্তি ছিলেন তাজউদ্দিন আহমেদ। খন্দকার মোস্তাক আহমেদ কখনোই বাংলাদেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতে পারেন নি। অস্থায়ী সরকারের অপর চার সদস্যের মধ্যে তাজউদ্দিনেরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়ে বিশ্বাস সবচেয়ে গভীর ছিল।

১৯৭২ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার ঠিক পরেই একজন মেজর, যিনি বর্তমানে একজন মেজর-জেনারেল, বলেছিলেন, 'তাজউদ্দিন আহমেদ নিবিষ্ট চিত্তে দেশের স্বাধীনতার জন্য কাজ করেছিলেন। তিনি দৈনিক বারো থেকে ষোলো ঘণ্টা পরিশ্রম করতেন। তিনি নিজের অফিসেই ঘুমাতেন এবং নিজের কাপড় নিজেই পরিস্কার করতেন। অন্য কিছুর দিকেই তিনি মনোযোগ দিতেন না। মুক্তিযুদ্ধে জয় আসার আগে তিনি কখনোই আরাম করেন নি।'

চার বছর পর বাংলাদেশ: কোয়েস্ট ফর অটোনমি নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 'প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্বরত থাকা অবস্থায় তাজউদ্দিন আহমেদ নিজেকে একজন দৃঢ়চেতা এবং সর্বস্ব উজাড় করে দেয়া নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে তাজউদ্দিন আহমেদ-ই আওয়ামী লীগের প্রবাসী সরকারের চালিকা শক্তি ছিলেন।'

মুক্তির সংগ্রামে নতুন নেতার উদ্ভব হয়। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর আগে যে তাজউদ্দীন সব সময় মুজিবের ছায়ায় থেকে কাজ করতেন, সেই তিনিই যুদ্ধের নয় মাসে নিজের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিলেন। যুদ্ধ চলা কালে তার দায়িত্বটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তারপরও এ দায়িত্ব ছিল 'অস্থায়ী', কারণ যুদ্ধ চালানো হচ্ছিল মুজিবের নামে।

কিছু শীর্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযুদ্ধকে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার শুরুর পর্যায় মনে করছিলেন। তারা যুদ্ধের সময় যে দুঃস্বপ্নময় নয় মাস কেটেছে তা দ্রুত ভুলে যেতে চেয়েছিলেন এবং মুক্তির সংগ্রামে তাজউদ্দীনের ভূমিকাকে ন্যূনতম গুরুত্ব দিতেও তারা আগ্রহী ছিলেন না।

পাকিস্তানী জেনারেলরা তাজউদ্দীনকে ঘৃণা করতেন। তারা তাকে হিন্দু বলতেন, তাদের মতে হিন্দু হওয়াটা অবমাননাকর ছিল। তারা তাজউদ্দীনের নাগাল পেলে তাকে ছিড়ে খুঁড়ে ফেলতেন।

অনেক পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরাও তাজউদ্দীনকে প্রচণ্ড রকম অপছন্দ করতেন। স্বাধীনতা-বিরোধী শক্তিগুলোর প্রথমেই মুজিবের সমালোচনা করার সাহস না থাকায় তারা তাজউদ্দীনকে লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেছে নিয়েছিল। যারা প্রচণ্ড রকম ভারত-বিরোধী ছিলেন তারা তাজউদ্দীনকে ভারতীয় চর হিসেবে আখ্যা দেন এবং দেশের সব দুর্দশার জন্য তাকে দায়ী করতে থাকেন।

এককভাবে তাজউদ্দীনের প্রশংসা করার মাধ্যমে ভারতীয় সাংবাদিকরা তার অনেক ক্ষতি করেছিলেন। একজন প্রখ্যাত ভারতীয় সাংবাদিক তাজউদ্দীন সম্পর্কে বলেন, 'ভয়ঙ্কর রকম ভারতপন্থী।"

তাজউদ্দীন ছিলেন বুদ্ধিমান, একনিষ্ঠ এবং পদ্ধতিগতভাবে কাজ করায় বিশ্বাসী। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতার চেয়ে তার পড়ালেখা বেশি ছিল এবং রাজনৈতিক জ্ঞানও ছিল যথার্থ, যে কোন বিষয়ে তার প্রতিভা প্রচণ্ড রকম বেশি না হলেও অন্তত সে বিষয়ে তার একটি স্বচ্ছ ধারণা থাকতো। তিনি চমৎকার কথা বলতে পারলেও, জনসভার বক্তা হিসেবে সেরা ছিলেন না। দলীয় সভা আর কনফারেন্সে তিনি সবচেয়ে স্বচ্ছন্দে থাকতেন।

তিনি একজন রাশভারি ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তার মধ্যে চটুলতা ছিল না। তিনি রসিকতায় জড়াতেন না, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন এবং একজন রাজনীতিবিদের তুলনায় তিনি বেশিই স্পষ্টভাষী ছিলেন । তিনি কখনোই নিজের অনুভূতি লুকাতেন না বা সহকর্মীদের সাথে তার মত পার্থক্য চেপে রাখতেন না। নতুন নতুন বন্ধুদের মন জয় করার পরিবর্তে তিনি নতুন শত্রু তৈরি করতেন।

ঢাকার একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, 'বঙ্গবন্ধু প্রধানতম নেতা হলেও, আওয়ামী লীগের মধ্যে সত্যিকারের রাজনীতিবিদ ছিলেন তাজউদ্দীন আর মোস্তাক। তাজউদ্দীন ছিলেন গঠনমূলক আর মোস্তাক ছিলেন ধ্বংসাত্মক। তাজউদ্দিন তার সর্বস্ব দিয়ে দেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করতেন আর মোস্তাক গোপনে এর বিরুদ্ধে কাজ করতেন।"

আওয়ামী লীগ ছিল একটি বহুমুখী দল। মোস্তাক এবং তাজউদ্দীন এই দলটির মধ্যে থাকা দুটি উপদলের প্রতিনিধিত্ব করতেন। একদিকে তাজউদ্দীন ছিলেন অসাম্প্রদায়িক এবং তিনি দেশে সমাজবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে চাইতেন, অন্যদিকে মোস্তাক ছিলেন সাম্প্রদায়িক এবং তিনি মুক্ত বাণিজ্যিক উদ্যোগের পক্ষে ছিলেন।

অনেকেই মনে করেন আওয়ামী লীগের চেয়ে কোন একটি বামপন্থী দলে থাকলে তাজউদ্দীন হয়তো আরও খুশী থাকতেন। কিন্তু সত্যি হলো তার দলের সহকর্মীরা তাকে ভয়ঙ্কর বামপন্থী মনে করলেও তাজউদ্দীন মার্কসবাদী ছিলেন না।

তাজউদ্দিন তার একজন বন্ধু শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়া থেকে বিরত হলে সেই বন্ধুটির সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তিনি ঐ বন্ধুটিকে বলেছিলেন, 'আওয়ামী লীগের তুলনায় তোমার মধ্যে অনেক বেশি বুদ্ধিজীবীসুলভ গুণাগুণ রয়েছে, কিন্তু তুমি যদি একটি সত্যিকারের রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে চাও, তবে আওয়ামী লীগই তোমার জন্য একমাত্র গন্তব্য।"

তাজউদ্দীনের জন্য আওয়ামী লীগই একমাত্র রাজনৈতিক দল ছিল।

বাংলাদেশে মস্কোপন্থী আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটি কমিটি'র সভাপতি ছিলেন তাজউদ্দীন। তবুও ১৯৭৪ এর শেষ চতুর্ভাগে কিছু কিছু সিপিবি নেতা তার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা বিশ্বাস করতেন মুজিবই একমাত্র নেতা যিনি কট্টর ডানপন্থী এবং কট্টর বামপন্থীদের প্রতিরোধ করতে পারেন এবং তারা মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করতে চাইছিলেন।

১৯৭৪ সালের অক্টোবরে যখন তাজউদ্দীন পদত্যাগ করেন তখন অনেক সিপিবি নেতার মতে তিনি তাড়াহুড়া করে দেশের একটি ক্রান্তিকালে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এই লেখককে একজন সিপিবি নেতা বলেছিলেন, 'তাজউদ্দিন একটু বেশি রকম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। দেশের জন্য গুরুতর মুহূর্তে পদত্যাগ করে জটিলতা বাড়ানো তার মোটেও উচিৎ হয়নি, তার ব্যক্তিগত চিন্তা বা ক্ষোভ যাই হোক না কেন। তিনি নিজেও জানেন না তিনি কি করে ফেলেছেন। তার এ কাজের ফলে কেবল স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র আর বিদেশী শত্রুদেরই সুবিধা হবে।"

মুজিব না থাকলে তাজউদ্দীন কখনোই আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ে আসিন হতে পারতেন না। শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা কট্টর ডানপন্থী নেতারা তাজউদ্দীনকে পছন্দ করতেন না। মুজিব তাকে রক্ষা করেছিলেন এবং তাকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলে এক সময় আওয়ামী লীগের মহাসচিব করেছিলেন, মোস্তাক এবং অন্যান্য নেতাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও।

কিন্তু এর ফলে শুধু তাজউদ্দীন এককভাবে ফলভোগ করেছেন এমন নয়। তাজউদ্দীন অল্পতেই রাগান্বিত হয়ে যাওয়া ব্যক্তি হলেও, সব সময় তিনি রাজনৈতিকভাবে চিন্তা করতেন এবং যখনই রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রশ্ন আসতো তিনি কোন রকম দ্বিধায় ভুগতেন না। তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ, পরিশ্রমী এবং ছোট খাটো ব্যাপারেও মনযোগী, সবসময়ই তিনি সুযোগ করে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে কাজে মনোনিবেশ করতেন।

তাজউদ্দীন মুজিবের মধ্যে এমন একজন সহযোগীকে দেখেছিলেন যে বিশ্বস্ততা আর দায়িত্বশীলতার সাথে তার উপর অর্পিত কর্তব্য পালন করতে পারবেন। পদ্ধতিগত ভাবে কাজ করতে সক্ষম এবং ধীরচিত্ত তাজউদ্দীন সাহসী মুজিবের

পরিপূরকের কাজ করতেন। যখন মুজিব ১৯৭১ এর ২ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন তখন তাজউদ্দীনই জনগণের কাছে দিক নির্দেশনা পাঠাবার কথা ভেবেছিলেন এবং তিনি নিজে এসব দিক নির্দেশনা প্রস্তুত করতে ভূমিকা রেখেছিলেন। মুজিব যখন ১৯৭১ এ ইয়াহিয়া খানের সাথে সমঝোতা করছিলেন তখন তাজউদ্দীন তার সহযোগীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ এর ২১ মার্চ মুজিব যখন ইয়াহিয়া খানের সাথে একটি অনির্ধারিত বৈঠকে বসেন তখন তিনি শুধু তাজউদ্দীনকেই সাথে নিয়েছিলেন। পাকিস্তানী সেনা বাহিনী যদি হামলা করেই বসে সে বিষয়ে আলাপ করার জন্য যে অল্প কয়েকজনের উপর মুজিব আস্থাশীল ছিলেন তার মধ্যে তাজউদ্দীন অন্যতম ছিলেন।

যেদিন মুজিব ঢাকায় ফিরেছিলেন, সেই ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি জনসভায় মুজিব কেবল মাত্র তাজউদ্দীনের কথাই আলাদা করে উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি তাজউদ্দীনকে কাজ এগিয়ে নিতে নির্দেশ দিয়েছিলাম।"

এই বিশেষভাবে উল্লেখ তাজউদ্দীনের প্রাপ্যই ছিল, কিন্তু এর ফলে কিছু জেষ্ঠ্য আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীনের প্রতি আরও বেশি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন।

মুজিব ফিরে আসার পর তাজউদ্দীন তার স্বস্তি প্রকাশ করেন। মুজিবের প্রতি তার আনুগত্য ছিল সন্দেহাতীত এবং তিনি কোন কারণেই তার প্রতি মুজিব অন্যায় করেছেন এমন ভাবার লোক নন। কিন্তু কেউই গুরুত্ব হারাতে পছন্দ করেন না, অনুভূতি কখনো কখনো বিচিত্র হতে পারে। মঞ্চে তাজউদ্দীন কোন ক্ষোভ দেখাননি, কিন্তু তিনি যদি ভেবে থাকেন দীর্ঘ নয় মাস তিনি যে পরিশ্রম করেছেন মুজিব তার যথেষ্ট প্রশংসা করেননি তাহলে তা হতো খুবই মানবিক আচরণ।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি যখন মুজিব তার রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী হন, তার আগে পর্যন্ত তাজউদ্দীন ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং এর ফলে তার গুরুত্ব অনেকাংশে কমে আসে। নজরুল ইসলামের অবস্থান হয় মন্ত্রীসভায় তাজউদ্দীনের উপরে, অবশ্য এটি করা হয়েছিল জেষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে। কিন্তু কেউ কেউ এটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তাজউদ্দীনের পদাবনতি হিসেবে দেখেছিলেন।

তাজউদ্দীনের কিছু শত্রু আবার নতুন করে প্রচার করা শুরু করে যে, তাজউদ্দীন মুজিব ফিরে আসুন এটা চান নি। এই অপপ্রচারের জবাব দেয়া বা মুজিবের সাথে কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে থাকলে তা মিটিয়ে ফেলার পরিবর্তে তাজউদ্দীন বরং কেউ তাকে সন্দেহ করতে পারে এটা ভেবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এর ফলে তার অবস্থান আরও নাজুক হয়ে ওঠে।

১৯৭২ সালের শুরুর দিকে তাজউদ্দীন এবং নজরুল ইসলাম এ দুজন জেষ্ঠ্য মন্ত্রীর মধ্যে একটি প্রকাশ্য বিতণ্ডা হয়। তাজউদ্দীন কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রের পথ ধরেই

বাংলাদেশকে গড়ে তোলা সম্ভব বলে মনে করে বলেছিলেন, 'যদি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে গণতন্ত্র বাধা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে আমাদের গণতন্ত্র বাদ দিয়েই এগিয়ে যেতে হবে।" জবাবে নজরুল ইসলাম কঠোর ভাষায় বলেন, 'যদি সমাজতন্ত্র দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাড়ায় তাহলে আমাদের সমাজতন্ত্র বাদ দিয়েই এগোতে হবে।"

দেশের প্রধান চারটি আদর্শের মধ্যে দুটি ছিল গণতন্ত্র আর সমাজতন্ত্র।

মুজিব এই তর্কটি নিয়ে কৌতুকবোধ করেছিলেন । তিনি এই তর্ক থামিয়েছিলেন, কিন্তু ততক্ষণে এ নিয়ে অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

এক বছর পর মুজিব নিজেই একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে কিভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় তা নিয়ে তার দুশ্চিন্তার কথা বলেছিলেন।

অর্থমন্ত্রী হিসেবে তাজউদ্দীন নিজের প্রশাসনিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছিলেন, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতেন এবং কর্মকর্তাদের মন জয় করে নিতে পেরেছিলেন। মাঝে মাঝেই তিনি ট্রেড ইউনিয়নের ক্ষিপ্ত গোষ্ঠিগুলোর সামনে বক্তব্য রাখতেন। তার বক্তব্যগুলো খুব জনপ্রিয় হতোনা । জনপ্রিয় হওয়ার জন্য যে নাটকীয়তা রাজনীতিকদের মধ্যে থাকতে হয় সম্ভবত তা তাজউদ্দীনের মধ্যে ছিল না। তিনি হয়তো জনপ্রিয় নেতা হতে যা প্রয়োজন তার তুলনায় অনেক বেশি কাঠখোট্টা ছিলেন।

১৯৭৩ সালের ২ জানুয়ারি যখন সারা ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয় তখন অধিকাংশ নেতাই এত ভীত ছিলেন যে তারা এমন কি বন্ধুদের সাথেও দেখা করছিলেন না, অথচ তাজউদ্দীনের বাড়ির প্রধান ফটক খোলাই ছিল এবং তাকে চিনেন এমন যে কেউ হেঁটে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়তে পারতেন।

১৯৭৩ সালে লন্ডন যাওয়ার পথে তাজউদ্দীন যখন নয়াদিল্লী পৌছান তখন তার সঙ্গীরা সবাই স্যুট পরে ছিলেন, কিন্তু তাজউদ্দীন বরাবরের মতোই একটি বুশ শার্ট পরে ছিলেন। তখন নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার ড. এ. আর. মল্লিক তাজউদ্দীনকে অন্তত একটি হালকা জ্যাকেট পড়ে থাকতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'আপনারা যখন লন্ডন পৌছাবেন তখন সেখানে বেশ ঠাণ্ডা থাকবে।" তাজউদ্দীন কোন জবাব দেন নি। তাজউদ্দীন একজন বোধসম্পন্ন প্রাপ্তবয়স্ক লোক হলেও সে সময় অবোধ শিশুর মতো আচরণ করছিলেন।

তাজউদ্দীনের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী তাকে বলেছিলেন, 'আপনি নিজের কথা না ভাবলেও দেশের কথা ভেবে হলেও আপনার নিজের খেয়াল রাখা উচিৎ।" তাজউদ্দীনের জবাব ছিল, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথেই যদি আমি মারা যেতাম সেটাই সবচেয়ে ভালো হত।"

এটি কোন মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা নয়। অনেকেই বিজয়ের মুহূর্তে মারা যেতে চান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পাওয়ার সময়টি ছিল তাজউদ্দীনের সেরা সময়।

তাজউদ্দীনের বিপক্ষ শক্তিগুলো তার সাথে মুজিবের ব্যবধান বাড়িয়ে তুলছিল। ১৯৭৪ এর ২২ ফেব্রুয়ারিতে পাকিস্তান যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তার পর কিছু দুষ্ট লোক প্রচার করতে থাকে মুজিব তাজউদ্দীনকে মন্ত্রীসভা থেকে সরিয়ে দেবেন।

১৯৭৪ এর ২৬ অক্টোবর তাজউদ্দীনের বাধ্যতামূলক পদত্যাগ আকস্মিক ছিল না। এর মাত্র চারদিন আগে কিসিঞ্জারের সফর থেকেই বাংলাদেশ ধীরে ধীরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকছে বলে অনেক পশ্চিমা এবং বাংলাদেশী সাংবাদিক ধারণা করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য অনেকের সাথে তাজউদ্দীনেরও মন জয়ের চেষ্টা করছিল।

বেশ কিছু কাল ধরেই মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে তাজউদ্দীন সহ আরও কয়েকজনকে সরিয়ে দেয়ার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন নিজেই নিজের বিদায়ের সময় ঠিক করেছিলেন। ৩৭ দিনের বিদেশ সফর শেষে তিনি যখন ঢাকায় আসেন তখন বিমান বন্দরে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় তিনি কঠোর ভাষায় সরকারের সমালোচনা করেছিলেন। তিনি ঐ দিনই এ কাজটি কেন করেছিলেন। তিনি হয়তো তখনই বুঝতে পেরেছিলেন আর কয়েকদিন পর এই সাক্ষাৎকারটি দিলে তা হয়তো এত ব্যাপক প্রচার পাবে না এবং ব্যাপক প্রভাবও রাখতে পারবে না।

তাজউদ্দীন মুজিবের থেকে আলাদা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে পদত্যাগপত্র জমা দেননি। মুজিব তাকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন।

২৬ অক্টোবর ১৯৭৪ মুজিব যখন তাজউদ্দীনের পদত্যাগ পত্রের জন্য অধৈর্য্য হয়ে অপেক্ষা করছিলেন তখন তিনি খুব রাগান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে যেসব আওয়ামী লীগার তার কাছে তাজউদ্দীন সম্পর্কে আজে বাজে গল্প করেছিলেন তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

মুজিব সব সময়ই তার ক্রোধের স্বীকার হয়েছেন এমন ব্যক্তিদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য পরে তাদের প্রতি দয়ালু হতেন। অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকে হতাশ করে ২৬ অক্টোবরের পরেও কয়েকবার মুজিব তাজউদ্দীনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এবং তাকে মন্ত্রীসভায় ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব করেছিলেন। তাজউদ্দীনের প্রস্তাবে মুজিব তার সাথে এমন একটি বৈঠকে চোখের পানি ফেলেছিলেন। কিন্তু তাজউদ্দীন এতটাই মর্মাহত হয়েছিলেন যে মুজিবের চোখের জলও তার মন গলাতে পারেনি।

মুজিব, মোস্তাক এবং নজরুল ইসলাম ছিলেন সমবয়সী। আর তাজউদ্দীন তাদের চেয়ে প্রায় পাঁচ বছরের ছোট ছিলেন। এটি তাদের পুনর্মিলনকে আরও অসম্ভব করে তুলেছিল। মুজিব ভেবেছিলেন তাজউদ্দীন তার প্রতি অকৃতজ্ঞ আচরণ করছিলেন, আর তাজউদ্দীন ভাবছিলেন তার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে।

তাজউদ্দীন তার অনুভূতি গোপন করেন নি, কিন্তু যখন ১৯৭৫ এ দুজন ভারতীয় সাংবাদিক তার সাথে দেখা করেন তখন তিনি প্রকাশ্যে মুজিবের কোন সমালোচনা করেন নি, তিনি বলেছিলেন, 'তিনিই আমার নেতা।"

তাজউদ্দীনের খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন ঢাকার এমন একজন প্রখ্যাত আওয়ামী লীগ নেতার মতে ১৯৭৫ সালে কিছু মার্কিন ব্যক্তি তাজউদ্দীনের কাছে প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাজউদ্দীন সে প্রস্তাব প্রত্যাখান করেছিলেন। ঐ আওয়ামী লীগ নেতা তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের বলেছিলেন, 'তাজউদ্দীন এ খবর বঙ্গবন্ধুকে জানিয়েছিলেন এবং তাকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে।"

রাজনীতির কবি

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিল মুজিবের মনে পুষে রাখা বহুদিনের স্বপ্ন। দেশ স্বাধীনতার অনেক আগেই মুজিব বাংলাদেশের কথা বলতেন, পূর্ব পাকিস্তান বা এমন কি পূর্ব বাংলার কথাও না। পঞ্চাশের দশকে তিনি তাঁর কিছু বন্ধুকে বলেছিলেন, 'যদি ৫০০০ মানুষ প্রাণ দিতে প্রস্তুত থাকে তাহলে আমি বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে পারবো।" জহুর হুসাইন চৌধুরী তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে কতোজন প্রাণ দিতে পারে বলে আপনি মনে করছেন?" মুজিব কিছুক্ষণ ভেবে জবাব দিয়েছিলেন, 'পাঁচজন।'

১৯৬৯ সালে ঢাকা সেনানিবাসে যখন সেনাবাহিনী মুজিবকে আটকে রেখেছিল তখন হাজার হাজার মানুষ সেখানে আক্রমণ করে মুজিবকে ছাড়িয়ে আনতে প্রস্তুত ছিলেন।

ভুট্টো বলেন, 'তখন সারা বাংলা পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। তারা একজন নায়কের খোঁজে ছিল। পরিস্থিতি মুজিবকে সে নায়কের ভূমিকায় বাছাই করেছিল। তিনি একটি ব্যতিক্রমী রাজনৈতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিলেন। সংগ্রামের আগুন জ্বালানো ব্যক্তি হিসেবে মুজিব সব সময়ই ছিলেন, কিন্তু জনগণের মহান নেতা মুজিব সৃষ্টি হয়েছিলেন পূর্ববর্তী দুটি সরকারের আমলে করা উপর্যুপরি ভুল এবং ভ্রান্ত হিসাবের কারণে।'

পরিস্থিতির কারণেই কেবল একজন মানুষ জাতীয় নায়কে পরিণত হন না। মুজিবের সৎ সাহস ছিল অতুলনীয় এবং তিনি দেশের স্বাধীনতার জন্য তার জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল নিউজউইক পত্রিকায় ছাপা হয়, 'গত মাসে মুজিব যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তখন তার সমালোচকরা বলেছিলেন যে তিনি এমন করেছেন কেবল তার চরমপন্থী সমর্থকদের চাপে পড়ে, তিনি শুধু একটি বিশাল জনতার ঢেউয়ের উপরে চড়তে চাইছিলেন যাতে তিনি এর নিচে চাপা পড়ে না যান। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাঙালী 'জাতি'র সংগ্রামী নেতা হিসেবে মুজিবের উঠে আসাটা ছিল তার সমগ্র জীবন বাঙালী জাতীয়তাবাদের পক্ষে লড়াই করার যৌক্তিক ফলাফল। মুজিব একটি জনতার ঢলের চূড়ায় বসে থাকলেও, তিনি ঐ জায়গায় দুর্ঘটনাবশত যান নি।"

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে সাথে মুজিব বেড়ে উঠছিলেন। যখন অন্য নেতারা আইয়ুব খানকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন অথবা এমন কি তার সাথে আপোষও করছিলেন তখন মুজিব যা করা উচিৎ তা করার সাহস দেখিয়েছিলেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানে সেনা শাসন কায়েমের পরে আইয়ুব খান মুজিবকে সেনা স্বৈরাচারের প্রধান শত্রুদের একজন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। কোন বিচার ছাড়াই মুজিবকে চৌদ্দ মাস আটকে রাখা হয়েছিল। মুক্তি দেয়ার পর মুজিব পরবর্তী পাঁচ বছর কোন ধরণের রাজনীতিতে জড়াবেন না এমন মুচলেকা দিতে অস্বীকৃতি জানান । তাকে এ কারণে আরও ছয় মাস কারা বরণ করতে হয়।

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল এবং এ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় পাকিস্তানের দুই অংশ খুব বেশি দিন এক থাকতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলো যখন ১৯৬৬ সালের তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু করে তখন পূর্ব বাংলা এ আন্দোলনকে স্বাগত জানায়।

১৯৬৬ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলনে মুজিব আওয়ামী লীগের ছয় দফা পেশ করেন।

এই 'ছয় দফা'কে বলা হয়েছিল 'পূর্ব বাংলার মানুষের বাঁচার দাবি।" দাবিগুলো ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবি।

লাহোর থেকে ঢাকায় ফিরে মুজিব এসব দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি জোরদার রাজনৈতিক প্রচারণা অভিযান শুরু করেন। তিনি যে ভাষা জনগণ সহজে বুঝতে পারে সে ভাষায় তাদের সাথে কথা বলতেন, এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদের দাবির কথা তিনি দেশের সকল কোণায় ছড়িয়ে দেন।

আইয়ুব বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। একজন সেনা শাসক যে একটি মাত্র ভাষা বুঝেন তিনি সেটিই ব্যবহারের হুমকি দেন- তিনি 'অস্ত্রের ভাষা' ব্যবহারের হুমকি দেন। তিনি হুমকি দিয়ে বলেন বাঙালীর যদি চেতনা না ফিরে তবে শিগ্রই একটি 'গৃহযুদ্ধ' পরিস্থিতি তৈরি হবে।

১৯৬৬ সালের ৬ মে মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ মামলা চালু করা হয়। একটি মামলায় তার জামিন হওয়া মাত্রই তাকে অপর একটি মামলায় গ্রেফতার করা হচ্ছিল। তিনি জেলে ঢুকছিলেন আর বের হচ্ছিলেন। এতে বিচলিত না হয়ে মুজিব যখনই অল্প সময়ের জন্য মুক্ত হতেন তখনই জনগণের উদ্দেশে আবেগে ভরা ভাষণগুলোতে পূর্ব বাংলার উপর পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক প্রভুত্বের হাত থেকে জনতাকে মুক্ত করার কথা বলে যাচ্ছিলেন। তাকে যেন দেশের মানুষকে স্বাধীন করার ভূতে পেয়ে বসেছিল।

১৭ জানুয়ারি ১৯৬৮, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুজিবকে সেনা বাহিনীর জিম্মায় নেয়া হয়। এর কিছুদিন পর তাঁকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বাহিনীর কয়েকজন বাঙালী সদস্যকে সাথে নিয়ে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন রাষ্ট্র করার চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের অ্যাকশন কমিটির নেতৃত্বে পরিচালিত একটি গণ আন্দোলনের চাপে পড়ে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯, ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ছাত্রদের অ্যাকশন কমিটি মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়।

আইয়ুব খান প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় ১৯৬৪ সালে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয় তখন মুজিব ছিলেন বাঙালীর অনেক নেতার মধ্যে একজন মাত্র। ১৯৬৬ সালে মুজিব যখন ছয় দফা দাবি পেশ করেন তখন তিনি বাঙালীর প্রধানতম নেতা, কিন্তু তখনো তাঁর নেতৃত্ব অবিসংবাদিত ছিল না। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ এ মুজিব বাঙালীর আশা আর আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে ওঠেন।

এরকম একটি কথা চালু ছিল যে মুজিব বাঙালীর সশস্ত্র সংগ্রাম করার কোন নির্দেশ ১৯৭১ এর মার্চে দেননি। মুজিব অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল ওসমানীকে বলেছিলেন যেন ওসমানী বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের যে কোন ঘটনার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন, কিন্তু ওসমানী বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের কাছে খালেদ মোশাররফের মাধ্যমে পাঠানো বার্তায় জানান তারা যেন পাকিস্তানীরা আঘাত হানার আগে কোন কিছুতে জড়িয়ে না পড়েন।

খুশবন্ত সিং এর কাছে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যদি পাকিস্তানিরা শুধু নির্বাচিত কিছু রাজনৈতিক নেতার উপর হামলা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতো, তাহলে হয়তো সেনা বাহিনীতে বাঙালী কর্মকর্তারা এবং পুলিশ বাহিনী নিরপেক্ষ থাকতো... ।"

যখন পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কোন ক্রমেই বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের উপর বিশ্বাস রাখতে পারছিল না, তখন বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব ছিল না।

কেউ কেউ এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন যে, যুদ্ধংদেহী ছাত্র নেতা এবং আরও কিছু লোক মুজিবকে ১৯৭১ এর মার্চ মাসে বাধ্য করেছিলেন। এই মতবাদের সাথে বিরোধ পোষণ করে ভুট্টো বলেছিলেন, 'যে কোন গণ আন্দোলনে একজন নেতার যতটুকু নিয়ন্ত্রণ থাকতে পারে মুজিবেরও ততটুকু নিয়ন্ত্রণ ছিল। জনগণের উপর ব্যাপক প্রভাব আছে এমন একজন নেতার কখনোই অল্প কয়েকজন ছাত্রনেতা এবং আওয়ামী লীগের পেছনের সারির চরমপন্থীদের হাতের পুতুল হতে পারেন না। মুজিব তার কৌশলের অংশ হিসেবে প্রায়ই এমন ভাব করতেন যে তিনি একজন মধ্যমপন্থী নেতা যার উপর চরমপন্থীরা প্রবল চাপ সৃষ্টি করছে। কিন্তু এটি ছিল স্রেফ তার চালাকী।'

মুজিবের বিরুদ্ধে ১৯৭১ এ যখন রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলার বিচার চলছিল তখন ভুট্টো তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলোর সত্যতা প্রমাণের জন্য এসব কথা বলেছিলেন,

কিন্তু যে উদ্দেশ্যেই ভুট্টো এমন কথা বলে থাকুন না কেন, মুজিব চরমপন্থীদের ক্রীড়ানক ছিলেন না বলে ভুট্টো যে দাবি করেছিলেন তা সঠিক ছিল।

৭ মার্চ ১৯৭১ এ মুজিব ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।" তার বার্তাটি স্পষ্ট ছিল।

এ কথাগুলো বলে মুজিব তার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তার ৭ মার্চের ভাষণ সর্বকালের সেরাগুলোর মধ্যে একটি। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ ভাষণ অসংখ্যবার বাজানো হয়েছিল এবং এটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রেরণার উৎস জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭২ সালে সেনা বাহিনীর উপপ্রধান থাকা অবস্থায় 'বার্থ অফ এ নেশান' শিরোনামের একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা পরবর্তীতে পুনঃমুদ্রিত হয়েছিল, সেখানে তিনি লিখেছিলেন, 'ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে ৭ মার্চে বঙ্গবন্ধু যে ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন তা ছিল আমাদের জন্য সবুজ সংকেত।"

এই ভাষণটি যে স্বাধীনতার আহবান ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এরপরও কেউ কেউ ৭ মার্চ ১৯৭১ এর ভাষণে মুজিব স্পষ্টভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন নি বলে তার সমালোচনা করে থাকেন।

জনসভার মাধ্যমে কখনো স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয় না। মুজিব সেদিনের জনসভায় প্রকাশ্যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তা নিঃসন্দেহে আক্রমণের জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকা পাক সেনাবাহিনীর পক্ষেই যেত। মুজিব এমন কিছু বললে রেসকোর্স ময়দান এবং তার আশে পাশে জড়ো হওয়া লাখো জনতার ভাগ্যে কি হতো তা ভেবেই আতঙ্কিত হতে হয়।

ঐ ময়দানের উপরে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার ঘোরাঘুরি করছিল।

৭ মার্চ ১৯৭১ এর জনসভা শেষ করার পর মুজিব আশ্বস্ত বোধ করছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় যারা তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলেন তাদের উদ্দেশে মুজিব বলেছিলেন, 'আমি এখন একজন মুক্ত মানুষ। আমি আমার দায়িত্ব শেষ করেছি।'

১৯৭১ এর মার্চ মাসে যখন মুজিব এবং ইয়াহিয়া খানের মধ্যে সংলাপ শুরু হয় তখন চীনপন্থী ঝোঁকের কারণে বিখ্যাত এমন একজন সাংবাদিক বলেছিলেন, 'মুজিব একজন কেরেনস্কি। মুজিব নিশ্চয়ই ছয় দফা দাবির বিষয়ে আপোষ করবেন এবং ইয়াহিয়ার সাথে সমঝোতায় চলে আসবেন।' ঐ সাংবাদিক একজন লেনিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

যখন ঐ সাংবাদিক তত্ত্ব আওড়াচ্ছিলেন তখন মুজিব জনতার সুরেই কথা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আওয়ামী লীগ ছয় দফা দাবি নিয়েই কেন্দ্রীয় সংসদ এবং প্রাদেশিক সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। ছয় দফা নিয়ে যে কোন আপোষ করা হলে তা

হতো প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের স্বপ্ন নিয়ে জনগণ আওয়ামী লীগকে যে বিপুল সমর্থন দিয়েছিল তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা।

মুজিব যদি চাইতেন তাহলে এক বছর আগেই দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারতেন। আইয়ুব খানের সংবিধান সংক্রান্ত উপদেষ্টা জি. ডাব্লিউ. চৌধুরী বলেছিলেন, '...আইয়ুব খান মুজিবের সাথে একটি সমঝোতায় পৌছেছিলেন এবং তারা দুজনে একটি স্থিতাবস্থায় পৌছার বিষয়ে প্রায় একমত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেনা বাহিনীতে আইয়ুব বিরোধীরা তাকে 'পেছনের দরজা'র পরিবর্তে 'সামনের দরজা' (অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে) দিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার প্রলোভন দেখানোতে ঐ পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। মুজিব সেনাবাহিনীকে তাকে বোকা বানানোর সুযোগ দিতেন কি না, তা যার যার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।'

এটি অবশ্যই যার যার দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। আইয়ুব খান নিজের অবস্থান নড়বড়ে হয়ে গেছে বুঝতে পেরে মুজিবকে প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। মুজিব এ প্রস্তাবে রাজি হলে তাকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর শর্তে চলতে হতো এবং তাকে ক্ষমতায় থাকতে হতো পাকিস্তানী জেনারেলদের সন্তুষ্ট করে।

জি. ডাব্লিউ চৌধুরী, যিনি একজন বাঙালী ছিলেন এবং আইয়ুব খান ও ইয়াহিয়া খান এ দুজনের সাথেই কাজ করেছেন, তিনি কেবল প্রাসাদ রাজনীতি আর পেছনের দরজার মাধ্যমে ক্ষমতায় যাওয়াটাই বুঝতেন। মুজিব ছিলেন জনগণের নেতা। পেছনের দরজা দিয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার ধারণাটিই তার কাছে ছিল চরম ঘৃণার।

অনেকে বলে থাকেন মুজিব প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের চেয়ে বেশি কিছু চান নি এবং তারা তাদের বক্তব্যের পেছনের যুক্তি হিসেবে বলে থাকেন ১৯৭১ এর মার্চে আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না ।

একথা সত্য যে অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য এমন কি মানসিকভাবেও প্রস্তুত ছিলেন না। সত্য হলো তাদের মধ্যে কেউ কেউ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যখন ১৯৭১ এর ২৫ মার্চ রাতে পাক বাহিনী হামলা চালায়। কিন্তু মুজিব স্বাধীনতার কথাই ভাবছিলেন। এমন কি যখন তিনি প্রকাশ্যে স্বাধীনতার কথা বলছিলেন না তখনো ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে তিনি নিউজউইক পত্রিকার লরেন জেনকিনসকে বলেছিলেন, 'এখন আর পুনরুদ্ধারের কোন আশা নেই। এ দেশটিকে আমরা যেভাবে চিনতাম তা শেষ হয়ে গেছে।'

৫ এপ্রিল ১৯৭১ এ নিউজউইকে ছাপা হয়েছিল, 'তিনি (মুজিব) ছিলেন রাজনীতির কবি, প্রকৌশলী নন, কিন্তু বাঙালীও যান্ত্রিকের চেয়ে বরং বেশি শৈল্পিকই, এবং এ কারণেই মুজিবের রাজনীতির ধরণটিই সর্বস্তরের এবং সকল মতের বাঙালীর ঐক্যবদ্ধ করার জন্য সঠিক ছিল।"

সকল জাতীয়তাবাদী নেতার মতোই বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে তিনি বিভিন্নভাবে ধরা দিতেন। কামাল হোসেন বলেছিলেন, 'মুজিবের জন্য বিশেষ সুবিধার বিষয় ছিল একদিকে তরুণ যুদ্ধংদেহীরা তাকে সর্বোপরী শ্রদ্ধা করতো কারণ তিনি কখনোই 'আপোষকামী' ছিলেন না এবং ছিলেন অসম সাহসী, অন্যদিকে সমাজের উচ্চস্তরের বাসিন্দারা মুজিবকে তাদের 'শেষ ভরসা' মনে করতেন কারণ তিনি 'মধ্যমপন্থী' ছিলেন আর একটি সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে থেকে ধ্বংসাত্মক পরিবর্তন প্রত্যাশী গোষ্ঠীগুলোর চাপও মোকাবেলা করতেন।'

যুদ্ধংদেহী তরুণরা কিছু কিছু আওয়ামী লীগ নেতা ইয়াহিয়া খানের সাথে সমঝোতায় যাওয়ার জন্য যে ব্যাপক আগ্রহ দেখিয়েছিলেন তা ভুলতে পারেন নি এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তারা কি করতে পারেন তা ভেবে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু তারা মুজিবের উপর আস্থা রেখেছিলেন কারণ তারা বুঝতে পেরেছিলেন কেবল মুজিবের নেতৃত্বেই একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করা সম্ভব। এবং মুজিবেরও এসব তরুণদের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বিরোধিতা করার পরও মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম কমিটির ১১ দফা দাবি গ্রহণ করেছিলেন।

এসব দাবির মধ্যে পঞ্চম দফাটি ছিল: 'সকল ব্যাংক, বীমা কোম্পানী এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্প কারখানা জাতীয়করণ।' ব্যাংক এবং বীমা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা ১৯৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল।

যুদ্ধপক্ষী তরুণরা মার্চ ১৯৭১ এ নিশ্চিত হয়েছিলেন যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন সম্ভাবনা নেই। এই তরুণরাই যখন পাক বাহিনী বাঙালীর উপর ঝাপিয়ে পড়ে তখন মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

কামাল হোসেন মনে করেন বাঙালীর উপর বর্বর পাকসেনাদের আক্রমণের ফলে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের আন্দোলন 'দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামে' রূপান্তরিত হয়েছিল, তিনি বলেন, 'তরুণ যুদ্ধপন্থীরাই পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীর প্রাণ ভোমরা হন। মুজিব কারাগারে থাকা অবস্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দানকারী মুজিবের সহযোগীদের সে সময় এসব তরুণদের আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করতে হয়েছিল। বাংলাদেশকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী' ঘোষণা করা হয়েছিল এবং গণতন্ত্রের পাশাপাশি সমাজতন্ত্রকেও সংগ্রামের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করতে হয়েছিল। সংগ্রামের এই পর্যায়ে বিপ্লবী অংশটি শক্তি অর্জন করেছিল, এবং এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাজারো যুদ্ধপন্থী তরুণ এ সময় অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ পেয়েছিল এবং পরে তাদের এ প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়েছিল। সেই নয় মাসে সারাদেশ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল, প্রশাসন ভেঙ্গে পড়ছিল এবং সামরিক সরকারকে মানুষ বিদেশী দখলদার হিসেবে সনাক্ত করেছিল; এর ফলে মনে হচ্ছিল পুরোনো সমাজ ভেঙ্গে

পড়বে এবং সেই ধ্বংসস্তূপ থেকেই নতুন সামাজিক শক্তি একটি 'শোষণমুক্ত সমাজ' প্রতিষ্ঠা করবে–এটিই সে সময় হাজারো তরুণ মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের দাবি ছিল।'

সহযোগীদের পরিবর্তে মুজিব নিজে এ যুদ্ধে সরাসরি নেতৃত্ব দিলেও ঘটনাগুলো এর চেয়ে খুব বেশি আলাদা হতোনা। মুজিবও তরুণ যোদ্ধাদের নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে সায় দিতেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ অতি বিপ্লবী হলেও, অধিকাংশ ছিলেন আদর্শবাদী যারা বিশ্বাস করতেন স্বাধীন বাংলাদেশে সবকিছু অন্য রকম হবে।

১৯৬৮-৬৯ সালে যে জাগরণের কারণে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল, তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক ছিল না এবং মুজিবের মুক্তির মাধ্যমেই এ আন্দোলন শেষ হয়ে যায়নি। এর পেছনে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য থাকলেও সেগুলো নেতৃত্বের অভাবে সফল হয়নি।

নেতাদের তুলনায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল আরও অনেক বেশি এবং জনতা শুধু রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন বা এমন কি রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েও সন্তুষ্ট হতে প্রস্তুত ছিল না। যদি না এর ফলে অর্থনৈতিক বঞ্চনা এবং সামাজিক অমর্যাদা থেকে মুক্তি না মেলে। মুজিব বিপ্লবী ছিলেন না, কিন্তু জনগণের ক্ষোভ বুঝে ফেলার জন্য যতোটা প্রয়োজন তিনি জনগণের ততোটুকুই কাছের মানুষ ছিলেন। এ কারণেই পরবর্তীতে তিনি সামাজিক ন্যায়বিচারের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাথে যে কোন সংঘাতের সময় তাকে জেষ্ঠ্য আওয়ামী লীগ নেতাদের উপর নয় বরং তরুণ, শ্রমিক ও কৃষকের উপর নির্ভর করতে হবে, তারা তার দলেরই হোক বা অন্য দলের।

একটি কেন্দ্রমুখী দল হলেও শুরু থেকেই আওয়ামী লীগের জন্য কিছু প্রগতিশীল উদ্যোগ নেয়া সুবিধাজনক ছিল। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগের প্রস্তাবিত ১২ দফার মধ্যে কেবল কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগী ব্যবস্থা বাতিল করণই ছিল না পাশাপাশি সকল ভূমির রাষ্ট্রায়ত্তকরণও ছিল। ভূমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ফলে অনেক আওয়ামী লীগ নেতারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও তারা এটি নিয়ে খুব ভাবিত হন নি, কারণ এটি ছিল এমন এক প্রতিশ্রুতি যা তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করার দাবি তাদের কাছে কেউ জানায়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে যদি আওয়ামী লীগ ভূমি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ অন্তর্ভুক্ত করতো তাহলে দলটি এর অনেক প্রবল সমর্থককে হারাতো।

দেশের অন্তরবর্তী সরকারের সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের নীতির অংশ করাটা কোন বিচ্যুতি ছিল না, বরং এটি ছিল স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অংশ। এক্ষেত্রে এখানে স্মরণ করিয়ে দেয়া যেতে পারে যে সেই ১৯৫০ এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত মহা জাতীয়

সম্মেলনে দেশের সংবিধানের প্রধান নীতি প্রস্তাবনাতেও বলা হয়েছিল: "পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রগুলো হবে সার্বভৌম সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র।"

জনগণের আশা পূরণের জন্য বাংলাদেশকে একটি সত্যিকারের গণপ্রজাতন্ত্র হতে হতো। দুর্ভাগ্যজনক হলো, অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা এর অর্থই বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রথম দিকে তো তারা 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করতেই দ্বিধায় ভুগতেন, যখন তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলতে শুরু করলেন এবং 'জনগণের স্বাধীনতার সুফল ভোগের' কথা বলতে লাগলেন তাও তারা বলতেন না বুঝেই।

রবার্ট পেইন মুজিব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'তিনি ছিলেন একজন বইকেন্দ্রিক মানুষ." তিনি এ কথা বলেছিলেন প্রশংসা সূচকভাবে, কিন্তু এ থেকে কেউ ভুল বুঝতে পারে। মুজিব বই পড়তে পছন্দ করতেন, তার একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল এবং যখনই সময় পেতেন তিনি পরিবারের সদস্যদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা অথবা বার্ট্রান্ড রাসেলের লেখা পড়ে শোনাতেন। (তিনি তার কনিষ্ঠতম পুত্রের নাম রেখেছিলেন দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেলের নামানুসারে।)

কিন্তু তাই বলে কেউ যদি ভেবে বসে যে মুজিব 'ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার পরিবর্তে কেবল বইয়ের জ্ঞানের উপর নির্ভর করতেন' তাহলে সেটা ভুল হবে।

মুজিব ইতিহাসের সেরা জাতীয় নেতাদের অন্যতম ছিলেন, কিন্তু রাজনৈতিক তত্ত্বগুলোর উপর তার পূর্ণ দখল ছিল না। খুব অল্প জননেতাই রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ছিলেন।

যখন কেউ কেউ মুজিববাদ প্রচার করতে চাইছিলেন, তখন প্রথমে মুজিব তাদের কে নিরুৎসাহিত করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর তোমরা এ মতবাদ প্রচার করতে পারো।' কিন্তু মুজিববাদের প্রবক্তারা তারপরও এগিয়ে গিয়েছিলেন।

মুজিবের রাজনৈতিক সহযোগীদের একজন মুজিব সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তিনি সমাজবাদ আর পুঁজিবাদের একটি বিশেষ সংশ্লেষণ, যা থেকে সারা বিশ্বই কিছু শিখতে পারে।'

তিনি জানতেন না আসলে তিনি কি বলছিলেন।

১৯৭৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক অর্থনীতি সমিতির সম্মেলনে যোগ দিতে আসা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা যখন মুজিবের কাছে জানতে চান বাংলাদেশী সমাজতন্ত্র বলতে কি বোঝায়, মুজিবের উত্তরটি ছিল বেশ সহজ সরল, 'বাংলাদেশে আমরা যে ধরণের সমাজতন্ত্র অনুশীলন করবো সেটিই হবে আমাদের ভাষায় সমাজতন্ত্র।' সম্মেলনের শুরুতে ই. এ. জি. রবিনসন যে সূচনা বক্তব্য রাখেন সেখানে মুজিবের এ উত্তর সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, 'আমি মনে করি এটি কঠিন প্রশ্নের চতুর উত্তর মাত্র নয়, বরং এটি বাংলাদেশ সরকার সমস্যা

মোকাবেলা করতে যে বাস্তব ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাভিত্তিক কৌশল নিয়েছে তার একটি যথার্থ প্রতিফলন।'

মুজিব শুরুতে একজন সমাজতন্ত্রী ছিলেন না, এবং নিশ্চিতভাবেই তিনি মার্ক্সবাদীও ছিলেন না, কিন্তু বাংলাদেশের উপর তার ছিল জ্বলন্ত আস্থা এবং বাংলাদেশে যে কোন পরিবর্তনই তার হাত ধরে আসতে হতো। কারাগারে থাকা অবস্থায় একজন সাংবাদিকের সাথে তার সমাজতন্ত্র নিয়ে একটি তর্ক হয়েছিল। সে সময় কম্যুনিজম নিয়ে সামান্য আগ্রহই ছিল। সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি সমাজতন্ত্রের অর্থ বোঝেন?' মুজিবের জবাব ছিল, 'এ দেশে যদি কেউ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সেটি হবে শেখ মুজিবুর রহমান, আপনাদের কম্যুনিস্ট পার্টি নয়।'

রেহমান সোবহানের মতে প্রথম দিকে মুজিব তার সরকারের দার্শনিক ভিত্তিটি ধরতে পারেন নি। সম্ভবত সে সময় মুজিব তা পারেন নি। তার বোঝাপড়াগুলো দার্শনিকের চেয়ে বেশি ছিল ব্যবহারিক। সে সময়টিতে তিনি সব কিছু ধীরে ধীরে বুঝে নিচ্ছিলেন। কিন্তু তিনি দায়িত্ববান ছিলেন এবং জনগণকে ভালোবাসতেন। সমাজতন্ত্রের একটি মানবিক চেহারা তার মনের মধ্যে ছিল।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্তর বাড়িতে পঞ্চাশের দশকে একটি বৈঠকের বিরতিতে মুজিব ধূমপান করার জন্য বাইরে এসেছিলেন। ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের পুত্র সঞ্জীব তখন বাগানে ছিলেন, মুজিব তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কি করছো?' উত্তরে সঞ্জীব বলেছিলেন, 'ফুলটির পাঁচটি পাপড়ি আছে' এবং এরপর সঞ্জীব উপকথায় ফুল আর সংখ্যার গুরুত্ব নিয়ে কথা বলছিলেন। মুজিব অধৈর্য হয়ে বলেছিলেন, 'দেশের মানুষ না খেয়ে আছে আর তুমি ফুলের পাপড়ি গণনা করছ। আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি দেশের সব ফুলের বাগানকে ধান ক্ষেতে পরিণত করতাম।'

ফুলের ব্যাপারে মুজিব অনাগ্রহী ছিলেন এমন নয়, কিন্তু দুর্যোগের সময়গুলোতে মুজিব একনিষ্ঠভাবে সেদিকেই মনযোগ দিতেন এবং কোন বিষয়গুলো অগ্রগণ্য বিবেচনা করবেন তা তিনি নিজেই ঠিক করতেন। মুজিব বুঝতেই পারছিলেন না যখন দেশের খাদ্য পরিস্থিতি এত ভয়াবহ তখন কেউ কিভাবে ফুলের দিকে মন দিতে পারে।

মুজিব হুসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং ফজলুল হকের ভক্ত ছিলেন। সোহরাওয়ার্দী ছিলেন মুজিবের রাজনৈতিক গুরু এবং মুজিব প্রায়ই সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সম্মান দেখাতেন। কিন্তু এ দুজন মানুষের মধ্যে কোন মিল ছিল না। অক্সফোর্ডে পড়ালেখা করা সোহরাওয়ার্দী ছিলেন শহুরে এবং সম্ভ্রান্ত, এবং এমনকি যখন ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের হয়ে ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তখনো সোহরারওয়ার্দী সাধারণ মানুষের বিষয়ে তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারতেন না। তিনি বিলাসী জীবন যাপন পছন্দ করতেন এবং করাচী যখন পাকিস্তানের রাজধানী

ছিল তখন তিনি প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় থাকার চেয়ে করাচীতে থাকতেই বেশি পছন্দ করতেন।

মুজিব নিজ দেশের মানুষকে ভালোবাসতেন এবং বাংলাদেশে থাকতেই সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন। সোহরাওয়ার্দীর চেয়ে ফজলুল হকের সাথেই বরং মুজিবের বেশি মিল খুঁজে পাওয়া যায়। মুজিব এবং ফজলুল হক দুজনই উষ্ণ হৃদয়ের অধিকারী এবং দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন। ফজলুল হক একজন ভাষাবিদ ছিলেন এবং সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেও ঔজ্জ্বল্য ছড়াতে পারতেন। তিনি কোলকাতায় বসবাস করলেও মনের মধ্যে একজন বরিশালের সন্তানই থেকে গিয়েছিলেন।

মুজিব একজন বাঙালী ছিলেন এবং বাংলাদেশই তার জায়গা ছিল। তাকে ইসলামাবাদে বসে থাকা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কল্পনা করাটাও কঠিন ছিল।

মুজিবের শক্তির দিক কি ছিল? মুজিবের জবাব ছিল, 'আমার জনতা আমাকে ভালোবাসে।' তার দুর্বল দিক কি ছিল? মুজিবের জবাব ছিল, 'আমি আমার জনতাকে অতিরিক্ত ভালোবাসি।' কামাল হোসেন বলেন, 'মুজিবের নিজেকে একজন 'মহান শুভেচ্ছা দূত' এবং 'জাতির পিতা' যিনি সবার ভালোবাসা চাইতেন এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখতেন, আর সম্ভবত এ কারণেই তিনি বৃহত্তর স্বার্থে অল্প কয়েকজনকে পরিত্যাগের বেদনা নেয়ার মতো সিদ্ধান্তগুলো মুলতবি করে রাখতেন।'

যে মানুষ সবার ভালোবাসা চান তিনি খুবই নাজুক হয়ে থাকেন।

নিজ দেশের মানুষকে ভালোবাসাটাই হয়তো 'শুরুতে সব ছিল।' কিন্তু যখন তার শক্ত হওয়া দরকার ছিল তিনি ক্রমেই নরম হচ্ছিলেন। অনেক জেষ্ঠ্য আওয়ামী লীগ নেতার বিরুদ্ধে তিনি কোন ব্যবস্থা নিতেন না, তিনি বলতেন 'তারা অনেক কষ্ট সহ্য করেছে।' মুজিব সমগ্র জাতিকে পুনর্বার একিভূত করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু এ লক্ষ্যে মুজিব যে দয়া দেখিয়েছিলেন স্বাধীনতা বিরোধী চক্র সেটিকে তার দুর্বলতার লক্ষণ হিসেবে দেখিয়েছিল। মুজিব বুঝতে পারেন নি তারা পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্য কোন দিনই তাকে ক্ষমা করবে না।

১৯৭৩ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়ের পর গার্ডিয়ান পত্রিকার পিটার প্রেস্টন বলেছিলেন, 'তিনি (মুজিব) কি জনগণের ভালোবাসার জন্য এতোটাই কাঙাল যে বাংলাদেশ সরকার সস্তা জনপ্রিয়তার দিকে ছুটবে, না কি আগামী পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার যে নিশ্চয়তা পাওয়া গিয়েছে তার ফলে অন্তত প্রধান প্রধান সংকট সমাধানের আগে পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রনায়কসুলভ আচরণ করবেন, এতে তার জনপ্রিয়তা একটু কমলেও?'

একটি বিশেষ সম্পর্ক

একজন আত্মীয় বা বন্ধু একজন অপরিচিতের তুলনায় বেশি আঘাত করতে পারেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্ক ছিল বেশ নাজুক অবস্থায়। উভয় পক্ষই যতোটুকু তারা স্বীকার করছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি প্রত্যাশা করছিল বলে পুরো বিষয়টি আরও জটিল হয়ে উঠেছিল। দুটি বন্ধুভাবাপন্ন দেশের মধ্যেও অন্তত অনেক কিছু বিষয়ে মতপার্থক্য থাকতেই পারে, যদি না একটি দেশ আরেকটি দেশের পদাবনত হয়ে থাকতে চায়। ভারত এবং বাংলাদেশ এটি স্বীকার করতে চাইছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝেই দুই পক্ষই ক্ষুব্ধ হচ্ছিল। ফল স্বরূপ সামান্য মত পার্থক্যগুলো, যেগুলো প্রকাশ্য আলোচনার মাধ্যমে সহজেই সমাধান করা সম্ভব হতো সেগুলোই এক সময় বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হচ্ছিল।

ইন্দিরা গান্ধী টাইমস পত্রিকাকে দেয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ তাদের নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নরকের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে, কেন তারা সেটি বিসর্জন দিবে?'

অন্য বাঙালির থেকে নিজেদের আলাদা করার জন্য বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের বাঙালী হিসেবে পরিচয় দিতেন।

এরপরও বাংলাদেশের মানুষ নিজেদের স্বকীয় পরিচয় বজায় রাখার যে চেষ্টা করতেন, পশ্চিমবঙ্গের অনেকে সেটি পছন্দ করতেন না। তারা একক বাঙালী সংস্কৃতির উপর জোর দিতেন। যখন কোলকাতার একজন লেখক ঢাকায় জনসভায় তার বক্তব্যের শুরুতে বলেন, 'এ পার বাংলা, ও পার বাংলা'' তখন সমবেত জনতা 'না! না!' করে প্রতিবাদ জানান।

মুক্তিযুদ্ধ বাঙালীর সংবেদনশীলতার ধার বাড়িয়ে দিয়েছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর তারা অল্পতেই আহত হচ্ছিল এবং মাঝে মাঝে এমন কি ভারতীয়দের সহায়তা করার উদ্যোগকেও ভারতীয়দের আধিপত্যবাদিতার নমুনা মনে করতো। তবে কিছু কিছু ভারতীয়ও খুব বেশি অধৈর্য্য আচরণ করছিলেন। একজন ভারতীয় সাংবাদিক বাংলা বাংলাদেশের মুসলমানদের ভাষা নয় এমনটি বলার নির্বুদ্ধিতাও দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে তিনি বাজে কৌতুক করে বলেছিলেন, 'তাদের কৃষি ছাড়া অন্য কোন সংস্কৃতি নেই।' অল্প কয়েকজনই এতটা নির্বুদ্ধিতা দেখিয়েছিলেন, তবে অনেকেই বাংলাদেশের মানুষ যে ভাষায় কথা বলে তার মধ্যে ভুল ধরছিলেন। মাতৃভাষার জন্য বাংলাদেশের মানুষ যে ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন তারপর তারা কোন অবস্থাতেই বিদেশীদের তাদের কথা বলার ধরণ ঠিক করতে দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এর অন্য একটি দিকও আছে।

বাংলাদেশ সফররত যে কোন ভারতীয় সামান্য সমস্যাতেও বিরক্তি দেখাতেন, অন্য দেশের ক্ষেত্রে হলে হয়তো এ ধরণের সমস্যা তিনি আমলেই নিতেন না। একইভাবে একজন বাঙালীও ভারতে এসে তারা প্রত্যাশা অনুসারে আতিথেয়তা না পেলে অসুখী হচ্ছিলেন। ১৯৭১ বা ১৯৭২ সালে ভারত সফর করে থাকলে তিনি সে সময়ের সাথে তুলনা করা আরম্ভ করে দিতেন। দুই দেশের মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কই এসব প্রত্যাশার জন্ম দিত।

একজন বাঙালী সব সময় ভারতে নিজেকে বিদেশী মনে করতেন না। এই লেখককে বাংলাদেশের একজন কূটনীতিক বলেছিলেন, 'দিল্লী থেকে বেরিয়ে গিয়ে ভারতের অন্য কোথাও গেলেই আমি যে একজন কূটনীতিক তা ভুলে যাই। অন্য কোন দেশে এমনটি হয় না।'

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সামান্য বিরক্তিগুলোর কথা যেভাবে শোনা যায়, দুই দেশের জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক সৌহার্দ্য তা নিয়ে তেমন কথা বলা হয় না।

কেরালার একজন নার্স ভারতীয় হওয়ার কারণে বাংলাদেশের গ্রামবাসীর কাছে যে বিশেষ সম্মান পেয়েছিলেন সে সম্পর্কে ঢাকায় সাংবাদিকদের বলেন, 'নারীরা আমার কাছে ভারত সম্পর্কে জানতে চাইতেন। আমি ইন্দিরা গান্ধীর দেশ থেকে এসেছি এটিই তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের সরলতার কারণে তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিলেন আমি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে কখনো দেখা করেছি কি না।'

একজন সাংবাদিক ঐ নার্সকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি ভয় পান না?' না বাংলাদেশে যে কয়েক মাস তিনি ছিলেন তাকে কোন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি।

যে এলাকায় তিনি কাজ করেছিলেন সেখানে কেউ তাকে অপছন্দ করতে পারে এরকম ধারণার কথা শুনে তিনি হেসেছিলেন। বাংলায় তিনি তখন স্বাচ্ছন্দে কথা বলতে পারলেও যখন তিনি কাজ শুরু করেছিলেন তখন তিনি এ ভাষাটি সম্পর্কে সামান্যই জানতেন। কিন্তু এমন কি এটিও বাংলাদেশে কাজ করার পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেনি। ঐ নার্সের অভিজ্ঞতা অল্প কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় সফর করে যাওয়া সাংবাদিকদের তুলনায়, যারা আবার অধিকাংশ সময়ই অন্য সাংবাদিকদের সাথেই বেশি সময় কাটাতেন, বেশি সঠিক ছিল । কিন্তু খুব অল্প সাংবাদিকই ঐ নার্সের অভিজ্ঞতা এমন কি উল্লেখ করারও প্রয়োজন মনে করেন নি।

অনেক ভারতীয়ই মনে করেন দ্রুত বাংলাদেশ থেকে সেনা বাহিনী সরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারত ভুল করেছিল। এ বিষয়ে মেজর কে. ব্রহ্মা সিং বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ থেকে দ্রুত সেনা প্রত্যাহার করায় ভারতের একটি নৈতিক বিজয় হলেও, এটিকে এক ধরণের কূটনৈতিক পরাজয় বলা যেতে পারে।' তার মতে

'যারা বাংলাদেশের অস্থিতিশীলতার সময়ে ভারতীয় সেনা বাহিনীর অনুপস্থিতিতে বাংলাদেশের অসহায়ত্বের সুযোগ নিতে চায় ভারতের এমন সিদ্ধান্ত তাদের পক্ষেই কাজ করেছে'।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে ভারতের সংসদে বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করার সময়েই ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন 'প্রয়োজনের চেয়ে বেশি' সময় ভারতীয় সেনা বাহিনী বাংলাদেশে থাকবে না। বাংলাদেশে আটকে থাকা সকল যুদ্ধবন্দীকে ভারতে সরিয়ে না নেয়া এবং ভারতে থাকা ১০ মিলিয়ন বাঙালী শরণার্থী দেশে ফেরত না আসা পর্যন্ত ভারতীয় সেনাদের ফিরে যাবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু এ দুটি কাজ সম্পাদন হয়ে যাবার পরও ভারতীয় সেনা বাহিনী বাংলাদেশে থেকে গেলে সেটি মারাত্মক সমস্যা তৈরি করতো।

সে সময় বাংলাদেশের এবং ভারতের নেতাদের প্রায়ই যে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হতো তা হল কবে নাগাদ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনা প্রত্যাহার করা হবে। ১৯৭১ সালের ২৭ ডিসেম্বরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন (এনবিসি) কে সাক্ষাৎকার দেয়ার সময় ইন্দিরা গান্ধী এর জবাবে বলেছিলেন, 'আমি আশা করবো খুব শিগ্রই এটি ঘটবে।' এনবিসি তখন তাকে প্রশ্ন করেছিল, 'ভারতীয় বাহিনীর অনির্দিষ্ট কালের জন্য বাংলাদেশে অবস্থান করার কোন সম্ভাবনা আছে কি?' ইন্দিরা জবাবে বলেছিলেন, 'ওহ! নিশ্চয়ই না।' পরবর্তী প্রশ্ন ছিল, 'বাংলাদেশের সরকার যদি অস্থিতিশীল প্রমাণিত হয় তখন কি ভারতীয় সেনাবাহিনী সেদেশে থেকে যাবে।' ইন্দিরা কখনোই ভাবেননি বাংলাদেশ সরকার অস্থিতিশীল হবে। তিনি বলেছিলেন, 'তারা সবাই ব্যাপক একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব এবং তাদের সামনে রয়েছে বিশাল দায়িত্ব।'

ভারতীয় সেনা বাহিনী কোন না কোন অজুহাতে বাংলাদেশে থেকে যাবে বলে যারা গোপনে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছিলেন, ইন্দিরা তার দেশের সেনাবাহিনী দ্রুত বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে এনে তাদের মিথ্যা প্রমাণ করেছিলেন।

ব্রহ্মা সিং বলেছিলেন, 'এমন কি বাংলাদেশও বহির্বিশ্বের কাছে দেশটি যে কোন বিদেশী প্রভাবমুক্ত ছিল প্রমাণ করে অন্যান্য রাষ্ট্র সমূহের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানানোর সময় বুঝতে পারেনি যে তারা আসলে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্রকেই সাহায্য করছিল এবং তাদের কাজ সহজ করে দিচ্ছিল।'

সংগত কারণেই বাংলাদেশ যত দ্রুত যত বেশি সংখ্যক রাষ্ট্রের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়া যায় সে চেষ্টা করছিল, এবং অনেক রাষ্ট্রই স্বীকৃতি দেয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে এদেশ থেকে সকল বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের কথা বলছিল। এরচেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশে ভারতীয় সেনার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান দেশের সার্বভৌমত্বের ক্ষতি সাধন করছিল।

বাঙালীর অনেকেই মনে করেন যে, মুজিব ফিরে না আসলে ভারতীয় বাহিনী হয়তো বাংলাদেশে থেকে যেতো। তারা ভুল করেন। ভারত তার সেনা সরিয়ে নিতে উদগ্রীব ছিল এবং ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ এর মধ্যে অর্থাৎ মুজিব দেশে ফেরার ১০ দিন আগে ভারতীয় সৈনিকদের প্রায় অর্ধেককেই সরিয়ে নিয়েছিল, তবে মুজিব সবকিছুর দায়িত্ব বুঝে না নিলে হয়তো ভারতের পক্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার তিন মাসের মধ্যে সকল সেনা প্রত্যাহার করা সম্ভব হতো না।

মুক্তি বাহিনীর কিছু অংশ ঘোষণা করেছিল মুজিব ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা অস্ত্র সমর্পণ করবে না, এবং তাদের বিপরীতে তখনকার সরকারও ক্ষমতাহীন ছিল। কেবল মুজিবেরই তাদেরকে অস্ত্র সমর্পণ করানোর মতো ক্যারিশমা ছিল। হয়তো এমনকি অর্ধেক অস্ত্রও সমর্পিত হয়নি, কিন্তু মুক্তিবাহিনীর সকল অংশই মুজিবের কর্তৃত্ব মেনে নিয়েছিল।

এস. এম. আলি তার 'আফটার দ্যা ডার্ক নাইট' নামক গ্রন্থে বলেছিলেন যে, মুজিব ফিরে না এলে ভারত হয়তো বাংলাদেশ সরকারকে এসব যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতে সহায়তা করতো। তখন চারিদিকে অনেক অস্ত্র ছিল। মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্রীকরণের যে কোন উদ্যোগের ফলে ব্যাপক সংঘর্ষ দেখা দিত এবং এর ফলে একটি বিপর্যয় ঘটতো। ভারত এই বিপদ সম্পর্কে ভালোভাবেই জানতো।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর বেশ কয়েকবার বাংলাদেশ ও ভারতের বাহিনী প্রায় সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিল, তবে কর্মকর্তা পর্যায়ের কেউ এসবে জড়িত ছিলেন না। বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী এবং মুক্তি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে না জড়ানোর জন্য ভারতীয় সেনা কর্মকর্তারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তাদের সুনাম ক্ষুণ্ন হওয়ার আগেই দেশে ফিরতে পেরে ভারতীয় সেনারা সন্তুষ্ট ছিল।

মুজিব হত্যার প্রায় বছর খানেক পরে ১৯৭৬ সালের ২ আগস্ট এন্থনি ম্যাসকার্নহাস লন্ডনের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশন (আইটিভি) এ স্বঘোষিত বঙ্গবন্ধুর হত্যার পরিকল্পনাকারী লেফটেনেন্ট কর্নেল ফারুক এবং মেজর রশিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সেখানে ম্যাসকার্নহাস তার মন্তব্যে বলেছিলেন মুজিব 'যা কিছু সামরিক' এমন সবকিছুই অপছন্দ করতেন, এ কারণে তিনি নিজের সেনাবাহিনীকেও বিশ্বাস করতেন না, আর নিজের দেশের নিরাপত্তার জন্য 'ভারতের দ্বারস্থ' হয়েছিলেন।

মুজিব যদি সেনাবাহিনীর লোকদের বিশ্বাস না করে থাকেন, তবে তা ছিল খুবই স্বাভাবিক। তিনি পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর উত্থান হতে দেখেছিলেন এবং পাকিস্তানি সামরিক জান্তার হাতে নির্যাতিত হয়েছিলেন। কিন্তু 'তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে তার নিজের দেশের সেনাবাহিনীকে উপেক্ষা করতেন' এবং নিজ দেশের নিরাপত্তার জন্য ভারতের দ্বারস্থ হতেন এমন বললে তা হবে নির্জলা মিথ্যাচার। তার দিক থেকে ত্রুটি ছিল তিনি অনেক সময়ই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাজউদ্দীন বলেছিলেন যে মুক্তি বাহিনীকে ঘিরে একটি জনগণের আধাসামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হবে। জনগণ তখন একটি বিশাল সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিল না; তারা ভেবেছিল, নিজেরাই সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীন হওয়া দেশটির নিরাপত্তা বিধান করতে পারবেন।

মুজিব মনে করতেন একটি বিশাল সেনাবাহিনী প্রতিপালন করতে গিয়ে দেশের সীমিত সম্পদের অপচয় করা হবে। সাংঘর্ষিক নীতি গ্রহণের ফলেই পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল, এ কারণেই মুজিব চাইছিলেন বন্ধুভাবাপন্ন নীতি গ্রহণ করতে এবং সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখতে। ১২ জানুয়ারি ১৯৭২ এ সংবাদ সম্মেলনে মুজিব যখন বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন তখন তিনি এটিই বোঝাতে চেয়েছিলেন।

এরপরও শুরুতে তিনি এমন যে কোন পদক্ষেপ নিতে অনাগ্রহী ছিলেন যা তাকে কোন গোষ্ঠী থেকে দূরে ঠেলে দিতে পারে।

যথাযথ আনুগত্য প্রদর্শন না করার অভিযোগে মেজর জলিলকে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প পরেই কারাবন্দী করা হয়। জলিল দাবি করেছিলেন তিনি ভারতীয় বাহিনীকে বাংলাদেশ থেকে যন্ত্রাদি পাচারে বাধা দেয়ায় তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে।

মুজিব তাকে মুক্ত করে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার এ সিদ্ধান্ত হয়তো সঠিক ছিল না, কিন্তু এটি নিশ্চয়ই 'নিজ দেশের নিরাপত্তার জন্য ভারতের দ্বারস্থ হন' এমন কোন ব্যক্তির মতো সিদ্ধান্ত হয়নি।

মুজিব সেনা বাহিনীর কর্মকর্তাদের দ্রুত পদোন্নতি দিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসা বাঙালী সেনা কর্মকর্তাদের নতুন করে বোঝানোর কোন প্রয়োজন মনে করেননি। তবে তাদের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এতটাই গুরুতর ছিল যে তাদেরকে সেনাবাহিনী থেকে অব্যাহতি দিতে হয়েছিল, কিন্তু তাদের প্রায় সবাইকেই মুজিব বাহিনীতে পুনর্নিয়োগ দিয়েছিলেন।

পাকিস্তান থেকে পুনর্বাসিতদের সম্পর্কে মুজিব বলেছিলেন, 'তারা বাঙালী এবং তাদেরকে বাংলাদেশের সেবা করার সুযোগ দেয়া উচিৎ।'

মোসলেমউদ্দীন নামে যে সেনা সদস্য মুজিবকে গুলি করে হত্যা করেছিলেন, তিনিও এসব পুনর্বাসিত সেনা সদস্যদের মধ্যে একজন ছিলেন।

বাংলাদেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় লেখক এবং সাংবাদিক আব্দুল গাফফার চৌধুরী বলেন, 'মুজিবের প্রধান সংকট ছিল যে তিনি সেনা বাহিনী এবং আমলাতন্ত্রের উপর বিশ্বাস করতে না পারলেও তাদেরকে বাদ দিয়ে কিছু করতে পারছিলেন না।'

নব্য স্বাধীন হওয়া সব দেশের নেতাদেরই এমন সংকট মোকাবেলা করতে হয়েছে।

মুজিব যখন এই সংকট থেকে প্রায় বেরিয়ে এসেছিলেন ঠিক সে সময়ই তাকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল।

আব্দুস সামাদ আজাদ বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করার একদিন পর ৩০ ডিসেম্বর ১৯৭১ এ বলেছিলেন যে, ভারতের সাথে কোন বিশেষ মিত্রতার চুক্তি করার প্রয়োজন নেই। ৩১ ডিসেম্বরে ইন্দিরা গান্ধী কে যখন বাংলাদেশের নিরাপত্তার জন্য ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কোন নিরাপত্তা চুক্তি হতে পারে কি না এ সংক্রান্ত প্রশ্ন সংবাদ সম্মেলনে করা হয়েছিল, তখন তিনি সামাদ আজাদের এই বক্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, 'যদি সেরকম কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় তখন আমরা তা ভেবে দেখবো।'

ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে অবস্থান করা কালিন এমন কোন নিরাপত্তা চুক্তি করা হলে তা বাংলাদেশের উপর চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে বলে মনে করা হতো। কিন্তু ১৯৭২ এ মুজিব দেশে ফেরার পর এবং বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় বাহিনী ফিরে যাবার পর, কিছু ভারতীয় কর্মকর্তা মনে করেছিলেন যে বাংলাদেশ ও ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কটিকে একটি আনুষ্ঠানিক আকার দেয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশে এই মৈত্রী চুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছিল, তা ছিল খুবই হালকা, অন্তত শুরুর দিকে। যদি তাজউদ্দীন এমন কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতেন তাহলে মন্ত্রীসভার ভেতর থেকেই এর প্রতিবাদ করা হতো এবং তাঁকে একটি ব্যাপক ঝড়ের মোকাবেলা করতে হতো।

মুজিবের কড়া সমালোচকদের মধ্যে অনেকে ১৯৭২ সালের ভারত-বাংলাদেশ চুক্তিকে ভারতের প্রতি মুজিবের আনুগত্যের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করেন, কিন্তু মুজিব হত্যার পর ঐ চুক্তিতে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের হানি হয় এমন গোপন ধারা ছিল বলে যে অভিযোগ তারা আগে করেছিলেন তা প্রমাণে ব্যর্থ হন।

১৯৭২ এ ভারতের একজন শীর্ষ স্থানীয় সাংবাদিক এস. এম. আলিকে বলেন, 'আমরা এখন আর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সাথে দেন দরবার করছি না যাকে যখন যেমন খুশি কি করলে তার দেশের ভালো বা মন্দ হবে তা নিয়ে উপদেশ দেয়া সম্ভব। এখন আমাদের লেনদেন হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে, তিনি তখনই আমাদের উপদেশ শুনবেন যখন তিনি আমাদের কাছে উপদেশ চাইবেন।'

এটা ১৯৭২ এর কথা বলা হচ্ছে, তখনো মুজিব ধীরে ধীরে সব বুঝে উঠছিলেন। যতোই তার আত্মবিশ্বাস বাড়ছিল ততোই তিনি স্বাধীন হয়ে উঠছিলেন, এবং এপ্রিল ১৯৭৩ এর নির্বাচন যেটিতে ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯১ টিতে আওয়ামী

লীগ জয়লাভ করেছিল, তার পরে তিনি বেশ কর্তৃত্বপরায়ণ এবং ক্ষেত্র বিশেষে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলেন।

১৯৭২ এ ভারতের নিজের খাদ্য পরিস্থিতি কঠিন হওয়া সত্ত্বেও তারা এক মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল। এর চেয়েও দরকারি বিষয় হলো চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকা কালে এবং রেল লাইনগুলো তখনো সংস্কারাধীন থাকা কালে কেবল ভারতের পক্ষেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে পৌঁছা সম্ভব ছিল। এমন দক্ষতার সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ব্যবহারযোগ্য সকল জাহাজ এবং রেলের ওয়াগন ব্যবহার করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসে এ দেশে সরবরাহ নিশ্চিত করেছিল; যেমন দক্ষতা তারা এর আগে কখনো দেখায়নি। রেলপথ ও সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা সংস্কারের কাজেও ভারত বাংলাদেশকে সহযোগিতা করেছে।

যে সব লোকের রাজনীতির উদ্দেশ্যই ছিল কেবল ভারতের সমালোচনা করা মুজিব প্রায়ই তাদের তিরস্কার করতেন। তিনি বার বার বলতেন, 'ভারতের নিন্দা করা যেন একটি ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে।' তিনি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতেন যে ভারতের নিঃস্বার্থ সহায়তা ছাড়া স্বাধীনতার পর পর কঠিন সময়ে বাংলাদেশে হাজারো মানুষ না খেয়ে মারা যেত।

তবে ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকলেও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয়ে অন্য কোন রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ তিনি মেনে নিতেন না।

১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তার প্রথম জনসভায় মুজিব বাংলাদেশকে যাবতীয় সাহায্য করার জন্য ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন, কিন্তু বাংলাদেশ তার নিজের বিষয় দেখভাল করার মতো পরিপক্বতা অর্জন করেছে এবং এ বিষয়ে বহিঃরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কামনা করে না বলেও জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'ভারত যদি আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহলে শেখ মুজিবুর রহমান জানেন কিভাবে তাদের মোকাবেলা করতে হবে।'

মুজিব সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনেক গুরুত্ব দিতেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি দ্বিতীয় যে দেশটি সফর করেন তা হলো এই সোভিয়েত ইউনিয়ন। একই সঙ্গে তিনি চীনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্যও প্রচণ্ড চেষ্টা করতেন, মাঝে মাঝে একটু হয়তো বেশিই চেষ্টা করতেন।

বাংলাদেশ এটা ভুলে যায়নি যে ভারত এবং ভুটানের পর পূর্ব জার্মানীই প্রথম দেশ যারা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। পূর্ব জার্মানীর সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা হলে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে বিলম্ব করতে পারে–পশ্চিম জার্মানীর পক্ষ থেকে এমন প্রচ্ছন্ন হুমকি থাকার পরও বাংলাদেশ পূর্ব জার্মানীর সাথে পূর্ণাঙ্গ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

অন্যদিকে বাংলাদেশও সমাজতান্ত্রিক ব্লকের বাইরের প্রথম দেশ যারা ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করেনি।

কিন্তু মুজিব একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির পক্ষে ছিলেন এবং সোভিয়েত বা অন্য যে কোন ব্লকের সাথে একজোট হওয়ার আগ্রহ তার ছিল না।

বাংলাদেশ ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আসা কূটনৈতিক সম্পর্কের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে একদম শুরুতেই। বাংলাদেশের সমর্থন ছিল প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশানের প্রতি এবং বাংলাদেশ এ বিষয়ে আরব দেশগুলোর সাথে সংহতি জানিয়েছিল এবং ১৯৭৩ সালের পশ্চিম এশীয় যুদ্ধে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছা সেবক পাঠানোর প্রস্তাবও পাঠানো হয়েছিল।

পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলে ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে লাহোরে আয়োজিত ইসলামিক সম্মেলনে যাবেন না বলে মুজিব দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমন কি পাকিস্তান এ শর্ত মেনে নেয়ার পরও মুজিবের মন্ত্রীসভার দুই একজন সহ অনেকেই ভাবছিলেন ঐ সম্মেলনে মুজিবের যোগ দেয়াটা সঠিক হবে কি না। এর ফলে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো উৎসাহিত হবে এবং ভারতের পক্ষ থেকেও কেউ কেউ ভুল বুঝতে পারে।

মুজিবের একজন ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগী তাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি যেন ঐ সম্মেলন থেকে ফেরার পথে দিল্লীতে একটি যাত্রা বিরতি করেন। এই পরামর্শ প্রত্যাখান করে মুজিব রাগত স্বরে বলেন, 'আমার কাউকে কোন কৈফিয়ত দিতে হবে না, আমার দেশের জন্য আমি যা ভালো মনে করি করতে পারি।'

সম্মেলনে সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সাল যখন বাংলাদেশের সংবিধান থেকে অসাম্প্রদায়িকতা বাদ দিয়ে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন তখন মুজিব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবুও পরবর্তীতে বাংলাদেশ সৌদী আরবের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করার চেষ্টা চালিয়ে যায়।

হয়তো চীন বা সৌদী আরবের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেশটি তার নিজের মতো করে একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছিল।

মনে হতে পারে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে কোন পক্ষই পাকিস্তানের সাথে অপর পক্ষের সুসম্পর্ক ভালোভাবে নিতে পারেনি। অন্যকিছুর চেয়ে এটি বরং মূলত আবেগের বিষয়। কিন্তু আবেগ সংক্রান্ত বিষয়গুলো যদি বাদ দিয়ে দেয়া হয় তাহলে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্কের অনেক কিছুই ব্যাখ্যাতীত থেকে যাবে।

ভারতের সঙ্গে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরের আগে ভুট্টো ইন্দিরা গান্ধীকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিল পাকিস্তান শিঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিবে।

কিন্তু অনেক বাঙালীই ভেবেছিলেন পাকিস্তানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের জন্য উদগ্রীব থাকায় ইন্দিরা হয়তো পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল কি না দিল তা নিয়ে অতোটা ভাবিত ছিলেন না। ঢাকার সংবাদপত্রগুলো সিমলা চুক্তিকে স্বাগত জানালেও তারা মত প্রকাশ করে এই উপমহাদেশে কোন চুক্তিই দীর্ঘ মেয়াদে শান্তি বজায় রাখতে পারবে না যদি না বাংলাদেশও এর একটি পক্ষ হয়।

১৯৭৪ এর জুন মাসে যখন ভুট্টো ঢাকায় আসেন সিমলা চুক্তির দুই বছর পর, তখন ভারতে অনেকেই আশঙ্কা করেছিলেন যে ঢাকার সঙ্গে আবার পাকিস্তানের ব্যাপক সখ্য তৈরি হবে এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও গুরুতর পরিবর্তন আসবে।

ঢাকায় ভুট্টোর সরকারী সফরের একদিন আগে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার সুবিমল দত্ত ঢাকা ত্যাগ করেন।

সুবিমল দত্ত'র মতো একজন প্রাজ্ঞ কর্মকর্তা কি করে এটি প্রকাশ করে ফেলেন যে তিনি ভুট্টোর মুখ দেখতে চান না এটি ভেবে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু সুবিমল দত্ত বাংলাদেশের চট্টগ্রাম অঞ্চলের লোক হওয়ায় বাংলাদেশের প্রতি তার একটি আলাদা মমত্ববোধ ছিল।

যে দেশে তিনি কূটনীতিক হিসেবে কাজ করছিলেন সে দেশটির প্রতি এমন মমত্ববোধ থাকা সঠিক কি না এ প্রশ্নটি সামনে চলে এসেছিল। কি কি গুণ থাকলে একজন ব্যক্তি ভালো কূটনীতিক হতে পারেন যে বিষয়ে চাইলে অনেক কথাই বলা যায়।

কিন্তু এ বিষয়েও সন্দেহ রয়েছে যে এমন কি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও যদি কোন একজন কূটনীতিককে বাংলাদেশে দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হতো তাকে দেশটির মানুষ সুবিমল দত্তকে যতোটা ভালোবেসেছিল এবং মর্যাদা দিয়েছিল তার অর্ধেক ভালোবাসা বা মর্যাদা দিত কি না।

সুবিমল দত্ত ছিলেন বাংলাদেশে সবচেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত কূটনীতিক। তিনি চাইলে যে কোন সময়েই মুজিবের সাথে দেখা করতে পারতেন। মুজিব কূটনৈতিক শিষ্টাচারের তোয়াক্কা না করে সুবিমল দত্তকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করতেন। কিন্তু সুবিমল দত্ত জানতেন মুজিবের সাথে যখন তিনি লেনদেন করছেন তখন তিনি এমন একজন মানুষের সাথে কথা বলছেন যিনি গর্বিত এবং দৃঢ়চেতা।

সুবিমল দত্ত সম্পর্কে দুজন ভারতীয় বিপ্লবীকে মুজিব বলেছিলেন, 'আপনারা কি জানেন সুবিমল বাবু কি চমৎকার কাজ করেছেন? আমাদের কাছে তিনি কোন বিদেশী কূটনীতিক নন। তিনি আমাদেরই বড় ভাই। আমরা তাকে দাদা বলে সম্বোধন করে থাকি। আজ যখন তিনি চলে যাচ্ছেন, আমাদের উচিৎ তাকে বাংলাদেশের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব দেয়া।'

১৯৭৫ এ মুজিব প্রায়ই বলতেন, 'বাংলাদেশকে অবশ্যই ভারতের সাথে মিত্রতা করতে পারতে হবে। তবে প্রশ্ন হলোঃ কোন ভারত?' ভারতের অসাম্প্রদায়িক শক্তি আর সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলোর মধ্যে মুজিব স্পষ্ট বিভাজন করতেন। ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তি উৎসাহিত হয় এমন কিছু করা বাংলাদেশের উচিৎ হবে না, কারণ ভারতে সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান ঘটলে তা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকর হবে।

ভারতের সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশে বাংলাদেশের সমালোচনা করে লেখা সম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ মুজিবকে ক্ষিপ্ত করেছিল। ১৯৭৫ এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে এই লেখককে মুজিব বলেছিলেন, 'ভারতে আপনার বন্ধুদের জানিয়ে দিবেন আমরা বাঙালীরা সাম্প্রদায়িক নই।'

রাজনৈতিক মধ্যস্বত্বভোগীরা

সকল বিপ্লবের ফলেই ব্যাপক শক্তির স্ফুরণ ঘটে, এবং অন্তত শুরুর কয়েকদিনের জন্য মিতব্যয়িতা অথবা এমন কি কৃচ্ছ সাধনের ওপর জোর দেয়। ক্রেইন ব্রিন্টন বলেছিলেন, 'ইনডিপেনডেন্টরা, জ্যাকোবিনরা, বলশেভিকরা এরা সবাই সব ধরণের কর্মকাণ্ডকে একটি আদর্শ আকার দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন, এবং এই আদর্শ আকারের উৎস ছিল গভীর, তাদের আবেগের মধ্যে। এদের সবার কৃচ্ছ্রব্রতের প্রতি আগ্রহটি বেশ কৌতুহলোদ্দীপকভাবে এক ধরণের, অথবা কেউ বলতে পারেন এরা সবাই আমাদের ভাষায় সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুদের এ বিষয়ক মতামতকে চেপে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন।'

বিপ্লবের পরের ক্রান্তিকালে ত্যাগ স্বীকার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে এটা মনে রাখতে হবে শুধু বিপ্লবী সমাজেই কৃচ্ছতার অনুশীলন হয় এমন নয়। যুদ্ধ পরবর্তী ইংল্যান্ডে জনগণ কৃচ্ছতাকে তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া বিষয় মনে করেন নি, বরং এটি তাদের জাতিকে টিকিয়ে রাখার সম্মিলিত উদ্যোগ ছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মধ্যে যে হতাশাজনক বৈশিষ্ট্য দেখা যাচ্ছিল তা হলো রাজনীতিসহ সমাজের সর্বত্রই দ্রুত অনেক কিছু অর্জনের চেষ্টা। এমনকি তরুণ 'বিপ্লবী'দের মধ্যেও একটি সাধারণ একনিষ্ঠতার অভাব দেখা যাচ্ছিল।

যে সব ছাত্র নেতা মুজিব ফিরে না আসা পর্যন্ত অস্ত্র সমর্পণ না করার ঘোষণা দিয়ে ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম চার জন ছিলেন আ. স. ম. আব্দুর রব, শাহজাহান সিরাজ, নূর-ই-আলম সিদ্দিকী এবং আব্দুল কুদ্দুস মাখন। এই চারজনকে কৌতুক করে 'চার খলিফা' বলা হত।

মনে হচ্ছিল এই চারজন একজোট হয়েই থাকবেন। কিন্তু রব স্বাধীনতার পর পরই সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে 'সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে' মুজিবের নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করার দাবি জানিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কথা বলতেন এবং পূর্ণ সমাজতন্ত্রের নিশ্চয়তা দেয় এমন একটি সংবিধান চাইতেন।

দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল বলতে যে সব রাজনৈতিক দল মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তাদেরকে বুঝিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিকলীগ এই দাবির সাথে একাত্মতা জানিয়েছিল।

আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল: আ.স.ম. আব্দুর রব ও শাহজাহান সিরাজ ছিলেন একদিকে এবং অন্যদিকে ছিলেন নূর-ই-আলম সিদ্দিকী ও আব্দুল কুদ্দুস মাখন।

রব-সিরাজের নেতৃত্বাধীন অংশটি 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' সমর্থন করতো। সিদ্দিকী-মাখনের নেতৃত্বাধীন অংশটি মুজিববাদের সমর্থক ছিল এবং সকল বিদেশী মতবাদের বিপক্ষে ছিল।

কিছু সময় মুজিব কোন পক্ষই নেন নি, তিনি হয়তো ভেবেছিলেন যে এ দুটি অংশ এক সময় নিজেদের দ্বন্দ্ব নিজেরাই মিটিয়ে নিয়ে আবার একজোট হয়ে যাবে। কিন্তু এসব মতপার্থক্য, যার পেছনের কারণগুলো ছিল অনেকাংশেই ব্যক্তিগত এগুলো এতটাই তীব্র ছিল যে এদেরকে আর ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। এটি মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন যখন তিনি মাখন এবং সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের জাতীয় কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছিলেন।

একটি জনসভায় রব বলেছিলেন, 'মুজিব, আপনি অস্ত্রের কথা বলেন। কিন্তু আপনি কি জানেন কিভাবে অস্ত্র চালাতে হয়? আমরা অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ পেয়েছি।' রবের এ বক্তব্য বিষয়ে একজন বিদেশী সাংবাদিক মুজিবকে মন্তব্য করতে বললে মুজিব বলেছিলেন, 'রব? ওর কথা বাদ দিন। সে তো আমার ছেলের মতোই।'

কিন্তু মুজিবের এই পুত্ররা তার সমালোচনায় ক্রমেই প্রখর হয়ে উঠছিলেন।

ছাত্রলীগের রব-সিরাজ অংশটি একটি নতুন রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র হয়ে ওঠে- জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), এর কার্যক্রম শুরু হয় ৩০ অক্টোবর ১৯৭২ এ। ১৯৭৩ এর ১৪ জানুয়ারি এ দলটির যে ইশতেহার প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়, 'জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জন্ম হয়েছে আগামী দিনে একটি যথার্থ শ্রেণী সংগঠনের নেতৃত্বে যে সামাজিক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হবে সে সময় একটি 'সহায়ক শক্তি' হিসেবে ক্রিয়াশীল হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও কর্মসূচি নিয়ে।' জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নিজেদের একটি পেটি বুর্জোয়া দলের চেয়ে বেশি কিছু দাবি করেনি, যারা এখনো জন্ম হয়নি এমন একটি 'যথার্থ শ্রেণী সংগঠনের' পূর্বসুরি। এরপরও ঐ ইশতেহারে বলা হয়েছিল, 'আমাদের মূল লক্ষ্য হলো কৃষক, শ্রমিক এবং শ্রমজীবী মানুষের প্রকৃত প্রতিনিধিদের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা দেয়া, যারা একটি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে কৃষক, শ্রমিক, প্রলেতারিয়েত, কর্মজীবী মধ্যবিত্ত, প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের এবং তরুণদের নতুন নেতৃত্ব তৈরি করবে এবং একটি শ্রেণীহীন ও শোষণমুক্ত কৃষক-শ্রমিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে, এটিই সমাজতন্ত্র।'

কৃষক-শ্রমিকের শাসন বলতে শ্রেণীহীন সমাজ বোঝায় না। কোন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী তা সে যতই প্রগতিশীল আর মহৎ উদ্দেশ্য সমৃদ্ধ হোক না কেন, কখনোই মধ্যস্বত্বভোগী হিসেবে কাজ করে প্রলেতারিয়েতের হাতে 'ক্ষমতা তুলে দেয়ার' কাজ করতে পারে না।

ঐ ইশতেহারটি ছিল আশাহত করার মত ত্রুটিপূর্ণ।

এন.এম. হারুণ বলেছিলেন, 'জাসদের পেটি বুর্জোয়ারা এর ফলে অবাস্তব সমাজতন্ত্রের স্বপ্নের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে।' এই অবাস্তব স্বপ্ন জাসদকে আত্মঘাতী পথে নিয়ে গিয়েছিল।

জাসদ ১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার প্রস্তাব করলেও এ দলটি ১৯৭৩ সালে নিজেদের আরও ব্যাপকভাবে পরিচিত করার লক্ষ্যে সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয়। যদিও দলটি জাতীয় সংসদের ৩০০ আসনের মাত্র একটিতেই জয় পেয়েছিল, তারা মোট ভোটের শতকরা ৮ ভাগ পাওয়ার দাবি করেছিল। একটি নবগঠিত দলের তুলনায় এমন সমর্থন পাওয়াটা অবশ্যই প্রশংসনীয় ছিল।

১৯৭৩ সালে জাসদকে ভবিষ্যতের দল মনে হচ্ছিল। কিন্তু জাসদ নেতারা অধৈর্য্য ছিলেন এবং এক সময় নিজেদের রাজনৈতিক স্ববিরোধীতার বলি হয়েছিলেন। দলটি ১৯৭৩ সালের নির্বাচনের পর যখন তাদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তখন হঠাৎ করেই তাদের বিপ্লবী দায়িত্বের কথা স্মরণ করে।

ঐ সম্মেলনে যে রাজনৈতিক প্রতিবেদন পেশ করা হয় সেখানে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছিল, 'এদেশে যদি আরেকটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তা হবে শ্রমজীবী মানুষের নির্বাচন। সেটি কোন শোষণ নির্ভর মিথ্যা গণতন্ত্রের নির্বাচন হবে না।' প্রতিবেদনটিতে একটি গণ বাহিনীর কথা বলা হয়েছিল।

৩০ ডিসেম্বর ১৯৭৩ এ পল্টন ময়দানে জাসদের যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেখানে জাসদ সভাপতি এম.এ. জলিল উদ্ধত কণ্ঠে বলেছিলেন, 'বিপ্লবই এখন সবচেয়ে জরুরী।' আ. স. ম. আব্দুর রব সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'জনতাকে অস্ত্র হাতে তুলে নিতে বাধ্য করবেন না।' সারাদেশ ব্যাপী জাসদ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল এবং ১৯৭৪ এর জানুয়ারিতে জনসভা করেছিল। এসব কর্মসূচিতে যে জন সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল তাতে আরও সাহসী হয়ে ১৯৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদ সরাষ্ট্র মন্ত্রী এম. মনসুর আলীর বাসভবন 'ঘেরাও' করেছিল এবং সেটির উপর হামলা করার হুমকি দিয়েছিল। তখন পুলিশ জাসদ কর্মীদের উপর গুলি চালিয়েছিল এবং এর ফলে অন্তত আট জন নিহত হয়েছিলেন এবং আরও অনেকে আহত হয়েছিলেন। আহতদের মধ্যে রবও ছিলেন।

এই কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্মসূচি দিয়ে জাসদ কি অর্জন করতে চেয়েছিল? তারা নিশ্চয়ই ভাবেননি যে সরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাসভবনে হামলা করে তারা সরকার উৎখাত করতে সমর্থ হবেন।

এটা ছিল কেবলই রাজনৈতিক রোমাঞ্চ প্রবণতা। জাসদে অনেক যুদ্ধংদেহী এবং একনিষ্ঠ তরুণ কর্মী ছিল, কিন্তু জাসদ নেতারা এর পরের কোন কর্মসূচির

পরিকল্পনাও করেননি। যখন পরীক্ষার সামনে পড়লেন, তখন এসব নেতাদের সকল বিপ্লবের কথা আর সশস্ত্র উত্থানের প্রতিশ্রুতি ফাঁকা বুলি হিসেবে প্রমাণিত হলো।

এ রকম অবিমৃষ্যকারিতার কারণে জাসদ তাদের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন এমন অনেকের সমর্থন হারিয়েছিল। ফলশ্রুতিতে জাসদ নেতারা তখন ত সারাতেই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু এ অভিজ্ঞতা থেকে তারা কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেন নি।

ধর্মের মতো রাজনীতির ময়দানেও বিভাজনের ফলে তিক্ততা সৃষ্টি হয়। রাজনৈতিক সতীর্থদের মধ্যে যখন বিভাজন সৃষ্টি হয় তখন তারা একে অপরের চরম শত্রুতে পরিণত হন। তবুও অনেকে মনে করেন যে জাসদ সব সময় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' কথা বলে সে দলটি হয়তো শ্রেণী সংগ্রামের উপর জোড় দিবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছিল যে জাসদের প্রধান কাজ হলো মুজিবকে উৎখাত করা।

একদিকে জাসদ নেতারা প্রলেতারিয় রাজনীতি আর কৃষক-শ্রমিকের হাতে ক্ষমতা দেয়ার কথা বলতেন, অন্য দিকে তারা নিজেদের মধ্যবিত্ত অবস্থা থেকে আরও উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করছিলেন। এবং সম্ভবত তারা তাদের স্ববিরোধী আচরণও ধরতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এটি আরও অনেক কম্যুনিস্টের জন্যও প্রযোজ্য।

১৯৭২ সালের প্রথমার্ধে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) এর মধ্যে কয়েক বছরের মধ্যে আওয়ামী লীগের বিকল্প হয়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারা আওয়ামী লীগকে সহায়তা করার নীতি এতো প্রবলভাবে প্রয়োগ করছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের নিজেদের আলাদা পরিচয় হারিয়ে যায়। হয়তো আওয়ামী লীগকে সহায়তা করার পেছনে দলটির যথেষ্ট দ্বান্দ্বিক কারণ ছিল, কিন্তু তাদের এ রাজনীতির ধারার কারণে দলটি এর অনেক তরুণ সমর্থককে হারিয়েছিল। দলটির বিরুদ্ধে 'টাইলিজম' এর অভিযোগ করা হচ্ছিল এবং পরবর্তীতে তাদের আওয়ামী লীগের বি টিম হিসেবে সনাক্ত করা হতো। মুজিব নিজেই একবার একটি জন সমাবেশে ন্যাপ (মোজাফফর) দলের নেতৃবৃন্দকে তাদের সাইনবোর্ড সরিয়ে ফেলে আওয়ামী লীগে যোগ দান করতে বলেন।

বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সরকারের প্রথম দিককার নীতি পদপেক্ষগুলোকে স্বাগত জানিয়েছিল। এ দলটি তাদের দ্বিতীয় কংগ্রেসে মনে করছিল 'প্রগতিশীল নীতিসমূহের কারণে দেশের মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়া' শুরু হয়ে গিয়েছিল। তারা মনে করতো দল হিসেবে আওয়ামী লীগ মধ্যবিত্তকে নিয়ে গড়া হলেও এই দলটির মধ্যে অনেক 'সামন্তীয়, বুর্জোয়া এবং এমন কি সাম্রাজ্যবাদের পরে' উপাদন ছিল। তবুও তারা শাসক দলের বিশেষত মুজিবের ইতিবাচক ভূমিকার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিল।

যদিও ১৯৭৩ সালের নির্বাচণে আওয়ামী লীগ বিরোধী দলগুলোকে ব্যাপক ব্যবধানে পরাজিত করেছিল, মুজিব দলগুলোর সাথে মিত্রতার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। মুজিবের ডাকে ১৯৭৩ সালের অক্টোবরে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং সিপিবিকে নিয়ে গণ ঐক্য জোট গঠিত হয়েছিল। গণ ঐক্য জোটের কমিটিতে মোট ১৯ জন সদস্য ছিলেন–আওয়ামী লীগ থেকে ১১ জন, ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে ৫ জন এবং সিপিবি থেকে ৩ জন। কিন্তু এটি একটি অসম জোট ছিল, ন্যাপ (মোজফফর) এবং সিপিবি'র পক্ষে কেবল আওয়ামী লীগের সহযোগীর ভূমিকাই পালন করা সম্ভব ছিল। এই জোটের নেতৃত্ব ছিল আওয়ামী লীগেরই।

জোট যে সব শত্রু 'দেশের স্বাধীনতার বিপক্ষে ষড়যন্ত্রমূলক ও অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালাচ্ছে' তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিল। জোটের ইশতেহারে বলা হয় কিছু কিছু রাজনৈতিক দল মুজিবকে উৎখাত করতে এবং 'প্রগতিশীল গণতন্ত্র'কে ধ্বংস করে কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিল।

এই জোটের নেতৃত্ব আওয়ামী লীগের হলেও অনেক আওয়ামী লীগার এটির বিরুদ্ধে ছিলেন এবং এ জোটকে আর অগ্রসর হতে দেন নি। সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর) প্রথম দিকে জোটের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলেও খুব শিগগিরই তারা সকল আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে এবং তারা যে সমস্ত পাঠচক্র আয়োজন করছিল সেগুলো গুটিয়ে নেয়।

কিছু কিছু কট্টর ডানপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা মুজিব তাদের দৃষ্টিতে যে সমাজবাদী পথ ধরে এগুচ্ছিলেন সে জন্য সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর)কে দায়ী করতেন। এ দুটি দলই মস্কোপন্থী ছিল। মইনুল হোসেন বলেছিলেন, 'মস্কোপন্থীরা কেমন তা আমরা জানি। তারা আপাত দৃষ্টিতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করছে মনে হলেও আসলে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থই রক্ষা করছে। এটাই তাদের রাজনীতির ধারা।' তার মতে ইন্দোনেশিয়ার কম্যুনিস্টদের কাছে সুকর্ণর যা অবস্থান ছিল বাংলাদেশের কম্যুনিস্টদের চোখে মুজিবও তেমনটিই। তার মতে সিপিবির তখনকার প্রধান মণি সিংহ শেখ মুজিবের উপর বাজে প্রভাব ফেলছিলেন।

সিপিবি সভাপতি মণি সিংহ ছিলেন একজন কিংবদন্তী রাজনীতিবিদ। তিনি ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় হয় কারাগারে নয়তো আত্মগোপনে কাটিয়েছিলেন। আবু হোসেইন সরকার যে সময় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্য মন্ত্রী ছিলেন সে সময়টি বাদে, ১৯৫২ সালে পাকিস্তান সরকার কম্যুনিস্ট রাজনীতি নিষিদ্ধ করার পর থেকে পুরোটা সময়ই মণি সিংহ হয় কারাগারে নয় তো আত্মগোপনে ছিলেন।

মণি সিংহের সাথে মুজিবের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কারাগারে থাকার সময়েই এবং মুজিব তাকে ব্যাপক শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু মুজিবের উপর মণি সিংহের প্রভাবের কথা যেভাবে বলা হয়ে থাকে তা অতিরঞ্জিত।

ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজফফর আহমেদ দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই সকল দেশপ্রেমিক দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি বিপ্লবী কাউন্সিল গঠন করা হোক এমনটি চেয়েছিলেন। তার এই দাবি ছাত্রলীগের রব-সিরাজ অংশের দাবির সাথে মিলে গেলেও, মোজাফফর মার্ক্সবাদী হলেও তিনি 'সমাজতন্ত্র' চাইছিলেন না। তিনি ভুলে যান নি ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শতকরা ১১ ভাগেরও বেশি ভোটার জামায়াতে ইসলামীর মত ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করে এমন দলগুলোকে ভোট দিয়েছিলেন। তিনি অসাম্প্রদায়িকতার উপর জোর দিয়েছিলেন। তার দলের অবস্থান স্পষ্ট করে তিনি ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন, 'আমরা দায়িত্বজ্ঞানহীনের মতো আচরণ করতে পারি না। আমরা এখনই দলীয় অর্জনের কথা ভাবছি না। কষ্টে পাওয়া স্বাধীনতাকে মজবুত করতে হবে। অসাম্প্রদায়িকতা ছাড়া প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়। শেখ মুজিবই একমাত্র জাতীয় নেতা, এবং আমাদের উচিৎ হবে সাম্প্রদায়িকতা ও রোমাঞ্চপ্রবণতার বিরুদ্ধে মুজিবের হাতকে শক্তিশালী করা।'

আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়ার পেছনে সিপিবি এবং ন্যাপ (মোজাফফর) এর নিশ্চয়ই আলাদা আলাদা কারণ আছে, কিন্তু মুজিবই এ দুটি দলকে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছিলেন, এর উল্টোটি হয়নি।

বাংলাদেশের খবরের কাগজগুলো খুঁটিয়ে দেখলে অনেক কিছু বেরিয়ে আসবে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে ইত্তেফাক ছিল অনেক প্রচার সংখ্যা বিশিষ্ট একটি প্রভাবশালী দৈনিক। মাওলানা ভাসানী এ পত্রিকাটির সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশ করতেন। পরবর্তীতে তোফাজ্জল হোসেন যিনি মানিক মিয়া নামে পরিচিত তিনি এর দায়িত্ব নেন এবং দৈনিক হিসেবে প্রকাশ করা শুরু করেন। তিনি ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর একনিষ্ঠ ভক্ত এবং প্রচণ্ড রকম মার্কিনপন্থী। তিনি পাকিস্তানী কর্তপক্ষের কাছের লোক ছিলেন, কিন্তু বাঙালীর দাবি দাওয়া প্রকাশ করার কারণে তাদের রোষানলে পরেন, তাকে দ্রুত ছেড়ে দেয়া হলেও তাঁর পত্রিকাটির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে নিতে ১৯৬৯ সাল চলে আসে। তবুও তিনি বিশ্বাস করতেন পাকিস্তানের দুই অংশ এক সাথে থাকা উচিৎ। নিজ দায়িত্বে পাকিস্তানকে ভেঙ্গে পড়া থেকে রক্ষা করতে তিনি যে অভিযান শুরু করেন সেই অভিযানে থাকা অবস্থায়ই ১৯৬৯ সালের ৩০ মে তিনি রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেন।

মানিক মিয়ার দুই পুত্র, মইনুল এবং মঞ্জু তার ঐতিহ্য ধরে রাখেন। ইত্তেফাক এরপরও ডানপন্থী ঝোঁক বিশিষ্টই থাকে। পত্রিকাটি অসহযোগ আন্দোলনের সময় যুদ্ধংদেহী ছাত্র নেতাদের বিপক্ষে ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে তাদের সমালোচনা করার সাহস পায়নি।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে পিপলস, সংবাদ এবং ইত্তেফাক পত্রিকার অফিস পাকিস্তানি বাহিনী জ্বালিয়ে দেয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় কিছু সময় পরে ইত্তেফাক আবার প্রকাশিত হতে থাকে। কিন্তু সংবাদ আর পিপলস কেবল স্বাধীনতার পরই আবার প্রকাশিত হতে শুরু করে।

পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৫৭ ভাগ ছিল বাঙালী। তারপরও ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুসারে তারা জাতীয় সংসদে সম বণ্টন মেনে নিয়েছিল। এই ভুলের জন্য পরে তাদের অনেক মাশুল দিতে হয়েছিল। তারা এর বিরুদ্ধে প্রচারণাও চালিয়েছিল। এর ফলে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এই ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা দিতে ইয়াহিয়া খান বাধ্য হয়েছিলেন। ১১ জানুয়ারি ১৯৭০ এ পল্টন ময়দানে মুজিব তার প্রথম নির্বাচনী সভায় বজ্রকণ্ঠে বলেছিলেন এরপরও যদি কেউ আবার জাতীয় সংসদে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে সম বণ্টনের কথা বলে তবে তিনি একটি প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করবেন।

অনেক পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তাই মনে করতেন 'এক ব্যক্তি এক ভোট' ব্যবস্থার ফলে পাকিস্তানিদের উপর বাঙালীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

মইনুল হোসেন সিদ্দিক সালিককে বলেছিলেন যে তার বাবা মানিক মিয়া বেঁচে থাকলে বাঙালীকে ১৯৫৬ সালের সংবিধান মেনে নিতে বাধ্য করা সম্ভব হতো। সালিকের মতে প্রবীণদের মধ্যে অনেকেই মনে করতেন যে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পর মানিক মিয়াই ছিলেন মুজিবের উপর একমাত্র সুশীল প্রভাব।

১৯৬৮-৬৯ সালের গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আইয়ুব খানকে উৎখাত করার পর কারও পক্ষেই বাঙালীকে ১৯৫৬ সালের সংবিধান মেনে নিতে রাজী করানো সম্ভব ছিল না।

ঢাকার অধিকাংশ সাংবাদিকই সালিককে ঘৃণা করতেন, তবে কেউ কেউ তার ঘনিষ্ঠ ছিলেন, এবং সালিক তাদের কথা মনে রেখেছিলেন। সালিক তার 'উইটনেস টু সারেন্ডার' নামক গ্রন্থে মইনুল হোসেনকে পিতার যোগ্য সন্তান হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর ইত্তেফাকের ভূমিকা ছিল অনেকটা চিলির ক্ষেত্রে এল মার্কুরিও পত্রিকা যে ভূমিকা পালন করেছিল তার মতোই।

১৯৭২ সালের কোন এক সময় বাংলাদেশ অবজার্ভার নামের একটি সরকারী মালিকানাধীন দৈনিকে মত প্রকাশ করা হয় যে বাংলাদেশ সরকারের একটি সাংবিধানিক ভিত্তি থাকা দরকার। অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা মনে করেছিলেন যে পত্রিকাটি হয়তো সরকারের ভিত্তিকেই প্রশ্নের মুখে ফেলতে চাইছে। ঐ পত্রিকার সম্পাদক আব্দুস সালাম ঐ দিনই অবসর গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ অবজার্ভার আব্দুস সালামের ছবিসহ তার অবসরে যাওয়ার খবর ছেপেছিল।

আব্দুস সালামের মেয়ের জামাই এ.বি.এম. মুসা মর্নিং নিউজ নামে আরেকটি সরকারী মালিকানাধীন দৈনিক চালাতেন, মুজিব আব্দুস সালামকে ঐ পত্রিকায় নিয়মিত একটি কলাম লেখার সুযোগ করে দেন।

সালামের অবসর গ্রহণের কারণে কিছু পশ্চিমা সংবাদপত্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। সরকারের এ সিদ্ধান্তটির তীব্র সমালোচনা করে লন্ডনের টাইমস পত্রিকা।

আট বছর পর ঐ সম্পাদকীয়টি পড়ে তাতে কোন দূষণীয় কিছু পাওয়া যায়নি। এটি খুব সম্ভবত সালামের একটি বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন ছিল, তার মধ্যে একটি স্বাধীনচেতা বা অনেকে যেভাবে বলে থাকেন বিরোধিতা করার অভ্যাস ছিল। কিন্তু ১৯৭২ এর মার্চে এ ধরণের একটি সম্পাদকীয়কে নিরাবেগ দৃষ্টিতে দেখা বেশ কঠিন কাজ ছিল।

সালাম এ সময় ফজলুল হকের কৃষক শ্রমিক পার্টির সদস্য ছিলেন এবং ১৯৫৪ সালে কৃষক শ্রমিক পার্টির মনোনয়ন নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি একজন গর্বিত বাঙালী ছিলেন এবং প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের পক্ষের লোক ছিলেন। রেগে গেলে তিনি যে কারও সামনেই কথা বলতে পারতেন। তার ক্রোধের সামনে একবার আইয়ুব খানও বিব্রত হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু ১৯৭১ সালের মার্চে যখন বাঙালী জাতিয়তাবাদী চেতনা এর শীর্ষে পৌছেছিল, তখন সালাম 'জয় বাংলা!' শিরোনামে একটি সমালোচনামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন শিক্ষক এর প্রতিবাদ জানান। কিন্তু পাকিস্তান অবজারভার (স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এটিই বাংলাদেশ অবজারভার হয়েছিল) এই প্রতিবাদলিপিটি ছাপেনি।

সরকারি মালিকানাধীন মর্নিং নিউজ এবং দৈনিক পাকিস্তানসহ ঢাকার সব প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে ২০ মার্চ ১৯৭১-এ পাকিস্তান সরকারের প্রতি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানিয়ে একই ধরণের সম্পাদকীয় লেখা হয়েছিল। অথচ পাকিস্তান অবজারভারে এমন সম্পাদকীয় ছাপা হয় একদিন পর। একই ভাবে সকল পত্রিকা 'জয় বাংলা' নামে অতিরিক্ত পাতা ছাপার একদিন পর ২৩ মার্চ ১৯৭১-এ অবজারভার তা ছাপায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষক সালামের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, 'সালামের 'জয় বাংলা' শীর্ষক প্রবন্ধের বিপরীতে যে সমস্ত শিক্ষক প্রতিবাদলিপি স্বাক্ষর করেছিলেন তারা সবাই পাক সেনাবাহিনীর তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছেন।' ঐ তালিকায় শুধু তারাই ছিলেন এমন নয়, এবং প্রতিবাদলিপিতে স্বাক্ষর না করলেও তারা তালিকাভূক্ত হতেন। যে সব বাঙালী উদারপন্থী ছিলেন তাদের সকলকেই পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতায় জড়িত বলে সন্দেহ করত।

সালাম এতোটাই মার্কিনপন্থী ছিলেন যে মাঝে মাঝে তার আচরণে ঢাকার মার্কিন কূটনীতিকরাও লজ্জা পেয়ে যেতেন।

বাংলাদেশে ব্যাঙের ছাতার মতো সংবাদপত্র আর জার্নাল গজিয়ে উঠছিল। একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে এমন ঘটবে এটিই স্বাভাবিক। কিন্তু বিজ্ঞাপন থেকে আয় অতি সামান্য এবং প্রচার সংখ্যাও খুব কম হওয়া সত্তেও এসব প্রকাশনার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ কোথা থেকে আসছিল তা ভাববার মত বিষয়। এসব পত্রিকার মধ্যে সিংহভাগই একদম শুরু থেকে সরকার বিরোধী ছিল।

একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেছিলেন, 'মাত্র ২৪ বছরের ব্যবধানে ঢাকা একটি জেলা শহর থেকে একটি দেশের রাজধানীতে পরিণত হয়েছে। আমরা দেশ চালাচ্ছি একটি প্রাদেশিক প্রশাসন দিয়ে।' প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা জরুরি হলেও, আগে নির্ধারণ করা প্রয়োজন ছিল নতুন সরকারটি কি আগের সরকারের অনুগামী না কি একটি বিপ্লবী সরকার। রাজনৈতিক নেতারা কি চাচ্ছিলেন যে আমলারা তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে তাদের হয়ে সরকার চালাক?'

কামাল হোসেন বলেন, 'উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া প্রশাসনিক ব্যবস্থাটি ছিল খুবই দুর্বল, এর কারণ শুধু এই নয় যে এই প্রশাসনের কাঠামোটি 'প্রাদেশিক' ছিল, যে কাঠামোর মধ্যে থেকে সরকার এ পর্যন্ত দেশ চালিয়েছে, বরং বিদ্যমান প্রশাসনের মধ্যেই অনেক রকম বিভাজনের অস্তিত্বও এ দুর্বলতার জন্য দায়ী। প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ তাদের নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভুগছে এবং রাজনৈতিক সরকার থেকে এক ধরণের দূরত্ব অনুভব করার কারণে অচলাবস্থা সৃষ্টির কৌশল বেছে নিয়েছে, পাশাপাশি ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকা বিরোধী গোষ্ঠীগুলোকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়ে যাচ্ছে।' যে বিশেষ আইনের আওতায় আমলাদের দ্রুত পদচ্যুত করার সুযোগ ছিল সেটির কারণে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছিলেন, এবং তাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু পুরো পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে তাদের খুব বেশি সময় লাগেনি।

সে সময়ে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার উপর অনেক বেশি জোর দেয়া হচ্ছিল এবং রাজনৈতিক মতাদর্শকে মোটেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছিল না। এই পুরো প্রক্রিয়াটিই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। যদি উদ্ভূত সংকট সমাধানের প্রকৃত রাজনৈতিক ইচ্ছা থাকতো তাহলে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার অভাব সামান্য প্রতিবন্ধকতাই তৈরি করতো। অনেক বিপ্লবী দলই প্রথমদিকে একটি 'ব্যাপক বিশৃঙ্খল অবস্থা'র সৃষ্টি করলেও তাদের রাজনৈতিক দিশা আর কর্তব্য সম্পাদনের ইচ্ছার কারণে সে সংকট কাটিয়ে উঠেছে।

মাওবাদী মাওলানা

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল, 'আমাদের অসাম্প্রদায়িক বিশ্বাসের প্রতি সৎ থেকে আমরা রাজনীতি থেকে সকল সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে দূর করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি। একজন ব্যক্তি আমাদের সামনে প্রমাণ করেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে ধর্মীয় উন্মাদনার উর্ধ্বে ওঠা এবং গোত্র ও বর্ণের বিভেদ ভুলে যাওয়া সম্ভব, যার ফলশ্রুতিতে আমরা ঔপনিবেশিক শোষকদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু করেছিলাম। যদিও বহু বছরের পশ্চাদপদতা এবং ধর্মীয় উন্মত্ততা এক দিনেই নিশ্চিহ্ন করে দেয়া সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা যদি সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনীতির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করি তবে এরকম প্রপঞ্চ এদেশের মাটিতে বেড়ে উঠতে পারবে না।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম লীগের মত সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলে যেগুলো পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে ব্যাপক সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে আসছিল সেগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল।

জনরোষ থেকে বাঁচার জন্য এসব দলের নেতারা আত্মগোপন করেছিলেন।

রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে মিশিয়ে ফেললে তার ফলে যে বিপদ ঘটে তা বাংলাদেশীরা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়ে উপলব্ধি করার পর স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির কোন সুযোগই ছিল না।

সত্যি কথা হলো অনেকে বিশ্বাস করতেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ফলে উপমহাদেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে গিয়েছিল। ২১ জানুয়ারি ১৯৭২ এ সোশালিস্ট ইন্ডিয়াতে ইকবাল সিং বলেছিলেন, 'একটি বাস্তববাদী অসাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে উপমহাদেশের সংস্কার-বিরোধী অপশক্তিগুলো নিশ্চিতভাবেই একটি গুরুতর এবং খুব সম্ভবত ফলাফল নির্ধারণী পরাজয়ের মুখ দেখেছে এবং সংস্কারের আন্দোলনও একটি নতুন প্রণোদনা পেয়েছে।' তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে, 'ইতিহাসে প্রথমবারের মতো জনগণের জন্য এমন একটি অবস্থা তৈরি হয়েছে যার ফলে ভারত ও বাংলাদেশে এবং স্বয়ং পাকিস্তানেও রাজনীতির জন্য একটি অসাম্প্রদায়িক ব্যবস্থা জোরদার করা যেতে পারে।' ইকবাল সিং উভয় দেশের নেতাদের 'যে পরিবর্তন ঘটে গেছে তার ধরণ বোঝা এবং সেই বোঝার ভিত্তিতে তাদের নীতি ও কর্মসূচিসমূহ দাঁড় করাবার' উপর বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, 'অন্যথায় এমন অপূর্ব সুযোগ হয়তো নষ্ট হবে।'

'এমন অপূর্ব সুযোগ নষ্ট হয়ে যাবে' এই সতর্ক বাণীর প্রতি মন দেয়ার অবস্থা ১৯৭২ সালে খুব কম লোকেরই ছিল। সংস্কার-বিরোধী অপশক্তিগুলো, যাদের

বহিঃশক্তিগুলো সহায়তা করবে, এদেরকে অধিকাংশ ব্যক্তিই যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এটি ছিল একটি বিশাল ভুল।

বাংলাদেশে খুব দ্রুতই সাম্প্রদায়িক অপশক্তিগুলো মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। মাওলানা ভাসানীই এদের উত্থানে সহায়তা করেছিলেন, তবে আওয়ামী লীগকেও এর কিছু দায় নিতে হবে। ভাসানী সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি এতটাই সম্মানিত ছিলেন যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার কথা ভাবাই যেত না। সমস্ত মন্ত্রীই এক সময় যখন মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন তখন তার অধীনে কাজ করেছিলেন এবং সবাই তাকে শ্রদ্ধা করে 'হুজুর' বলে ডাকতেন। কিন্তু তাদের উচিৎ ছিল ভাসানীর সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারের মোকবেলা করা, রাজনৈতিকভাবে তার বিরুদ্ধে লড়াই চালানো। কিন্তু তারা কিছুই করেন নি। এদের মধ্যে অল্পকিছু লোকেরই যথেষ্ট রাজনৈতিক একনিষ্ঠতা বা এমন কি রাজনৈতিক দিক নির্দেশনা সম্পর্কে ধারণা ছিল। হয়তো এদের মধ্যে দুই একজন ভাসানীর সাম্প্রদায়িক প্রচারণা এবং ভারত-বিরোধী উদ্যোগের ফলে সন্তুষ্টও হয়েছিলেন।

ভাসানী মুজিব সরকারের অসাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে আঘাত করছিলেন দেখে মুহিত মজুমদার হতবাক এবং ব্যথিত হয়েছিলেন। তবে ভাসানীর রাজনৈতিক জীবনের ঘোর প্যাঁচ সম্পর্কে যাদের জানা ছিল তারা স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে তার কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হননি। মাঝে মাঝে ভাসানী প্রচণ্ড বিপ্লবী স্লোগান দিলেও, কখনো কখনো ধর্মোন্মত্ত মোল্লাদের মতো পশ্চাদপদতাও দেখাতেন।

কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে ১৯৭২ সালে কেবল ভাসানীর পক্ষেই সাম্প্রদায়িক অপপ্রচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভব।

জনগণকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ক্ষমতাসম্পন্ন ভাসানীকে যেন তৈরিই করা হয়েছিল বিরোধী দলীয় নেতা হওয়ার জন্য। ১৯৪৮ সালে ঢাকায় আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে শুরু করে ১৯৫৮ সালে সেনা শাসন কায়েম হওয়ার আগে পর্যন্ত ভাসানীই ছিলেন পূর্ব বাংলার সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা।

তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি। তিনি যখন আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে ১৯৫৭ সালে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন করেন, তখন আওয়ামী লীগে থাকা অধিকাংশ বামপন্থী তার সাথে চলে যান। তাকে সবাই জানতো একজন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেতা হিসেবে যার কৃষক এবং শ্রমিকদের মধ্যে অনেক ভক্ত-সমর্থক ছিল। পূর্ব বাংলায় বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কিন্তু ১৯৬৩ সালের পরের সময়ে তার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ অন্য একটি গল্প।

১৯৫৮ সালে আরও শত শত ব্যক্তির সাথে তাকে আটক করা হয়েছিল। আটক থাকা অবস্থায় তার কিছু একটা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি আইয়ুব খানের সাথে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিলেন। এই অভিযোগ সত্য বা মিথ্যা যাই হোক, ১৯৬৩ সালে আইয়ুব খান ভাসানীকে চীনে অক্টোবর উৎসবে অংশগ্রহণের জন্য সরকারি প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। এতে তার দলের অনেকেই বিব্রত হলেও, ভাসানী ঘৃণিত সেনা সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার মধ্যে ভুল কিছু দেখেননি।

চীন ভাসানীকে এমনভাবে স্বাগত জানায় যেন ভাসানী কোন ভ্রাতৃসুলভ দেশ থেকে আগত আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নেতা। এতে ভাসানী খুব আবেগাক্রান্ত হয়েছিলেন।

চাইনিজ নেতারা চীন ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পর্ক মজবুত করতে ভাসানীকে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, ভাসানীও এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

আগে পাকিস্তানে চীনের বন্ধু হিসেবে পরিচিত হওয়াটা খুবই বিপদজনক হলেও, ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের পর পুরো চিত্রটিই বদলে গিয়েছিল। চীন ভারতের শত্রু ছিল, ফলে তারা ছিল পাকিস্তানের বন্ধু। অনেক প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিও একরাতের ব্যবধানে চীনপন্থী বিপ্লবী হয়ে গিয়েছিলেন। বিপ্লবীপনা তাদের সাম্প্রদায়িকতা এবং ভারত-বিরোধিতা ঢেকে রাখার জন্য একটি সুবিধাজনক মুখোশ ছিল। এমনকি যে সমস্ত মোল্লা কয়েকদিন আগেও চীনকে একটি খোদাহীন দেশ হওয়ায় ঘৃণা করতো, তাদেরও হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল নবী মোহাম্মদ (স.) বলেছিলেন, 'জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রয়োজনে সুদূর চীনে যাও।'

চীনপন্থী কম্যুনিস্টরাও আইয়ুব খানকে সমর্থন কার শুরু করে। তারা হয়তো এটি তাদের নীতির কারণেও করে থাকতে পারে, কিন্তু এটাও সত্য যে তাদের অনেকের বিরুদ্ধে যে গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল পাক সরকার সেগুলো প্রত্যাহার করে নেয়।

ভাসানী পাকিস্তানী পররাষ্ট্রনীতির একজন কড়া সমালোচক ছিলেন, এবং অন্য রাষ্ট্রগুলোর সাথে পাক সরকারের সামরিক চুক্তি ইস্যুকে কেন্দ্র করেই ১৯৫৭ সালে তিনি আওয়ামী লীগকে দুভাগ করেছিলেন। ১৬ জুন ১৯৫৭ সালে ভাসানী বলেছিলেন, 'মুজিব এটি বুঝতে পারছেন না যে যদি তাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন নিশ্চিত করতে হয় তবে অবশ্যই তাকে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি যার অর্থ হলো সামরিক চুক্তি, সেগুলোর মোকাবেলা করতে হবে। কেবল একজন অন্ধ ব্যক্তিই এটি দেখতে পাবেন না যে সমারিক চুক্তির আওতায় যে অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে সেগুলো পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কণ্ঠরোধেই ব্যবহৃত হবে।' (জোর দেয়া হয়েছে)

সিইএনটিও এবং এসইএটিও তে পাকিস্তানের সদস্যপদ নিয়ে চীনের কোন রকম আপত্তি ছিল না। চীন আইয়ুব খানের পক্ষে ছিল। যতোক্ষণ আইয়ুব খান চীনের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলায় ব্যস্ত ছিলেন ততক্ষণ ভাসানী এবং আরও কিছু বেইজিংপন্থী বাম নেতাদের আইয়ুবের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ছিল না।

১৯৬৪ সালের শুরুর দিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগে আগে, পাকিস্তান সরকার একটি স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করবে এই শর্তে আইয়ুব খানের হাতকে শক্তিশালি করার আহবান জানিয়েছিলেন।

মুজিব সব সময়ই ভাসানীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন এবং তার অনুসারীদের মধ্যে কেউ মুজিবের এই প্রাক্তন নেতার বিরুদ্ধে কিছু বললে তিনি তাদের নিরুৎসাহিত করতেন। আপাত দৃষ্টিতে মুজিব এবং ভাসানীর মধ্যে উষ্ণ সম্পর্ক আছে বলে মনে হলেও, ভাসানীর মনে মুজিবের প্রতি এক ধরণের বিদ্বেষ ছিল। অন্য অনেকের মতোই ভাসানীও হয়তো মুজিবের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে হিংসা করতেন, মুজিবের এত জনপ্রিয় হওয়ার কারণ তিনি ধরতে পারেন নি।

১৯৭০ সালে ভাসানী বলেছিলেন, 'মুজিব যদি ক্ষমতায় যায়, তা হবে আমার লাশের ওপর দিয়ে।' ভাসানী ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন যতভাবে সম্ভব বিলম্বিত করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন।

সিদ্দিক সালিক বলেছিলেন ১৯৭০ এ ঢাকার সরকারী বাসভবনের কিছু উজবুক-উর্দুতে তিনি যে বিশেষণটি ব্যবহার করেছিলেন তার শাব্দিক অর্থ হলো 'প্যাঁচা'- মাওলানা ভাসানী'র ন্যাপকে আওয়ামী লীগের বিকল্প হিসেবে দেখতে চেয়েছিল। টাঙ্গাইলে যখন ভাসানী একটি কৃষক সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন তখন সরকার টাঙ্গাইলগামী বিশেষ ট্রেন চালু রেখেছিল যাতে ঐ সম্মেলন সফল হয়। ঐ সম্মেলনের মূল বক্তব্য ছিল: 'নির্বাচনের আগে খাদ্য।'

২১ মার্চ ১৯৭০ এ লাহোরে পৌছে ভাসানী বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন সকল সম্পদের জাতীয়করণ করতে হবে। এর কয়েকদিন পর টবা টেক সিং এ সভায় তিনি হুমকি দেন যে সরকার যদি জনগণের উপর নির্বাচন চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে তবে তিনি গেরিলা যুদ্ধ শুরু করবেন, এ জন্য তার ৫০,০০০ সশস্ত্র যোদ্ধা রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছিলেন।

১৯৭০ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে ভাসানী আকস্মিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যান এবং ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেন। এর আগে ভাসানী ও আইয়ুব খানের মধ্যকার গোপন সংলাপের কথা যারা জানতেন তারা এ ঘটনায় সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন।

১২/১৩ নভেম্বরে যে প্রলংঙ্করী সাইক্লোন হয় সেটিকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে ঐ মাসে ভাসানী ডিসেম্বরের ৭ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি জানান।

পুরো সময়টিতেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো ১৯৭০ এর নির্বাচনে মুজিবের দিক থেকে জনগণকে সরিয়ে আনতে পারেন এমন একজন নেতা হিসেবেই ভাসানীকে দেখিয়ে আসছিল।

এটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাদের ইচ্ছাপ্রসূত কল্পনা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টিতেই বিশাল ব্যবধানে জয় পেয়েছিল।

ভাসানী পূর্ব বাংলার স্বাধীনতার কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এরপরও তিনি পাকিস্তানী সামরিক জান্তার বিরাগভাজন হন নি।

পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যখন বাঙালীর উপর হামলে পড়ে, তখন ভাসানী ভারতে পাড়ি জমান। তার দলের একজন শীর্ষ নেতা তাকে পূর্ব বাংলায় ফিরিয়ে আনতে গেলেও, ভাসানীর এতটুকু রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিল যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন পূর্ব বাংলা দখলদার বাহিনীর অধীনে থাকা অবস্থায় সেখানে ফিরে যাওয়াটা নিরাপদ হবে না।

ভারতে থাকা অবস্থায় ভাসানীকে একজন প্রবীণ রাজনীতিকের জন্য উপযুক্ত সম্মান দিয়ে রাখা হয়েছিল। সেখানে থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য ভারত সরকার যা করছিল তার জন্য ভারত সরকারকে একাধিকবার ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। দেশে ফেরার অল্প পরেই তিনি ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তির ভূয়সী প্রশংসা করে ২৪ মার্চ ১৯৭২ এ তিনি বলেছিলেন, 'স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় প্রমাণিত হয়েছে ভারত বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু। আমি এটি কোন দিন ভুলব না।'

দেশের সংকটগুলো সমাধান করার জন্য মুজিব সরকারকে দুই থেকে তিন বছর সময় দেয়ার জন্য তিনি জনগনণকে অনুরোধ করেছিলেন।

অথচ, অল্প সময়ের মধ্যেই ভাসানী বলতে শুরু করেন যে ভারতে থাকা অবস্থায় তিনি কার্যত বন্দী ছিলেন। দেশে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির জন্য তিনি প্রতিদিন ভারত থেকে যে হাজার হাজার মানুষ তাদের পূর্ব পুরুষের ঘর বাড়ি দেখবার জন্য বাংলাদেশে আসছিলেন তাদের দায়ী করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'এদেশ যদি তাদের এত ভালই লাগে তবে কেন তারা এদেশের অংশ হয়নি?'

মূলত ভারত ও বাংলাদেশকে বিব্রত করার জন্যই তিনি বাংলাদেশ, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরাকে নিয়ে বৃহত্তর বাংলার পুরোনো ধারণাটি আবার সামনে নিয়ে আসেন। এর আগে তাঁর আসামকে পাকিস্তানের অংশ করে নেয়ার দাবিতে কেউ কান দেয়নি। কিন্তু বৃহত্তর বাংলা গঠনের চিন্তাটি ভয়ঙ্কর।

মাত্র দুই বছর আগেও এমন একটি প্রস্তাবকে ভাসানী সিআইএ'র চক্রান্ত বলে প্রত্যাখান করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি দাবি করেছিলেন যে সিআইএ পূর্ব বাংলা এবং ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোকে নিয়ে একটি কুপরিকল্পনা করছিল এবং ন্যাপ (ভাসানী) এর মহাসচিব মোহাম্মদ তোহার কাছে সে সংক্রান্ত একটি সিআইএ নথি ছিল এবং তোহাকে সেটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করতে বলার পরও তোহা সেটি করেননি বলে অভিযোগ করেছিলেন।

তোহা, যিনি ছিলেন একজন চীনপন্থী বাম, ভাসানীর এ অভিযোগের জবাবে বলেছিলেন, ভাসানী যদি ঐ নথিটিকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে থাকেন তবে তার উচিৎ ছিল নিজেই সেটি সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করা।

তোহা নিজে হয়তো বৃহত্তর বাংলার ধারণাটি পছন্দই করছিলেন। ১৯৭২ সালে বেইজিং-এ একটি কূটনৈতিক সংবর্ধনায় তখনো পাকিস্তানি দূতাবাসে কাজ করছিলেন এমন একজন বাঙালী কূটনীতিক চীন সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে সমর্থন না দেয়ায় ভদ্রভাবে হতাশা ব্যক্ত করেছিলেন। এর প্রতিক্রিয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে একজন চাইনিজ উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'বেশ, তোহা আর তার বৃহত্তর বাংলার প্রস্তাবের কি হল? আমরা সেটি সমর্থন দিতে প্রস্তুত আছি।'

জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্তি ঠেকানোর জন্য চীন ২১ আগস্ট ১৯৭২-এ প্রথমবারের মত নিরাপত্তা পরিষদে তার ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল। এই ভেটো যদিও অপ্রত্যাশিত ছিল না, তবুও এর ফলে এমন কি যেসব বাঙালী চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলা কালে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সহায়তা করেছিল এটি ভুলে যাওয়ার পক্ষে ছিলেন তারাও হতাশ হয়েছিলেন। বাংলাদেশের নেতারা হঠাৎ করেই বুঝতে পেরেছিলেন যে চীন 'ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি নীতি নিয়েছে যার ফলে উপমহাদেশে উত্তেজনা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হয়।' পররাষ্ট্র মন্ত্রী আব্দুস সামাদ আজাদ, যিনি চীনকে অখুশি না করতে উদগ্রীব ছিলেন, তিনিও মত প্রকাশ করেন যে চীন বাংলাদেশের 'সার্বভৌমত্বের' শত্রুর মতো আচরণ করছে। তবে হয়তো বেশি আক্রমণাত্মক অবস্থান নেয়া হয়ে যাচ্ছে মনে করে সামাদ আজাদ এর সঙ্গে যোগ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ এরপরও চীনের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে রাখবে।

চীনের এহেন কর্মকাণ্ডের ফলে বাংলাদেশে যারা চীনের মিত্র তারা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে যান। এমন কি ভাসানীও বলেছিলেন, 'আমি আমার অন্তর থেকে চীনের এই ভেটো দেয়ার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' কিন্তু তার এই প্রতিবাদ তীব্রও ছিল না এবং এটি অন্তর থেকেও করা হয়নি, তিনি যদি বিব্রতও হয়ে থাকেন তাও হয়েছিলেন কেবল দুয়েকদিনের জন্যই।

চীনের এই ভেটোর মাত্র চার দিন পর, ২৫ আগস্টে তিনি ভারতকে বাংলাদেশের এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'প্রতিদিন প্রায় তিন মিলিয়ন ভারতীয় বাংলাদেশে স্বল্প সময় থাকার জন্য প্রবেশ করছে। এরকম যাতায়াতের ফলে দেশের সীমিত সম্পদের উপর ব্যাপক চাপ পড়ছে এবং সাম্প্রতিক কালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য বৃদ্ধির পেছনে এটি একটি প্রধান কারণ।'

প্রতিদিন তিন মিলিয়ন বহিরাগত! তারা কোন বাহনে যাতায়াত করতো? এমনকি ভারত সরকারের বাংলাদেশে প্রবেশের জন্য ভারতীয় নাগরিকদের পাসপোর্টে বিশেষ এনডোর্সমেন্ট লাগবে এমন নিয়ম চালু করার আগেও এই পরিমাণে ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেনি।

১৯৭২ সালের ২৫ আগস্টের মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াতের জন্য ভিসা ব্যবস্থা চালু হয়ে গিয়েছিল এবং বাংলাদেশে ভারতীয় অভ্যাগতের সংখ্যা আগের তুলনায় বহুলাংশে কমে এসেছিল। কিন্তু এতো সূক্ষ্ম হিসাব-নিকাশ নিয়ে ভাসানী চিন্তিত ছিলেন না। তার পরিসংখ্যান ছিল তার নিজের তৈরি এবং এগুলো নিয়ে তিনি খেলছিলেন। কোন দ্বিধা ছাড়াই তিনি সবচেয়ে অদ্ভুত পরিসংখ্যান ব্যবহার করতে পারতেন, যদি মনে করতেন যে এটি তার উদ্দেশ্য সাধনে সহযোগী হবে।

তিনি বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকারে অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তিনি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে তৈরি সংবিধান চেয়েছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষার উপর বিশেষ জোরারোপ করেছিলেন। তিনি অল্পের জন্য বাংলাদেশকে একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্র করার দাবি করে বসেন নি।

তিনি ভারতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়াচ্ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারত বাংলাদেশকে তার পঁচে যাওয়া দ্রব্য নিষ্কাশনের স্থানে পরিণত করেছিল। ভারতীয় দ্রব্য বর্জনের ডাক দিয়ে তিনি ভারতকে উচিৎ শিক্ষা দেয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন বাংলাদেশ ভারতের জন্য ভিয়েতনাম হবে।

ভাসানী মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বাংলাদেশ নিজেকে ভারতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করতে না পারলে চীন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ পাওয়ার ক্ষেত্রে তীব্র বাধা সৃষ্টি করবে।

তিনি নিশ্চিত ছিলেন মুজিব তাকে সাথে নিয়ে বেইজিং সফরে গেলে তিনি সেখানকার কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে রাজি করাতে সক্ষম হবেন।

এর মাত্র এক মাস আগেই ভাসানী বলেছিলেন যে কেবল পাকিস্তান যদি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় তখনই তিনি পাকিস্তান সফরের যে আহবান ভুট্টো তাকে জানিয়েছেন সেটি বিবেচনা করতে পারেন।

সে সময় লন্ডন থেকে গলব্লাডার স্টোন অপারেশনের পর মুজিব সুইজারল্যান্ড সরকারের আমন্ত্রণে জেনেভায় ছিলেন।

মাওলানা ভাসানীর মধ্যে একটি নিষ্ঠুরতার প্রবণতা ছিল। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে ভাসানী একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হঠাৎ বলেছিলেন, 'আপনি মারা গেলে অন্তত ৫০০ লোক খুশি হবেন।' 'আমি কি অপরাধ করেছি' ঐ ম্যাজিস্ট্রেট সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করেছিলেন। 'কিছুই না' জবাবে ভাসানী বলেছিলেন, 'কিন্তু আপনি একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। এটিই যথেষ্ট।'

৯ মার্চ ১৯৭১-এ বঙ্গবন্ধুর ডাকা অসহযোগ আন্দোলন চলা অবস্থায় ভাসানী টাঙ্গাইল থেকে ঢাকায় আসেন। অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন ভাসানী হয়তো সেদিন তার সভায় জনগণকে সংঘাতে উৎসাহিত করে পুরো আন্দোলনকে ভেস্তে দিবেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা মুজিবকে চেন না? সে আমার সাথে নয় বছর কাজ করেছে। সে কোন অবস্থাতেই জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সে আমার কাছে পুত্রের চেয়েও প্রিয়।'

মুজিব হত্যার পর ভাসানী মুজিব সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখলের সাহস দেখানোর জন্য মোস্তাকের প্রশংসা করে একটি টেলিগ্রাম মোস্তাকের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

১৯৭২ সালের আগস্ট মাসেই যখন মুজিব গলব্লাডার স্টোন অপারেশনের জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন তখনই মুজিব বিরোধী অভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১১ আগস্ট ১৯৭২ এ হলিডে পত্রিকায় লে. কর্নেল জিয়াউদ্দিন লিখেছিলেন, 'সাধারণত, একটি সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে যুদ্ধের পরের 'নতুন চেতনা' টিকে যায় এবং এটিই ধ্বংসস্তূপ থেকে দেশ গড়ার কাজে লাগে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ঘটছে এর উল্টোটি।' মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবের কারাগারে থাকার দিকে ইঙ্গিত করে জিয়াউদ্দীন আরও লিখেছিলেন, 'আমরা তাকে ছাড়াই লড়াই করেছি এবং জয়লাভও করেছি। এবং এখন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা আবার লড়বো।'

মুজিব লন্ডনের হাসপাতালে থাকা অবস্থায় এই নিবন্ধটি ছাপা হয়েছিল। জিয়াউদ্দীন ছিলেন ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডার!

এই নিবন্ধটি লেখার অপরাধে তার তাৎক্ষণিকভাবে সেনা আদালতে বিচার হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু সেনা সদর তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি এবং ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নজরুল ইসলাম ছিলেন দ্বিধান্বিত।

মুজিব ঢাকায় ফিরে জিয়াউদ্দীনকে ডেকে পাঠান এবং তাকে নিশ্চয়তা দেন যে তিনি যদি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনা হবে না। এরপর জিয়াউদ্দীন আত্মগোপন করেন।

১৯৭২ এর শেষ দিকে জিয়াউদ্দীনকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

জিয়া উদ্দীনকে সমর্থন করতেন লে. কর্নেল আবু তাহের, তাকেও সেনা বাহিনী থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপরে ১৯৭৩ সালে আবু তাহেরকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খনন বিভাগে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল; কাকতালীয়ভবে এ মন্ত্রণালয়টি ছিল মোস্তাকের অধীনে।

জিয়া উদ্দীন সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। এই দলটির নামটি গুরুত্ববহ। শিকদার এবং তোহার মতে বাংলাদেশ তখনো পূর্ব পাকিস্তানই রয়ে গিয়েছিল। শিকদার মুজিব সরকারকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার দল পুলিশ আউটপোস্টগুলোতে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়েছিল। দুর্বল অস্ত্র এবং অপ্রতুল প্রশিক্ষিত পুলিশ, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সর্বহারা পার্টির সামনে টিকতে পারেনি।

১৯৭১ সালে নোয়াখালী সেক্টরে পাকিস্তানি কমান্ডারের দায়িত্ব পালনকারী কর্নেল আশিক হোসেন ১৯৭৬ এর এপ্রিলে লরেন্স লিফশুলজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন যে মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তোহা পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করবেন এমন একটি বোঝাপড়ার সম্ভাবনা নিয়ে তার সাথে তোহার আলাপ হয়েছিল।

একজন পাকিস্তানি কর্নেলের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না হয়তো। নোয়াখালী জেলায় তোহার নিজের গেরিলা ঘাঁটি ছিল। কিন্তু তিনি মুক্তি বাহিনীকে পাক বাহিনীর চেয়েও বড় শত্রু মনে করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তোহা আত্মগোপনেই থেকে যান। দেশ স্বাধীনতার অল্প পরেই বাঙালীর মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা তিনি জানতেন, এবং যখনই ঢাকায় আসতেন তখন বাঙালীর পরিবর্তে তিনি বিহারীদের সাথে থাকতেন।

যে বাঙালী তখনো পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন বিহারীরা তাকে নিজেদেরই লোক মনে করতো। তিনি সবুর খানের মতো মুসলিম লীগার হলেও, আবার তোহার মতো চীনপন্থী কম্যুনিস্টও।

এটি কোন কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না যে, ঢাকায় থাকা বিহারীদের মধ্যে যাদের বামপন্থী যোগাযোগ ছিল বা যারাই বাম রাজনীতির ছল করতো তারা সবাই চীনপন্থী। তারা পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সাহায্যও করতো কিন্তু এরপরও নিজেদের প্রগতিশীল ভাবতো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের ভূমিকার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বিশেষত চীনপন্থী বামপন্থীরা ব্যাপক নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। বদরুদ্দীন উমর সহ অনেকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন ১৯৭১ সালে তারা যে ক্ষেত্র হারিয়েছেন

তা আবার ফিরে পেতে বহু বছর লেগে যাবে। কিন্তু চীনের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার উদগ্রীব থাকায় এসব রাজনীতিক যতোদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে তারা ভেবেছিলেন তার অনেক আগেই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

যত যাই হোক এটি স্বীকার করতে হবে যে প্রকৃত চীনপন্থী বামদের রয়েছে ত্যাগ স্বীকার করার দীর্ঘ ইতিহাস। এদেরকে যে ছাত্ররা সমর্থন করতো তারা ছিল যোদ্ধা প্রকৃতির এবং আদর্শবাদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদানকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

১৯৭২ এর শেষ দিকে জিয়াউদ্দীনকে সেনাবাহিনী থেকে বরখাস্ত করা হয়।

জিয়া উদ্দীনকে সমর্থন করতেন লে. কর্নেল আবু তাহের, তাকেও সেনা বাহিনী থেকে অব্যহতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরপরে ১৯৭৩ সালে আবু তাহেরকে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন খনন বিভাগে পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছিল; কাকতালীয়ভবে এ মন্ত্রণালয়টি ছিল মোস্তাকের অধীনে।

জিয়া উদ্দীন সিরাজ শিকদারের পূর্ব বাংলা সর্বহারা পার্টিতে যোগ দেন। এই দলটির নামটি গুরুত্ববহ। শিকদার এবং তোহার মতে বাংলাদেশ তখনো পূর্ব পাকিস্তানই রয়ে গিয়েছিল। শিকদার মুজিব সরকারকে প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন এবং তার দল পুলিশ আউটপোস্টগুলোতে ধারাবাহিকভাবে হামলা চালিয়েছিল। দুর্বল অস্ত্র এবং অপ্রতুল প্রশিক্ষিত পুলিশ, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত সর্বহারা পার্টির সামনে টিকতে পারেনি।

১৯৭১ সালে নোয়াখালী সেক্টরে পাকিস্তানি কমান্ডারের দায়িত্ব পালনকারী কর্নেল আশিক হোসেন ১৯৭৬ এর এপ্রিলে লরেন্স লিফশুলজকে দেয়া সাক্ষাৎকারে দাবি করেছিলেন যে মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে তোহা পাকিস্তানী বাহিনীকে সহযোগিতা করবেন এমন একটি বোঝাপড়ার সম্ভাবনা নিয়ে তার সাথে তোহার আলাপ হয়েছিল।

একজন পাকিস্তানি কর্নেলের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না হয়তো। নোয়াখালী জেলায় তোহার নিজের গেরিলা ঘাঁটি ছিল। কিন্তু তিনি মুক্তি বাহিনীকে পাক বাহিনীর চেয়েও বড় শত্রু মনে করতেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও তোহা আত্মগোপনেই থেকে যান। দেশ স্বাধীনতার অল্প পরেই বাঙালীর মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে তা তিনি জানতেন, এবং যখনই ঢাকায় আসতেন তখন বাঙালীর পরিবর্তে তিনি বিহারীদের সাথে থাকতেন।

যে বাঙালী তখনো পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন বিহারীরা তাকে নিজেদেরই লোক মনে করতো। তিনি সবুর খানের মতো মুসলিম লীগার হলেও, আবার তোহার মতো চীনপন্থী কম্যুনিস্টও।

এটি কোন কাকতালীয় ব্যাপার ছিল না যে, ঢাকায় থাকা বিহারীদের মধ্যে যাদের বামপন্থী যোগাযোগ ছিল বা যারাই বাম রাজনীতির ছল করতো তারা সবাই চীনপন্থী। তারা পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সাহায্যও করতো কিন্তু এরপরও নিজেদের প্রগতিশীল ভাবতো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের ভূমিকার কারণে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর, বিশেষত চীনপন্থী বামপন্থীরা ব্যাপক নাজুক অবস্থার মধ্যে পড়ে যান। বদরুদ্দীন উমর সহ অনেকে প্রকাশ্যে স্বীকার করেন ১৯৭১ সালে তারা যে ক্ষেত্র হারিয়েছেন

তা আবার ফিরে পেতে বহু বছর লেগে যাবে। কিন্তু চীনের সাথে বন্ধুত্বের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার উদগ্রীব থাকায় এসব রাজনীতিক যতোদিন অপেক্ষা করতে হবে বলে তারা ভেবেছিলেন তার অনেক আগেই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন।

যত যাই হোক এটি স্বীকার করতে হবে যে প্রকৃত চীনপন্থী বামদের রয়েছে ত্যাগ স্বীকার করার দীর্ঘ ইতিহাস। এদেরকে যে ছাত্ররা সমর্থন করতো তারা ছিল যোদ্ধা প্রকৃতির এবং আদর্শবাদী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের অবদানকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।

একটি নতুন বিশ্ব

২৬ মার্চ ১৯৭২ দেশের স্বাধীনতার প্রথম বর্ষপূর্তিতে মুজিব জাতির উদ্দেশে ভাষণে বলেছিলেন: 'আমাদের স্বপ্ন হলো একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা। আমরা একটি সফল সামাজিক বিপ্লব ঘটাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমাদের সকল নীতি ও উদ্যোগ নেয়া হবে এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য।'

ঐ তারিখে বাংলাদেশ সরকার পাটকল, তুলাকল, টেক্সটাইল মিল, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীকরণ করে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে সকল পাকিস্তানি সম্পদের দায়িত্ব নেয়। যে ৫১১ টি পাকিস্তানী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান পাকিস্তানিরা এদেশে ছেড়ে যায়, তার মধ্যে ১১১ টি যেগুলোর প্রতিটির সম্পদের পরিমাণ ১.৫ মিলিয়ন টাকার বেশি সেগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়েছিল। তবে ব্যাংক, বীমা ও চা শিল্পে মার্কিন ও ব্রিটিশ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ উদ্যোগের বাইরে রাখা হয়েছিল। চা শিল্পে প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো ব্রিটিশ মালিকানাধীন ছিল এবং এ শিল্পটি ছিল রুগ্ন। কিন্তু বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পগুলোর জাতীয়করণ ছিল একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। পাকিস্তানিরা যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠান ছেড়ে গিয়েছিল সরকারের সেগুলোর মালিকানা নিয়ে পরিচালনা করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না, কিন্তু সরকার যদি ব্রিটিশ ও মার্কিন মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোকেও জাতীয়করণ করতো তাহলে তারা বিশ্ব ব্যাংক ও অধিকাংশ রাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার অযোগ্য হয়ে যেত।

একটি ব্রিটিশ ব্যাংকে জমার পরিমাণ অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্বিগুণ হয়ে যায়।

বাঙালী ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা আশা করেছিলেন স্বাধীন দেশে তারা আগের চেয়েও বেশি লাইসেন্স ও পারমিট পাবেন এবং ব্যবসায় ও শিল্পে আরও বেশি মাত্রায় যুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু তারা পাকিস্তানের ফেলে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকানা পাননি। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বাঙালীর যেসব প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ১.৫ মিলিয়ন টাকার বেশি ছিল সেগুলোও সরকারের জাতীয়করণের উদ্যোগ থেকে বাদ পড়েনি।

অল্পকিছু বাঙালী পুঁজিপতি পাট ও তুলা শিল্পে ব্যবসায় জড়িত ছিলেন, এবং শেষ পাঁচ থেকে ছয় বছরে উন্নতি করেছেন এমন কিছু 'পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্ত শিল্পপতি' ছিলেন। কোন শিল্পায়নের কর্মসূচি বাস্তবায়নে তাদের উদার সরকারী সাহায্য প্রয়োজন ছিল । স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এটি ছিল অচিন্তনীয়।

এতোগুলো শিল্প জাতীয়করণের ফলে সরকারের ওপর বিশাল ব্যবস্থাপনার বোঝা চেপে বসে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে অধিকাংশ উচ্চ পর্যায়ের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে ছিলেন অবাঙালীরা। উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ে কাজ করার মতো যথেষ্ট সংখ্যক দক্ষ বাঙালী ব্যবস্থাপকের অভাব ছিল। এমনকি দক্ষ শ্রমিকেরও অভাব

ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই সাবেক মালিক বা ব্যবস্থাপকদেরকেই জাতীয়করণ হয়ে যাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ফলে স্বভাবতই এসব ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে যতটা সম্ভব সম্পদ পাচারের চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এটি ছিল শেয়ালের কাছে মুরগী পাহারা দেয়ার দায়িত্বের মতো।

জাতীয়করণ হওয়া এসব প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিদের কাজ তদারকি করার মতো কোন কর্তৃপক্ষ থাকা উচিৎ ছিল, কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানের এমনকি কোন সম্পদের তালিকাও তৈরি করা হয়নি।

মুজিব এসব ব্যবস্থাপকদের প্রতি 'দেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ, যারা এই জাতীয়করণ করা প্রতিষ্ঠানগুলোর নতুন মালিক তাদের পক্ষ থেকে প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করার সময় দেশপ্রেমের নমুনা দেখানোর' আহবান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু এদের মধ্যে কারও কারও পক্ষে দ্রুত ধনী হওয়ার লোভ এড়ানো সম্ভব হয়নি।

আওয়ামী লীগাররা দাবি করেছিলেন শিল্পসমূহের জাতীয়করণ ছিল সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে যাওয়ার একটি পদক্ষেপ। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে এগিয়ে যাওয়া হিসেবে দেখা গেলেও এটি কোন ক্রমেই সমাজতন্ত্র নয়। এমন কি পুঁজিবাদী দেশ সমূহেও রাষ্ট্র কোন বিশেষ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতীয়করণ করে থাকে। যেমন, ১৯৪৯ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি সেদেশের ইস্পাত শিল্পকে জাতীয়করণ করেছিলেন।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও বাণিজ্যের সুফল সাধারণ ভোক্তা পর্যন্ত পৌছায়নি। স্বাধীনতা পরবর্তী কালে সরবরাহের যে সংকট ছিল, ব্যবসায়ীরা 'সেই সরবরাহ সংকট থেকে সর্বোচ্চ মুনাফা' করেছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) এ উল্লেখ ছিল: 'রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কোন সংকটকালীন উচ্চ মূল্য না রাখলেও, এর সুফল ভোগ করেছেন মধ্যস্বত্বভোগীরা।'

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা আছে 'অনুপার্জিত আয়কে নিরুৎসাহিত করতে হবে।' সরবরাহ, নির্মাণ এবং বিদেশি পণ্যের ইনডেন্টিং এর ক্ষেত্রে 'অনুপার্জিত আয় ভোগ করার সুযোগ' তখনো বিদ্যমান ছিল। কিছু বাঙালী অল্প সময়ের মধ্যেই ধনী হয়ে গিয়েছিলেন এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ হলো, তারা তাদের এই নতুন পাওয়া বিত্ত দেখাতেও পছন্দ করতেন। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আরও বলা ছিল, 'প্রকট অভাবের সময় তাদের বিলাসীতাপূর্ণ জীবন-যাপন পদ্ধতি সমাজে উত্তেজনা সঞ্চার করে এবং এর ফলে সমাজে একটি অনাকাঙ্ক্ষিত 'প্রদর্শন প্রভাব' ছড়িয়ে পড়ে।

ফ্রাঞ্জ ফেনো বলেছিলেন, 'জাতীয় মধ্যবিত্ত তার ঐতিহাসিক ভূমিকা খুঁজে নেয়–সেটি হলো মধ্যস্বত্বভোগীর ভূমিকা।' একটি ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার জন্য এটি বিশেষভাবে সত্য।

অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তান একটি উপনিবেশ ছিল। প্রধান ব্যবসায়িক গোষ্ঠীগুলোর মালিকানা ছিল প্রায় এককভাবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে। এমন কি ষাটের দশকে যখন বাঙালী যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী লাইসেন্স পাচ্ছিলেন তখনো তারা এসব লাইসেন্স অধিকাংশ সময় পশ্চিম পাকিস্তনিদের কাছেই বিক্রি করে দিতে চাইতেন। এর ফল ছিল স্বাধীনতার পরে খুব অল্প কয়েকজন বাঙালী ছিলেন যারা ততোদিনে নিজেদের আমদানীকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। স্বাধীনতার পরে প্রতিটি থানায় দশ জন করে এই হিসেবে সারাদেশে বিপুল পরিমাণ আমদানী লাইসেন্স ইস্যু করা হয়েছিল, এসব লাইসেন্সের মূল্যমান ছিল ১,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা। এটি ছিল এক ধরণের রাজনৈতিক প্রণোদনা, কিন্তু যাদের লাইসেন্স কম মূল্যমানের ছিল তাদের পক্ষে কোন কিছু একা আমদানী করা সম্ভব ছিল না। এসব লাইসেন্স মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হাত বদল হয়েছিল। এসবের ফলে আমাদানী করার ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত বিলম্ব হয়েছিল এবং এর ফলে মূল্য বৃদ্ধি ঘটেছিল ।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ছিলেন সে সময় পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান, তিনি সহ কমিশনের অন্য তিন সদস্য রেহমান সোবহান, মোশাররফ হোসেন এবং আনিসুর রহমান তারা সবাই ছিলেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ। শুধু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনাই নয় তাদের সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশের নিত্য দিনের সমস্যাও সমাধানের কথা ভাবতে হচ্ছিল। ডেপুটি চেয়ারম্যানের মর্যাদা মন্ত্রী পর্যায়ের এবং সদস্যদের মর্যাদা প্রতিমন্ত্রীর পর্যায়ের হলেও আমলাদের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে তারা নানা ধরণের সমস্যার মোকাবেলা করছিলেন।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম রাজনৈতিক অর্থনীতি সংক্রান্ত তার চমৎকার গবেষণাপত্র ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ-এ লিখেছিলেন, 'পরিকল্পনা কমিশনকে ব্যাপক দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং আমলাতন্ত্র পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার গুরুত্ব যথার্থ বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল।'

পরিকল্পনা এমন একটি ক্ষেত্র যার সাথে বহু ধরণের বিষয় জড়িত থাকে। কিন্তু মুজিব চারজন অর্থনীতিবিদকেই এখানে শীর্ষ পদে নিয়োগ দিয়েছিলেন কারণ এরা সবাই মুক্তির সংগ্রাম চলাকালিন তার উপদেষ্টা ছিলেন।

যেহেতু সে সময় মুজিবের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল, তাই পরিকল্পনা কমিশন অন্য কোন মন্ত্রীর সাথে সখ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেনি। অধ্যাপক নুরুল ইসলামের মতে, 'অন্যান্য মন্ত্রীদেরকে কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী মনে হয়নি, এবং তারা তাদের সকল রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখাপেক্ষী ছিলেন।' কিন্তু এক সময় পরিকল্পনা কমিশন বুঝতে পেরেছিল যে মন্ত্রণালয়গুলো চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন বিলম্বিত করতে পারে, এমনকি

সিদ্ধান্তগুলোকে ফলাফলশূন্য করতে পারে। মুজিব নিজে বিপ্লবী পরামর্শসমূহকে স্বাগত জানালেও, তার দলের মধ্যে রক্ষণশীল অংশের উপরে নিজের কর্তৃত্ব খাটাতে খুব উদ্যোগী ছিলেন না।

পরিকল্পনা করা 'যতটা না একটি অর্থনৈতিক কৌশল তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া।' পরিকল্পনাকারীরা এটা ধরে নিয়েই এগোচ্ছিলেন যে সরকার 'বিবর্তনশীল সমাজতন্ত্রে' বিশ্বাসী এবং মিশ্র অর্থনীতি অনুসরণ করা হচ্ছে অন্তর্বর্তীকালের জন্যই। কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে অল্প লোকই সমাজতন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠ ছিলেন বা জানতেন তারা আসলে কি চান।

পরিকল্পনা কমিশনের সাথে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে সম্ভবত আনিসুর রহমানই সবচেয়ে একনিষ্ঠ ছিলেন, তিনিই সবার আগে মোহমুক্ত হন। পরিকল্পনা কমিশনে যোগ দেয়ার এক বছরের মধ্যেই তিনি কমিশন ছেড়ে দিয়ে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগ দেন। পরবর্তীতে মোশাররফ হোসেন এবং রেহমান সোবহানও পরিকল্পনা কমিশন ত্যাগ করেন।

অধ্যাপক নুরুল ইসলাম এরপরও পরিকল্পনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু বাংলাদেশে পরিকল্পনার ক্ষেত্রে 'একাডেমিক' যুগের অবসান হয়েছিল এখানেই।

শর্তহীন সহায়তা হলো নির্জলা মিথ্যা। সহায়তাগুলো মূলত ঋণ; এবং ঋণ সম্পর্কে ফ্রেঞ্চ প্রবাদ–ঋণ কৃষককে টিকিয়ে রাখে, যেভাবে জল্লাদের দড়ি টিকিয়ে রাখে ফাঁসির আসামীকে। যে কোন মুহূর্তেই এই ফাঁসির দাড়ি গলায় এঁটে বসতে পারে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল তা অধিকাংশ সহায়তা গ্রহণকারী দেশের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

সহজ শর্তের ঋণ সহজে পাওয়া যায় না, এবং কঠিন ঋণের সুদ দ্রুত বাড়তে থাকে। বিদেশী সাহায্য পাওয়া দেশগুলো ঋণের হাত থেকে মুক্ত না হয়ে বরং আরও বেশি করে ঋণের জালে জড়িয়ে পরে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্য যে ভূমিকা রেখেছে তার দিকে ইঙ্গিত করে প্রখ্যাত ফরাসী অর্থনীতিবিদ ড্যানিয়েল থর্নার ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, 'বিদেশী সাহায্য এবং উপদেষ্টা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালে তা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতিকারক হবে কি না।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশ সরকার যেসব রাষ্ট্র বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল তাদের কাছ থেকে কোন ধরণের সাহায্য নেয়া হবে না বলে ঘোষণা করেছিল। এর অর্থ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সহায়তা না নেয়া এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য সংকুচিত অর্থ সরবরাহ। বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশনের প্রথম সদস্যদের একজন আনিসুর

রহমান মনে করেন 'বৈদেশিক সহায়তা সংক্রান্ত এই বৈপ্লবিক নীতি' অনুসরণ করা সম্ভব হলে 'দেশের প্রতিষ্ঠানগুলো বদলে যেত এবং এর ফলে পুরো সমাজের চিত্রও পাল্টে যেত।'

স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ একটি গুরুতর অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে ছিল। বন্ধু রাষ্ট্রগুলোর কাছ থেকে পাওয়া সাহায্য এমনকি ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য যে সম্পদের প্রয়োজন সে চাহিদাটুকুও মেটানোর জন্য অপ্রতুল ছিল। ওয়েন উইলকক্স বলেন, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম বছরে ভারত দেশটিকে উদারভাবে যে সহায়তা দিয়েছিল তা গরীবের পক্ষ থেকে গরীবকে সহায়তা করার বিরল দৃষ্টান্ত ছিল।' এটি একটি অহঙ্কারী উক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু ১৯৭১ সালেই ড. অর্জুন সেনগুপ্ত দেখিয়েছিলেন যে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যকার সম্পর্কটি 'ঋণ সাহায্য দাতা বা উপদেষ্টা'র সম্পর্ক হতে পারে না। ১৯৭২ সালে মুজিব যখন সোভিয়েত ইউনিয়নে যান তখন তাকে ব্যাপক সমাদর ও শ্রদ্ধা দেখানো হলেও তারা জানিয়ে দেয় বাংলাদেশের যে বিপুল সহায়তা দরকার তা সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে করা সম্ভব নয়।

১৯৭২ সালে বিশ্ব ব্যাংকের নেতৃত্বাধীন দাতাগোষ্ঠীর একটি প্রতিনিধি দল ঢাকা সফর করে । পাকিস্তানের ঋণের দায়ের একটি অংশ যদি বাংলাদেশ বহন করতে রাজি না হয় তবে ঐ দাতা গোষ্ঠীর পক্ষে বাংলাদেশকে সহায়তা দেয়া কঠিন হয়ে পড়বে বলে প্রতিনিধি দলটি জানিয়ে দেয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের সাথে সম্পদ ও দায়ের বিষয়ে কোন মীমাংসায় না পৌছে বাংলাদেশের পক্ষে তাদের ঋণের কোন অংশের দায় নেয়া সম্ভব ছিল না।

দাতাগোষ্ঠীর প্রতিনিধি দলটিকে মুজিব বলেছিলেন, 'আমি জানতে পেরেছি আপনারা আমাদের যে কোন সহায়তা করার জন্য কোন 'ঋণের দায়' নেয়ার শর্ত দিয়েছেন। সেটাই যদি আপনাদের শর্ত হয়, তাহলে আমরা আপনাদের সহায়তা নিতে পারছি না। আমাদের জনগণ রক্ত দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছে; এদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে হলে, টিকে থাকতে হলে তা আমরা সেই শক্তির জোরেই পারবো। আপনাদের ঋণ সাহায্য ছাড়াই আমরা তা করতে পারবো।

ড. কামাল হোসেন বাংলাদেশ ও দাতাগোষ্ঠীর মধ্যকার এই সংলাপে অংশ নিয়েছিলেন, তিনি জানান, 'তিন সপ্তাহ পর বিশ্ব ব্যাংকের পক্ষ থেকে চিঠি আসে যাতে জানানো হয় যে ব্যাংক তার অবস্থান পুনর্বিবেচনা করছে, কারণ কর্তৃপক্ষ মনে করছেন বাংলাদেশের অবস্থান অযৌক্তিক নয়।' বিশ্ব ব্যাংক আসলে শুধু কালক্ষেপণ করছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা বহু মার্কিনীর অহমিকায় আঘাত হেনেছিল, কিন্তু অনেক মার্কিনীই মনে করছিলেন অর্থ ব্যয় করে প্রভাব বিস্তার করা যাবে। জোসেফ ক্র্যাফট কোন রাখঢাক না করেই এমন বলেছেন। ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ তিনি

ইন্টারন্যাশনাল হেরাল্ড ট্রিবিউন পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'যদি নিক্সন তার ব্যক্তিগত অহমিকার উর্ধ্বে উঠতে পারেন, তবে মার্কিন অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে পূর্ব বাংলা, পাকিস্তান ও ভারতের ক্ষমতাসীনদের সাথে আরও মজবুত সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব হবে। দীর্ঘ মেয়াদের বিবেচনায় মার্কিন স্বার্থের বিরোধী শক্তিগুলোর নাটকীয় কোন প্রক্রিয়ায় মতায় চলে আসা ঠেকানোর এটিই সবচেয়ে নিশ্চিত উপায়।'

তুমি যদি একজন ব্যক্তিকে একটি মাছ দাও, তবে তুমি তার একবেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করলে।

তুমি যদি তাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দাও, তবে সে সারা জীবন খেতে পারবে।'

সাহায্য দানকারী দেশগুলো কখনো সাহায্য গ্রহণকারী দেশগুলোর উন্নয়নের কথা ভেবে তাদের সহায়তা করে না। ওয়েন উইলকক্সের কাছে দেয়া বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান তার সাক্ষাৎকারে এ বিষয়টি পরিস্কার করেছিলেন: 'পশ্চিমা বিশ্ব আমাদের ক্ষুধার্ত রাখবে না, কিন্তু তারা কখনোই প্রকৃত অর্থে উন্নত হতে দেবে না।'

প্রথম দুই বছরে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ ও সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে সর্বমোট দুই বিলিয়ন ডলার সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রম (ইউএনআরওবি) এর প্রধান ফ্র্যান্সিস লাকোস্টে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ বলেছিলেন, বাংলাদেশে জাতিসংঘের কার্যক্রম ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে উল্লিখিত থাকার মতো বিশাল ব্যপ্তি সম্পন্ন। তার গর্বিত হওয়া অবশ্যই যথার্থ। কিন্তু সাহায্যের পরিমাণ বিশাল হলেও তা ছিল প্রধানত পণ্য সাহায্য, যার মধ্যে আবার খাদ্যশস্যই প্রধান ছিল। ১৯৭৩ সালের ২০ ডিসেম্বর এ ইউএনআরওবি'র উপ প্রধান সুভাষ দত্ত মত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতি পুনর্নিমাণের ক্ষেত্রে এই সাহায্য সামান্যই ভূমিকা রাখতে পেরেছিল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন প্রায় ৫ মিলিয়ন মানুষ না খেয়ে মৃত্যু বরণ করবে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অবরুদ্ধ থাকা এবং পরিবহন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে বন্ধু রাষ্ট্রগুলো দ্রুত খাদ্য পাঠালেও তা সঠিক সময়ে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে পৌছানো কঠিন হবে। যে দুর্ভিক্ষের ভয় সবাই করছিলেন তা ঠেকিয়ে দেয়া গিয়েছিল কেবল জাতিসংঘের ত্রাণ তৎপরতা আর ভারতীয় খাদ্য সাহায্যের কারণে। ১৯৭২-এর সেপ্টেম্বর নাগাদ সবচেয়ে খারাপ সময় শেষ হয়ে এসেছিল। মুজিব এ সময় আশাবাদী ছিলেন। তিনি তখন বার বার বলতেন, 'বাংলাদেশ একটি চমৎকার জায়গা।' তিনি নিশ্চিত ছিলেন বাংলাদেশের একটি স্বর্ণালী ভবিষ্যৎ রয়েছে।

১৯৭২-এর ১৯ সেপ্টেম্বর বিবিসিকে তখনকার অর্থমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেছিলেন, যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের তুলনায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ অতি অল্প সময়ে অনেক বেশি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।

তাজউদ্দীন হয়তো কথার কথা হিসেবেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের তুলনা করেছিলেন। কিন্তু তার কথাটি একটুও অতিরঞ্জিত ছিল না।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এ লন্ডনের ফাইনান্সিয়াল টাইমস পত্রিকায় ছাপা হয়, 'বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানী পণ্য পাট আশাতীত দ্রুত গতিতে রপ্তানী হচ্ছে। কারখানাগুলো কাজ করছে। একদম শূন্য অবস্থা থেকে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ৭০ মিলিয়ন পাউন্ডে নিয়ে আসা হয়েছে।' বৈদেশিক মুদ্রার মজুদের শতকরা ৯০ ভাগ এসেছিল বাণিজ্য থেকে আসা উদ্বৃত্ত থেকে। ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ নাগাদ দেশের পাটকলগুলো তাদের আগের উৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং চট্টগ্রাম স্টিল মিল 'আগের উৎপাদনের রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল।'

বাংলাদেশ রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে ভেঙ্গে পড়বে এবং এর ফলে একটি নৈরাজ্য তৈরি হবে বলে যে সাধারণ আশঙ্কা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯৭৩-এর ২১ ডিসেম্বরে লন্ডনের নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকায় 'প্রসপেক্টস অফ বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে মাইকেল বার্নস বলেছিলেন, 'এই মুহূর্ত পর্যন্ত 'বঙ্গবন্ধু' নিজেই বাংলাদেশের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। শেখ মুজিবের গতিশীলতা এবং ক্যারিশমা এখনো বিদ্যমান, হয়তো দেশের সমস্যা জর্জরিত অবস্থার কারণে এগুলো কিঞ্চিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারপরও এগুলোর কারণেই এখনো তার দেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ আছে। সামনে যে বিপদজনক এবং কঠিন সময় আসছে সে সময়ে বাংলাদেশের মানুষের মুজিবের নেতৃত্ব খুবই দরকার হবে।'

সামনে সত্যিই কঠিন সময় অপেক্ষা করছিল।

অন্তর্জাতিক ছায়া

২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ জন সোয়েইন সানডে টাইমস পত্রিকায় ছাপা লেখায় চিন্তিত হয়ে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশ কি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছিল?' সোয়েইন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেননি । তার লেখার শিরোনামটি ছিল তাকে দেয়া বাংলাদেশী কর্মকর্তাদের বক্তব্য: 'বিধ্বস্ত অর্থনীতিটি পুনরুদ্ধারের জন্য যে সময় ও সুযোগ দরকার ছিল তা বাংলাদেশ কখনো পায়নি। ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কারণে দেশের উৎপাদন বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল এবং অবকাঠামোগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালে খরা হয়েছিল এবং আগের বছর বিশ্ব বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যবৃদ্ধি ছিল আগের যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি। বাংলাদেশ একটি ভুল সময়ে জন্ম নিয়েছিল।'

স্বাধীনতার পরের প্রথম তিন বছর যে বিপুল সংখ্যক সমস্যার মোকাবেলা বাংলাদেশকে করতে হয়েছিল এগুলো তার কিয়দংশ মাত্র।

ভয়াবহ বন্যার কারণে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন সেপ্টেম্বর থেকে পিছিয়ে ডিসেম্বরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৯৭০ সালে যে প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হেনেছিল তার আঘাতে প্রায় অর্ধ মিলিয়ন প্রাণহানি ঘটেছিল এবং এটি শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল। পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর তাণ্ডবলীলায় সারা বাংলাদেশ একটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী পাক বাহিনী বাংলাদেশের ১১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল। এই হিসাবে অবশ্যই 'গুণগত ক্ষয়ক্ষতি হিসেব করা যায়নি এবং উৎপাদন আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যে ক্ষতি হয়েছে সেটিও হিসাব করা হয়নি।' স্বাধীনতার পরে দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষি খাতের ছিল বেহাল অবস্থা। সে সময় কৃষিতে ব্যবহৃত পশু, সার, সেচ পাম্প এবং এমন কি বীজেরও অভাব ছিল এবং দেশের মুদ্রা তহবিলও ছিল শূন্য।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মানবিক দিকটি; তখন এমন একটি পরিবার খুঁজে পাওয়াও কঠিন ছিল যুদ্ধে যারা কিছু হারায়নি।

বাংলাদেশের প্রধান দুটি ফসল 'আউশ' ও 'আমন' এর ফলন বাধাগ্রস্ত হয়েছিল ১৯৭২/৭৩ সালের উপর্যুপরি খরা এবং বন্যার ফলে। এসবই ঘটেছিল দেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষিখাত যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল তা কাটিয়ে ওঠার আগেই।

কিছু সাংবাদিক সে সময় বাংলাদেশকে দুর্যোগে অভ্যস্ত দেশ বলেছিলেন। বাঙালী তাদের প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে অনেক দুর্যোগ মোকাবেলা করেছে এটি সত্য, কিন্তু একটি দেশ কখনোই দুর্যোগে অভ্যস্ত হয়ে যায় না। প্রতিটি দুর্যোগই তাদের দুর্বলতর করে এবং পুনরুত্থান আগের চেয়েও কঠিনতর হয়ে যায়। প্রাকৃতিক বা

মানবসৃষ্ট দুর্যোগের হাত থেকে ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সাল সময়কালে বাংলাদেশ একটুও বিশ্রাম পায়নি। এই সব কিছুর উপরে ১৯৭৪ সালে এদেশকে আবার বিশ্বব্যাপী ভয়ঙ্কর মুদ্রাস্ফীতিরও মোকাবেলা করতে হয়েছিল। এসব অসহনীয় হয়ে উঠেছিল।

১৯৭২ সালে জনসংখ্যা ও খাদ্য সরবরাহের মধ্যকার সম্পর্ক যা এর আগের ২০ বছর যাবত 'অবাক করার মতো স্থিতিশীল ছিল' সেটি বিশ্ব ব্যাপী খাদ্য সংকটের কারণে অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে। কোয়েন্টিন এম. ওয়েস্ট এর মতে দুটি কারণে এ সংকট ঘনিভূত হয়েছিল: জ্বালানী সংকট এবং মানুষের স্বচ্ছলতা । ওয়েস্টের মতে, 'জ্বালানী সংকট অতি সাম্প্রতিক বিষয় হলেও, বিশ্ব জুড়ে আয় বৃদ্ধির সংকট বহুদিন ধরেই ঘনিভূত হচ্ছিল।' ১৯৭৩ সালে খাদ্য উৎপাদন বাড়লেও উচ্চ চাহিদা আর নিম্ন সরবরাহের কারণে তখনো খাদ্যের উচ্চ মূল্যই বহাল ছিল। ওয়েস্ট ধারণা করছিলেন কিছু কিছু দেশের খাদ্য পরিস্থিতির উপর এই জ্বালানী ও সারের সংকটের সম্ভাব্য প্রভাব হবে ভয়াবহ। 'কিন্তু' তিনি বলেছিলেন, 'এগুলো এবং অন্যান্য সমস্যার ফলে একটি ব্যাপক খাদ্য দুর্যোগ ঘটার সম্ভাবনা নেই। কৃষিক্ষেত্রে কোন মহাপ্রলয় ঘটতে যাচ্ছে না। বিশ্বে খাদ্য উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে...

১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বিশ্বে কোন খাদ্য ঘাটতি ছিল না, কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে যথেষ্ট খাদ্য উৎপাদিত হচ্ছিল না এবং বাজারে খাদ্যের সরবরাহ ছিল না; আর পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ এসব দেশেই বাস করত। বিশ্বের প্রধান খাদ্য রপ্তানীকারকরা জানান যে তাদের কাছে যথেষ্ট খাদ্যশস্য আছে এবং তারা খাদ্যের জরুরী চাহিদা আছে এমন ৩২ টি দেশে ৭.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্য পাঠাতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু এই ৭.৫ মিলিয়ন টন খাদ্যশস্যের দাম পড়বে ১৮,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই অর্থ কোথা থেকে আসবে?

১৯৭৪ সালে ক্ষুধার কারণে এক মিলিয়নেরও বেশি লোকের মৃত্যু হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছিল, কিন্তু বিশ্ব খাদ্য সম্মেলনে 'জরুরী পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য যে আন্তঃদেশীয় প্রতিষ্ঠান গুলো ছিল সেগুলোকে মজবুত করার জন্য মাত্র ৫,০০,০০০ টন খাদ্য একটি আন্তর্জাতিক খাদ্য মজুদে শুভেচ্ছা হিসেবে দেয়ার প্রস্তাবও নাকচ করে দেয়।

মুক্ত বাজারের নৈরাজ্যকর অবস্থায় দরিদ্রতর দেশগুলোই ভুক্তভোগী হয়েছিল।

এফএও-এর মহাপরিচালক ড. আদ্দেকে বোয়েরমা ১৯৭৪ সালে বলেছিলেন, 'বিশ্ব খাদ্য সম্মেলন যে সমস্ত বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশ্ব কৃষি বাজারে অস্থিতিশীলতা এবং তাদের কৃষি রপ্তানি পণ্যের উপর বিভিন্ন রকম ট্যারিফ ও নন-ট্যারিফ বাধা থাকার কারণে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন

হচ্ছে। যেহেতু এসব দেশ তাদের নিজেদের খাদ্য ও অন্যান্য পণ্য আমদানী করতে প্রয়োজনীয় অর্থের জন্য কৃষি রপ্তানি আয়ের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল, তাই বিশ্বের বর্তমান খাদ্য সংকটের উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে বলতে হবে।'

একদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলো আগের চেয়ে দুই থেকে তিনগুণ দাম দিয়ে তাদের মৌলিক আমদানীগুলো করছিল, অন্যদিকে তাদের রপ্তানীকৃত পণ্যের দাম সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি এবং ক্ষেত্র বিশেষে কমেছিল।

বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম অর্থবছরে, অর্থাৎ ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশটির রপ্তানী আয় ধীরে ধীরে বাড়ছিল, কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য শস্য, ভোজ্যতেল, সার, পেট্রোলিয়াম ও কিটনাশকের মতো প্রয়োজনীয় আমদানী পণ্যগুলোর দাম খুব দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। অশোধিত তেলের দাম রাতারাতি ব্যারেল প্রতি ২.৩৪ মার্কিন ডলার থেকে বেড়ে ১১.০০ মার্কিন ডলার হয়েছিল এবং খাদ্যশস্যের দাম টন প্রতি ৭৮২ টাকা থেকে ১৬০০ টাকা হয়েছিল। পরিবহন খরচও দ্রুত বেড়েছিল।

সদ্য স্বাধীন হওয়া বাংলাদেশের 'পণ্যসমূহের দ্রুত মূল্য বৃদ্ধির বা অপ্রাপ্যতার প্রভাব মোকাবেলা করার মত' কোন খাদ্য মজুদ বা বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিল না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বৈশ্বিক মুদ্রাস্ফীতি এবং প্রতিকূল ভারসাম্যের সম্মিলিত প্রভাব ছিল মারাত্মক।

জেরাল্ড এ. পোলক ১৯৭৪ সালে তার 'দি ইকোনোমিক কনসিকোয়েন্সেস অফ দ্যা এনার্জি ক্রাইসিস' প্রবন্ধে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এই দেশগুলোকে তেল আমদানীর জন্য যে অতিরিক্ত মূল্য দিতে হচ্ছে সে অর্থ আসছে তাদের মূলধনী যন্ত্রাদি কেনার অর্থ থেকে, এর ফলে ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ত্যাগ করতে হচ্ছে, এবং অতিরিক্ত মূল্যের কারণে তারা যতোটুকু তেল আমদানী থেকে বিরত থাকছে তার ফলে তাদের বর্তমান জাতীয় আয় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কাজেই অন্ধকার মহাদেশটির পূর্বভাগ আরও বেশি অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে যাচ্ছে এবং উপমহাদেশের দেশগুলোকে আর 'উঠে আসতে থাকা' বলে বিশেষায়িত করা যাবে না।'

বাংলাদেশ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিভাজনে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং ক্রমেই নৈরাজ্যের মধ্যে পতিত হবে বলে যে সাধারণ আশঙ্কা ছিল তা ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

'দেশটির স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী যখন এগিয়ে আসছে' বোস্টন থেকে প্রকাশিত ক্রিস্টিয়ান সাইন্স মনিটর পত্রিকায় ১৮ অক্টোবর ১৯৭২ এ ছাপা হয়েছিল, 'যে সমস্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে বাংলাদেশ একটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে টিকতে পারবে না, তারা ক্রমেই ভুল প্রমাণিত হচ্ছেন।' আইন শৃঙ্খলা

পরিস্থিতি ভেঙ্গে পড়েনি। ফ্র্যাঙ্কফুর্টের ডাই ওয়েল্ট পত্রিকার একজন প্রতিনিধি ৮ ডিসেম্বর ১৯৭২-এ তার প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, 'যে কেউ ঢাকা, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার রাস্তায় নির্বিঘ্নে হাঁটতে পারেন, এমন কি রাতের বেলায় ফ্র্যাঙ্কফুর্টের রাস্তায় হাঁটতে গেলে যতোটা ভয় কাজ করে এখানে তার চেয়ে বেশি নয়, এবং নিউইয়র্ক শহরের অনেক এলাকার থেকেও এসব শহর তুলনামূলক নিরাপদ।' ঐ প্রতিবেদক আরও লিখেছিলেন, 'এই আশ্চর্য ঘটনার সবচেয়ে বাস্তব ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই মুজিব। এই রাষ্ট্রটিকে তিনিই ধরে রেখেছেন।'

দেশ স্বাধীন হওয়ার এক বছরের মধ্যেই যে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিল সেটি ওয়েস্ট মিনিস্টার মডেলের বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। কিছু কিছু বামপন্থী গোষ্ঠী এই সংসদীয় গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া ধারণা বলে প্রত্যাখান করেছিল। কিন্তু তাদের এই প্রত্যাখানের মধ্যে রাজনৈতিক একনিষ্ঠতার চেয়ে রাজনৈতিক কৌশলই বেশি ছিল, কারণ মুজিব খুব দ্রুতই যে নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেখানে এসব গোষ্ঠীর ভালো ফল করার সম্ভাবনা ছিল খুবই ক্ষীণ।

মুজিব সব সময়ই তার কথা রাখতেন। নতুন সংবিধানের আওতায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে, এটি ছিল দেশ স্বাধীন হওয়ার ১৫ মাসের মধ্যে এবং 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' এই ঐতিহাসিক ভাষণ মুজিব যেদিন দিয়েছিলেন তার ঠিক দুই বছর পর।

কিছু বিরোধী দল দাবী করতে থাকে আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালের নির্বাচনে কেবল প্রাদেশিক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল এবং এর ফলে স্বাধীন দেশে আওয়ামী লীগের সরকারকে তারা প্রশ্ন সাপেক্ষ বলে মনে করছিলেন। মুজিবও দেশবাসীর কাছ থেকে নতুনভাবে মনোনীত হতেই আগ্রহী ছিলেন। তিনিই প্রথমে কিছু আসন বিরোধী দলগুলোর জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যখন কিছু বিরোধী গোষ্ঠী তার সমালোচনায় আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে তখন তিনি একটি ঝড়ো নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু করেন, যেমনটি তিনি করেছিলেন ১৯৭০ সালে। যেখানেই মুজিব যেতেন সেখানেই প্রচুর মানুষের ভিড় জমে যেত। জনগণের উপর তার যাদুকরী ব্যক্তিত্বের প্রভাব কাজ করছিল এবং তিনিও তাই চাচ্ছিলেন।

৭ মার্চ ১৯৭৩ সালে লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকা বাংলাদেশের নির্বাচনী পরিস্থিতি নিয়ে লিখেছিল, 'আগামীকাল বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন নিয়ে যে একটি মাত্র বিষয় নিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ভাবিত হতে পারেন তা হলো তার দল আওয়ামী লীগ হয়তো ৩০০ টি সংসদীয় আসনেই সহজ জয় পেয়ে যেতে পারে।' আরও লেখা হয়েছিল, 'মুজিব হয়তো এ রকম ঘটলে এক ভাবে খুশিও হতে পারেন যে এর ফলে প্রমাণিত হবে তার দেশের মানুষ তাকে

ততোটাই ভালোবাসে যতোটা তিনি নিজে তাদের ভালোবাসেন (যেমনটি তিনি নিজে প্রায়ই বলে থাকেন)।

প্রতিটি নির্বাচনী পোস্টারেই মুজিবের একটি বড় ফটোগ্রাফের সাথে সংসদীয় আসনের প্রার্থীর ছোট একটি ফটোগ্রাফ ছিল।

জাতীয় সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ২৯১ টিতে জয়লাভ করেছিল। মুজিবের ব্যতিক্রমী জনপ্রিয়তাই নির্বাচনের নির্ধারক বিষয় ছিল। এমনকি অনেক অজনপ্রিয় আওয়ামী লীগের প্রার্থীও জয় পেয়েছিলেন। মুজিবের যাদুকরী ব্যক্তিত্ব জনগণ ঐ সব প্রার্থীর ত্রুটিগুলোর বিষয়ে অন্ধ করে দিয়েছিল। ঠিক ১৯৭০ সালের মতই তারা মুজিবকেই ভোট দিয়েছিলেন। এটি ছিল মুজিবের জন্য একটি ব্যক্তিগত বিজয়, তার প্রতি জনগণের আস্থা পুনর্ব্যক্ত হয়েছিল। মুজিব-বিরোধী শক্তি, যারা মুজিবকে ছোট করতে চাইছিল তারা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছিল।

কিন্তু, আওয়ামী লীগের জন্য হয়তো এ বিজয়টি একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল। সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর করতে হলে অন্তত একটি শক্তিশালী বিরোধী দল থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সংসদে কোন বিরোধী গোষ্ঠী পর্যন্ত তখন অনুপস্থিত ছিল। আওয়ামী লীগ নেতারা তখন আগের চেয়েও বেশি আত্মতুষ্টিতে ভুগতে শুরু করেন।

জনগণ মুজিবকে ব্যাপক সমর্থন দিয়েছিল। এরপর কি?

সিঙ্গাপুর থেকে প্রকাশিত সানডে মেইল পত্রিকায় ১১ মার্চ ১৯৭৩ এ ছাপা হয়েছিল, 'শেখ নিজে একজন সাহসী এবং বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তি হিসেবে তাকে যথেষ্ট জন সমর্থন দেয়া হয়েছে, এর জোরে তার এখন বাংলাদেশের স্বপ্ন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন করতে পারা উচিৎ- এমন কি এজন্য তাকে নিজের দলকে নাড়িয়ে দিয়ে হলেও।

তিনি কি তাই করতে যাচ্ছিলেন?

মুজিব রাজনীতির কবি ছিলেন, কিন্তু তার মধ্যে কি একজন কৌশলী প্রশাসক যিনি প্রয়োজনে কঠোর হতে পারেন এমন গুণাগুণ ছিল? তিনি অনেক সাহসী ছিলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু নিজের জনপ্রিয়তা কমিয়ে দিতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো কি তার মানসিক শক্তি ছিল?

যাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সহায়তা করার অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছিল এবং যারা এ সন্দেহে আটক ছিলেন তাদের সবাইকে দেশের দ্বিতীয় বিজয় দিবসের দিন ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর মুক্তি দেয়া হয়েছিল। মুজিব বলেছিলেন বাংলাদেশের সরকার প্রতিশোধের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না।

জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের মতো সাম্প্রদায়িক দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা তখনো বহাল ছিল। কিন্তু সবুর খান, খাজা খায়েরউদ্দীন এবং অন্য যে সব নেতা ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭৩-এ মুক্তি পেয়েছিলেন তারা আবার সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসে ৩১৮৬ টি ইউনিয়ন পরিষদ এবং পৌরসভার নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলিম লীগ ও আরও কিছু দল ফেরত আসে। যদিও এসব দলগুলো ১০ থেকে ১৫ ভাগের বেশি আসনে জয় পায়নি, তবুও স্বাধীনতার মাত্র দুই বছর পরই তাদের উত্থান চিন্তার উদ্রেক করার মতো ছিল।

ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনের একটি সাত সদস্য বিশিষ্ট দল ১৯৭৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আসে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশকে ২২ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য ইসলামিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে রাজি করানো এবং 'বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ঐক্যকে উৎসাহিত করা'।

মুজিব জোর দিয়ে বলেছিলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান 'একে অপরকে স্বীকৃতি দিয়েছে।' এরপরও পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টির উপরই বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল। পাকিস্তান যেদিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ঢাকায় সেদিন উল্লাস কর হয়েছিল। ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪-এ ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ অবজারভারে লেখা হয়েছিল, 'কৌশলগত বিবেচনায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাওয়ায় এখন স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান দৃঢ়তর হয়েছে।'

স্বাধীন হওয়ার দুই বছর পরে এবং একশোটিরও বেশি দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পরও পত্রিকাটির মনে হয়েছিল কেবল পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার পরই বাংলাদেশের অবস্থানটি নিরাপদ হয়েছে। এটি ছিল খুবই হতাশাজনক।

খুব ছোট একটি গোষ্ঠী মনে করতো যে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি বিলম্বিত হলে সেটি 'বাংলাদেশের মতাদর্শিক ভিত্তি দৃঢ়তর' হওয়ার জন্য সহায়ক হবে। লন্ডন থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশ নিউজলেটার এই মত সমর্থন করছিল, তাদের মতে এই স্বীকৃতি পাওয়ার 'প্রথম ও অনিবার্য' ফল হবে 'ধর্মীয়-সাম্প্রদায়িক রেষারেষির বাঁধ খুলে দেয়া।' এরকম আশঙ্কা করার মতো কারণ ছিল। কিন্তু পত্রিকাটিতে যখন লেখা হয়, 'আমরা আশা করি মুজিবের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিরোধীদের মধ্য থেকে কেউ কেউ তার প্রবল সমর্থকে রূপান্তরিত হবেন' তখন তারা ভুল করেছিল। স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিগুলো পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি থেকে নিজেদের শক্তি পেয়েছিল এবং ১৯৭৪-এর এপ্রিলে ঢাকায় ভুট্টো যে অফলপ্রসু সফর করেছিলেন তার পর তাদের মুজিব বিরোধিতা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠে।

মুজিব গুরুতর ব্রঙ্কিয়াল ইনফেকশনে ভুগছিলেন, এবং এ কারণে ১৯ মার্চ ১৯৭৪-এ আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করানো ও চিকিৎসা গ্রহণের জন্য একটি বিশেষ সোভিয়েত বিমানে চড়ে মস্কোর উদ্দেশে যাত্রা করেন। ব্রঙ্কাইটিসে তিনি অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন। এর এক বছর আগে ওটাওয়াতে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে অংশগ্রহণের সময় তিনি ব্রঙ্কিয়াল ইনফেকশনে ভুগেছিলেন।

কিছু কিছু পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল মুজিবের ক্যান্সার হয়েছে। সাংবাদিকরা 'মুজিবের পর কে?' এমন প্রশ্ন করছিলেন। মুজিবের সহকর্মীদের এবং সহযোগীদের মধ্যে কেউ কেউ মুজিবের মৃত্যুর পর আসন্ন ক্ষমতার জন্য লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

যখন ডাক্তারী পরীক্ষার ফলে জানা গেল যে মুজিবের স্বাস্থ্যগত সমস্যার মূলে ব্রঙ্কাইটিস ও অতিপরিশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, তখন অনেকে ধারণা করেছিলেন মুজিব হয়তো রাজনৈতিক পরামর্শের জন্যই মস্কো গিয়েছিলেন। 'তা না হলে তিনি কেনই বা মস্কো গিয়েছিলেন?' অনেকেই এমন প্রশ্ন করছিলেন। মুজিবের মস্কোকে চিকিৎসার জন্য বেছে নেয়ার পেছনে দুটি সহজ কারণ ছিল। এর আগে মুজিবের যখন পিত্ত থলির অপারেশন হয়েছিল তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন তাকে সেখানে যেতে আমন্ত্রণ জানালেও ততোদিনে লন্ডনে চিকিৎসা করার সব ব্যবস্থা করা হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটেনে অপারেশনের পরে এবং সুইজারল্যান্ডে বিশ্রামের সময় তাকে প্রচুর বাঙালী দর্শনার্থীদের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়েছিল, এদের অনেকে ঢাকা থেকে তার সাথে দেখা করতে সেখানে গিয়েছিলেন। দেশে অথবা ব্রিটেনে তিনি শান্তিতে থাকতে পারতেন না। কোন কারণে মুজিবের ধারণা হয়েছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের চিকিৎসা সেবার মান উন্নততর, সেখানে আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে রোগীকে বিবেচনা করা হয় না। যাই হোক, সবচেয়ে প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল এটাই যে সোভিয়েত ইউনিয়নে তিনি ঠিক মতো বিশ্রাম নিতে পারবেন, যা তার খুব প্রয়োজন ছিল।

মস্কো থেকে ফেরার পথে ১০ এপ্রিল ১৯৭৪, মুজিব দিল্লীতে ১৬ ঘণ্টার জন্য যাত্রা বিরতি করেছিলেন। সেখানে তিনি এর একদিন আগে ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে যে ত্রিপীয় চুক্তি হয়েছিল সেটির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। এই চুক্তির প্রতি সম্মান দেখিয়ে বাংলাদেশ সেদেশে বন্দী ১৯৫ পাকিস্তানী যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া এগিয়ে না নেয়ার ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল।

১৯৭৪ সালের মে মাসে মুজিবের পাঁচ দিনের ভারত সফরে ভারত বাংলাদেশের মৈত্রীর সম্পর্ক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৭ মে ১৯৭৪-এ দেয়া একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয় ফারাক্কা প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে শুষ্ক মৌসুমে যখন গঙ্গা নদীতে খুব ক্ষীণ প্রবাহ থাকে সে সময় পানির সুষম বণ্টন বিষয়ে উভয় দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানো হবে।

ভারত ও বাংলাদেশের সীমানা চিহ্নিতকরণ বিষয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এ সময় নেয়া হয়েছিল। দক্ষিণ বেরুবাড়ি ইউনিয়নের দক্ষিণ অংশ ভারতের আওতাধীন রাখার সিদ্ধান্ত হয়, বিনিময়ে বাংলাদেশ পেয়েছিল দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতা এলাকার অধিকার।

মিসেস গান্ধী ও শেখ মুজিব একে অপরের প্রতি 'একটি পুরো প্রজন্ম যে সমস্যার সমাধান নিয়ে হিমশিম খেয়েছে সেটি সমাধান করতে পেরে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছিলেন।' তাদের কৃতজ্ঞ বোধ করার যথেষ্ট কারণ ছিল। তারা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন দুটি দেশের মধ্যে যে কোন বিষয়েই উভয়ের জন্য গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌছানো সম্ভব যদি এ জন্য প্রয়োজনীয় সহনশীলতা দেখানো হয়।

কিন্তু ঐ দিল্লী সফরে মুজিবের সঙ্গে থাকা মোস্তাক এই চুক্তিতে অখুশি হয়েছিলেন। চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করতে এক থেকে দুই ঘণ্টা দেরি হয়েছিল।

একজন সাংবাদিক মুজিবকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'দিল্লী থেকে আপনার ফিরে আসতে কি কারণে বিলম্ব হয়েছে?' মুজিব কৌতুক করে জবাব দিয়েছিলে, 'আমি দিল্লীতে থাকতে পছন্দ করি।'

মাওলানা ভাসানী বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভাঙ্গতে বাংলাদেশকে ভারত বাধ্য করেছে এমন অভিযোগ আনেন। তিনি ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যেদিন ভারত এমন কাজ করবে সেদিন তাকে কঠিন ফল ভোগ করতে হবে। দহগ্রাম ও আঙ্গরপোতার কথা তিনি সুবিধাজনকভাবে ভুলে গিয়েছিলেন।

২৩ জুন ১৯৭৫, ভুট্টো ঢাকায় যে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন তা দেখে অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। ১৯৭১-এর মার্চে ঢাকার রাস্তায় জনতা বার বার স্লোগান দিয়েছিল :

শেখ মুজিব, শেখ মুজিব,
ভুট্টোর মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

এটি দেশে অবাক লাগছিল সেই ঢাকাতেই ভুট্টোকে তিন বছর পর উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল। হাজারো মানুষ শুধু কৌতূহলের বসেই সেদিন সমবেত হয়েছিল। ১৯৭৪-এর ফেব্রুয়ারিতে যখন মুজিব লাহোর সফরে গিয়েছিলেন তখন সেখানেও এমন ভিড় জমে গিয়েছিল।

তবে ভুট্টোকে দেয়া অভ্যর্থনার পুরোটাই স্বতঃস্ফূর্ত ছিল এমন বলা যাবে না। পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার পর থেকেই স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র ভুট্টো'র বাংলাদেশে সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

২৪ জুন ১৯৭৫ ভুট্টোর সম্মানে বঙ্গভবনে যে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, 'বাংলাদেশ ও তার প্রতিবেশী ভারতের মধ্যে অশান্তির বীজ বপন করতে চায় বলে পাকিস্তান সম্পর্কে অভিযোগ

করা হয়ে থাকে। আমি জানিনা কারা এমন অভিযোগ করে থাকেন। তারা কি জানেন না পাকিস্তান চাইলেও এমন কিছু করতে সক্ষম হতে পারবে না? গত আড়াই বছরে কি আমরা আপনাদের সাথে কোন রকম দেখা সাক্ষাৎ করতে পেরেছি? আমরা কি বাংলাদেশের দৃশ্যপটে অনুপস্থিত ছিলাম না?'

তিনি চোখে পড়ার মতো বেশি বেশি প্রতিবাদ করছিলেন।

তার সাথে সফরকারী দলের সদস্যরা অধিকাংশ সময়েই ভারতের উপস্থিতি বিষয়ে আলোচনা করছিলেন।

ভুট্টোর সাথে সফর করছিলেন এমন পাকিস্তানি সাংবাদিকদের অনেকের প্রতিবেদনের লেখাই ছিল প্রত্যাশিতভাবে ভারত-বিরোধী। ওয়াজিদ শামসুল হাসান বাংলাদেশ সরকারের 'প্রতিটি বিভাগেই' ডি. পি. ধরের লোক আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু যখন সরকারের কাছ থেকে বিশেষ অনুমতি পাওয়া সাংবাদিকরাও পাকিস্তানি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলার সুযোগ পান নি, তখনও এর আগে পাক বাহিনীকে সহযোগিতা করার ইতিহাস রয়েছে এমন ব্যক্তিরা যখন পাকিস্তানিদের সাথে ভাতৃসুলভ দেখা-সাক্ষাৎ করছিলেন তখন গোয়েন্দা বাহিনীর লোকেরা সেদিক থেকে নজর সরিয়ে রাখছিলেন।

চীনপন্থী বামপন্থীরা হাসানকে বলেছিলেন যে পাকিস্তানের বাংলাদেশকে ছেড়ে কথা বলার দরকার নেই।

পাকিস্তান তখন যত দ্রুত সম্ভব বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়ে আগ্রহী ছিল। ভুট্টো এমনকি তার সাথে করে বাংলাদেশে পাকিস্তানের হবু রাষ্ট্রদূত মাহমুদ হারুনকেও নিয়ে এসেছিলেন, অথচ সম্পদ ও দায়ের বণ্টন প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে তিনি আগ্রহী ছিলেন না। তিনি বলেন, 'আমি আমার সাথে ব্যাংকের চেক বই নিয়ে আসিনি।'

ভুট্টোর সফরের খবর সংগ্রহ করতে ঢাকায় আসা একজন পশ্চিমা সাংবাদিক এ বিষয়ে বলেছিলেন, 'ভুট্টো কোনকিছু না দিয়েই তার বিনিময়ে কিছু চাইছিলেন।'

১৯৭৩ সালে ভোগ্য পণ্যের চাহিদা পূরণের লক্ষে সরকার ওয়েজ আর্নার্স স্কীম চালু করেছিল। এই স্কীমের আওতায় যে সমস্ত বাংলাদেশী নাগরিক বিদেশে অর্থ উপার্জন করছিলেন তারা দেশে কিছু তালিকাভুক্ত পণ্য বিদেশ থেকে পাঠানোর সুযোগ পেতেন, কিন্তু এ স্কীমের সুযোগ নিয়ে প্রসাধনী এবং দামী সিগারেটের মতো বিলাস সামগ্রীই দেশে ঢুকছিল। এগুলো কারা পাঠাচ্ছিলেন এ নিয়ে কোন খোঁজ খবর করা হয়নি। এটি আসলে সবাই জানতো যে কিছু সংখ্যক আমদানীকারক এই স্কীমের সুযোগ নিয়ে পণ্যগুলো দেশে ঢুকাচ্ছিলেন এবং ডলার ও পাউন্ড বিদেশে পাচার করছিলেন। অর্থনীতির উপর এই স্কিমের কারণে কি ধরণের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তা নিয়ে কাউকেই ভাবিত মনে হয়নি।

সাংবাদিকরা বলসার নাখরিতেন পত্রিকার খবর ফলাও করে প্রচার করলেও এ বিষয়ে ড. উমব্রিক্টের দায়িত্বশীল প্রতিবাদটি নিয়ে কথা বলেন নি।

৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করেছিল। চীন নিরাপত্তা পরিষদের সভায় ভেটো না দিলে দুই বছর আগেই বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পেত।

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪ মুজিব জাতিসংঘে ভাষণ দেন। তার বক্তব্যের মূল কথা ছিল 'একটি ন্যায়সঙ্গত আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার' জরুরি প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন, 'বিরাট সব অর্থনৈতিক ধাক্কাগুলো সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়ার পরে সবারই এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিষয়ে একমত হওয়া প্রয়োজন।'

এ বিষয়টিই সম্ভবত তার মনে সবার আগে এসেছিল। বাংলাদেশ একটি মারাত্মক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছিল। একদিকে বাংলাদেশের আমদানী ব্যয় বেড়ে চলেছিল, অন্যদিকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানী করেও যথেষ্ট দাম পাওয়া যাচ্ছিল না।

মুজিব সব উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের কথাই যেন বলছিলেন, কারণ সবকটি উন্নয়নশীল দেশই ১৯৭৪ সালে তাদের আমদানী ব্যয় নির্বাহ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল।

যুক্তরাষ্ট্র থাকা অবস্থায় মুজিব রাষ্ট্রপতি ফোর্ডের সাথে একটি বৈঠক করেছিলেন, কিন্তু সেটি সংক্ষিপ্ত ও অফলপ্রসূ ছিল। তিনি ফেরার পথে ইরাক সফর করেছিলেন। মুজিব ইরাক সফর নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন।

ঢাকায় ফিরে ৭ অক্টোবর ১৯৭৪-এ মুজিব বলেছিলেন, 'এই অর্থনৈতিক সংকট স্বল্পস্থায়ী, বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্যই জন্মেছে।'

এর ছয় দিন পর ৩৭ দিন ব্যাপী বিদেশ সফর শেষ করে ঢাকায় এসে তাজউদ্দিনের মনে হয়েছিল এই সংকট অত্যন্ত ভয়াবহ। ১৩ অক্টোবর ১৯৭৪-এ তাজউদ্দীন বলেছিলেন, 'বর্তমান অবস্থা চলমান থাকতে পারে না। আমরা আর বালিতে নিজেদের মাথা লুকিয়ে রাখতে পারি না।' তিনি খাদ্যকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখতে চেয়েছিলেন। তার প্রস্তাবনা ছিল একটি সর্বদলীয় খাদ্য কমিটি গঠন করা। যে সমস্ত রাজনৈতিক নেতা বন্দী ছিলেন তাদের মুক্ত করে দেয়া এবং এমন কি আত্মগোপন করে থাকা নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা করার আহবান জানানোর পক্ষে ছিল তাজউদ্দীনের মত।

বিদেশ সফর শেষে ঢাকায় ফিরেই তাজউদ্দীন এমন প্রস্তাবনা রাখায় অনেকেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তার ৩৭ দিনের সফর কালে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরিয়া সফর করেছিলেন, ওটাওয়াতে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন, ওয়াশিংটনে আইএমএফ-এর সাথে বৈঠক করেছিলেন এবং টোকিওতে জাপানী নেতাদের সাথেও বৈঠক করেছিলেন।

শেখ ফজলুল হক মণি আওয়ামী লীগ ও এর সকল অঙ্গ সংগঠনের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। অক্টোবরে তিনি আওয়ামী যুব লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগের জন্য যে পদত্যাগপত্র দিয়েছিলেন সেটি ফিরিয়ে নিতে রাজি করানো হয়। দেশব্যাপী একটি ঝটিকা সফরের সময় তিনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশ 'সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর সাথে হাত মিলিয়ে' কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিক্রি করে দিতে চাইছেন বলে অভিযোগ আনেন। যে সব ব্যক্তি ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মত পরীক্ষিত মিত্রদের সাথে বাংলাদেশের দূরত্ব তৈরি করতে চাইছেন তাদের তীব্র নিন্দা করেন।

হেনরি কিসিঞ্জার ৩০ অক্টোবরে ঢাকা সফর করেন, তিনি বাংলাদেশ খাদ্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যত ধরণের সংকটের মুখে ছিল সেগুলো মোকাবেলায় সব ধরণের সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তিনি জানান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অতিরিক্ত ১ লাখ টন গম সরবরাহ করবে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের প্রধান যখন ধারণা করেছিলেন পশ্চিমা বিশ্ব বাংলাদেশের মানুষকে না খেয়ে মরতে দিবে না তখন তিনি মানুষের দয়াবোধের উপর অনেক বেশি আস্থা রেখে ফেলেছিলেন। যত যাই হোক- যাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা কম তাদের পেছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়ার এই সংস্কৃতি তো নতুন ছিল না। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই অনেক পশ্চিমা লেখক দাবি করে আসছিলেন দরিদ্র দেশগুলোর মানুষকে না খেয়ে মরতে দেয়া উচিৎ। তাদের যুক্তি ছিল এসব দেশ বিশ্বের উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করছিল; এদেরকে চেষ্টা করা মানে অনিবার্যকে বিলম্বিত করার শামিল এবং এতে এসব বেদনাকে দীর্ঘায়িত করা হচ্ছে।

অধ্যাপক গ্যারেট হার্ডিনের মতে, মার্কিনিরা দরিদ্র দেশগুলোতে খাবার না পাঠিয়ে আসলে সেসব দেশের মানুষের এক ধরণের উপকারই করবে।

রেভারেন্ড নিহাউস বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে সর্বোত্তমদের বেছে নিয়ে বাকিদের বাদ দেয়ার যুক্তিই গ্রহণীয়... আমেরিকার নেতৃত্বে ধনীদের দলে যোগ দান করে আমাদেরকে জগতের কদর্যদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে, তাদের হয় আমাদের শর্ত মেনে টিকতে হবে নতুবা তাদের কদর্যতা নিয়ে মরতে হবে।'

১৯৭৪ সালে খাদ্য পরিস্থিতির বিবেচনা করে সিআইএর রাজনৈতিক গবেষণা কার্যালয় এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, 'বিশ্বের রপ্তানীযোগ্য খাদ্য মজুদের সিংহভাগের মালিক হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঠিক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ের মতোই সমগ্র বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার হতে পারে।'

খাদ্য মানেই ক্ষমতা– জীবন ও মৃত্যু নির্ধারণের ক্ষমতা, এই ক্ষমতা ছিল [illegible] যত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উপর, 'একদম হতদরিদ্র দেশগুলো থেকে তেল রপ্তানীকারক দেশগুলো পর্যন্ত যারা সবাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে খাদ্য আমদানী করতো।'

জানুয়ারি ১৯৭৬-এ এমা রচশিল্ড তার 'ফুড পলিসিজ' শিরোনামের প্রবন্ধে বলেন 'খাদ্যকে ক্ষমতা হিসেবে দেখার মতবাদটি অনেকগুলো কারণেই ভ্রান্ত।' তিনি সিআইএ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল তার সাথে একমত ছিলেন না, এবং সতর্কতার সাথে লক্ষ করেন যে যারা 'বর্তমানে ক্ষুধায় কষ্ট পাচ্ছে এমন লোকদের ভবিষ্যত ক্ষুধার কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের বর্তমান ক্ষুধাকাতর অবস্থাকে উপেক্ষা করার' পরামর্শ যারা দিয়েছিলেন মার্কিন প্রশাসন তাদের সেই পরামর্শ গ্রহণ করেনি।

তিনি বলেছিলেন, 'এই মতবাদ উপেক্ষার মাধ্যমে হত্যাকে জায়েজ করতে চায়- সমসাময়িক বাস্তব উদাহরণের ভিত্তিতে এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে নৈতিক বিচারের যুক্তিতে: একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যত কৃষি ও পুষ্টি সংক্রান্ত ভবিষ্যত পরিস্থিতির প্রক্ষেপনের মাধ্যমে (যেমন: বাংলাদেশের মানুষ ১৯৯০ সালে ক্ষুধায় থাকবে); দ্বিতীয়ত, ভবিষ্যতের নৈতিকতাবোধেরও প্রক্ষেপনের মাধ্যমে, যেমন: ১৯৯০ সালে মার্কিনিরা বাংলাদেশের মানুষকে ক্ষুধার হাত থেকে রক্ষা করার ইচ্ছা পোষণ করবে না, অন্তত নিজেদের দেশে খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির বিনিময়ে নয়।'

উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশের কথাই তার প্রথমে মনে এসেছিল, এবং ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল সেটিকে তিনি 'বাজার অর্থনীতিতে অবিমৃষ্যকারিতার মাধ্যমে খাদ্য নীতি প্রণয়নের ফলে সৃষ্ট নৈরাজ্যের ফলাফল' হিসেবে প্রদর্শন করেছিলেন।

বাণিজ্যিক বাজার থেকেই ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কিনেছিল। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের শুরুর দিকে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে তখনকার বাজার মূল্যে খাদ্যশস্য কেনার চুক্তি করেছিল। ১৯৭৪-এর গ্রীষ্মে চুক্তি অনুসারে খাদ্য শস্য কেনার জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হয়। ফলে মার্কিন শস্য কোম্পানীর কাছ থেকে হেমন্তে আসার কথা এমন দুটি খাদ্যশস্যের চালান বাতিল হয়েছিল। এমা রচফিল্ড বলেছিলেন, 'ইতিমধ্যে পিএল-৪৮০ কর্মসূচির আওতায় সাহায্য হিসেবে খাদ্য আসার বিষয়ে যে চুক্তি ছিল সে অনুসারে খাদ্য আসাও বিলম্বিত হয়েছিল, এর প্রধান কারণ ছিল তখন কর্মকর্তারা গোপনে আলোচনা করছিলেন সে বছরেরই শুরুর দিকে কিউবার কাছে পাট বিক্রি করার কারণে সাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা হরিয়েছে কি না সে বিষয়টি নিয়ে। ১৯৭৪-এর ডিসেম্বর নাগাদ বাংলাদেশে মার্কিন খাদ্য পৌঁছানোর আগেই হেমন্তের দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গিয়েছিল।'

এবং হাজারো মানুষের মৃত্যু হয়েছিল।

কিছু পশ্চিমা সাংবাদিক শেখ মুজিব হত্যার আগে বলতেন পরাশক্তিগুলোকে আকৃষ্ট করার মত প্রাকৃতিক সম্পদ বাংলাদেশের ছিল না এবং বাংলাদেশের যদি কোন কৌশলগত গুরুত্ব থেকে থাকে তা কেবল ভারতের কারণে।

ফাইনান্সিয়াল টাইমস-এর এশিয়া প্রতিনিধি ১৯৭৪-এর ৩০ অক্টোবর বলেছিলেন, 'মার্কিনিরা পরিস্কারভাবে বাংলাদেশে রাজনৈতিকভাবে জড়ানোর বিষয়ে তাদের অনিচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে। বাঙালিরা যেমনটি মনে করে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৌশলগত দিক থেকে ততোটা গুরুত্বপূর্ণ নয়।'

বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি পুরোপুরি হতাশার চিত্র ফুটিয়ে তুলে ওয়ালস্ট্রিট জার্নালের একজন সংবাদ প্রতিনিধি ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে লিখেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রধান সমস্যাগুলোর একটি হলো বিশ্ব পরাশক্তির কোনটির কাছে বাংলাদেশের আলাদা কোন গুরুত্ব নেই। এর অবস্থান ছিল ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে, যার ফলে ভারত ছাড়া আর কারও কাছে দেশটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। দেশটিতে এমন কোন খনিজ সম্পদ ছিল না যা কারও প্রয়োজন ছিল। কাউকেই এখানে একটি ভিত্তি গড়ে তোলার ব্যাপারে খুব বেশি আগ্রহী মনে হচ্ছে না।'

১৯৭১ সালেই মার্কিন কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে ঘাঁটি গড়ার সুবিধা দেয়ার বিষয়ে আলোচনা করেছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরে কিছু পশ্চিমা সাংবাদিক দাবি করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়ন চট্টগ্রামে নৌ ঘাঁটি তৈরি করতে চায়।

তেহরানের কায়হান ইন্টারন্যাশনালে ১১ এপ্রিল ১৯৭৪ ঢাকায় কর্মরত একজন জাপানী কূটনীতিকের বরাত দিয়ে ছাপা হয়েছিল 'বাংলাদেশের জন্য একটি তেল সমৃদ্ধ সময় অপেক্ষা করছিল, যা হয়তো কুয়েতের শেখদের তেল সমৃদ্ধ সময়ের চেয়েও ব্যাপকতর হতে পারে।'

কায়হানে ছাপা হয়েছিল, 'বঙ্গোপসাগরের তলদেশে তেলের মজুদ পারস্য উপসাগরের তেলের মজুদের চেয়ে বৃহত্তর হতে পারে। এখানে যে বিপুল পরিমাণ তেল পাওয়া যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে তা দিয়ে বৃহৎ শিল্প পরাশক্তি জাপানের তেলের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।' আরও বলা হয়েছিল, 'কিন্তু ওয়াশিংটন ও টোকিওর মধ্যে গোপন চুক্তি না হলে ঢাকা ও টোকিওর মধ্যে কোন ঐক্যমতা আশা করা যায় না।'

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথাই চূড়ান্ত।

বঙ্গোপসাগরের ২৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় তেল অনুসন্ধান করার লক্ষ্যে ছয়টি বিদেশী কোম্পানী বাংলাদেশের সাথে চুক্তি করেছিল ১৯৭৪ সালে। তারা কোন তেলের সন্ধান পায়নি। কিন্তু আন্তর্জাতিক অঙ্গনে চাহিদা তৈরি হলে সেখানে তেল পাওয়া যেতেও পারে।

বাংলাদেশে ৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাসের প্রমাণিত গ্যাসের মজুদ আছে। এটি কোন বিশাল পরিমাণ নয় হয়তো। কিন্তু শতকরা ৯৪ ভাগেরও বেশি হাইড্রোকার্বন উপাদান সমৃদ্ধ গ্যাস অতি উন্নত মানের।

বাংলাদেশকে সম্ভাবনাহীন মনে করতেন না এমন হাতে গোণা কয়েকজন পশ্চিমা সাংবাদিকের একজন ছিলেন গার্ডিয়ান পত্রিকার ওয়াল্টার শোয়ার্জ। ১৯৭৪ সালের নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন. 'তবে কি বাংলাদেশের বিষয়ে সকল আশা বাদ দিয়ে তাকে বৈদেশিক সহায়তার তলা বিহীন ঝুড়ি হিসেবে বিবেচনা করতে হবে? দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সমস্যাগুলোর কথা ভালো করেই জানেন। তিনি সমাধানের জন্য ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং আরও পদক্ষেপ নিচ্ছেন। অবশেষে বাংলাদেশ রেড ক্রস গ্রহণযোগ্য মাত্রায় ভালো কাজ করছে, আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে রেডক্রসের প্রধানকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মুজিব আরও কর্তৃত্বপরায়ণ সরকার গঠনের কথা ভাবছেন বলে মনে হচ্ছে। এটা হয়তো গণতন্ত্রের জন্য দুঃসংবাদ- কিন্তু স্থানীয় রাজনীতিক ও এমপিদের ক্ষমতার উপর এর ফলে নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হতে যাচেছ যেগুলো অনেক সময়ই দুর্নীতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল।'

মুজিব সমস্যা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা রাখতেন এবং অবশেষে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ নিতে শুরু করেছিলেন।

১৯৭৪ সালের দ্বিতীয়ার্ধে অনেকেই ধারণা করছিলেন বাংলাদেশ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দিকে যাচ্ছে। এজন্য মার্কিন, ফরাসী ও তানজানিয়ান সংবিধান খতিয়ে দেখা হচ্ছিল। ঢাকা সফররত একজন বিদেশী সংবাদকর্মী জানান যে তিনি দিল্লী থাকা অবস্থায় তানজানিয়ান সংবিধানের একটি কপি সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন। বাংলাদেশ টাইমস নামে মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মণি'র মালিকানাধীন একটি পত্রিকা সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পক্ষে কথা বলতে শুরু করে। অক্টোবরের শেষ সপ্তাহ নাগাদ মনে হচ্ছিল সংবিধান সংশোধনের বা কারো কারো মতে 'দ্বিতীয় দফা বিপ্লবের' জন্য মঞ্চ প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক নভেম্বরে যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় তখন আত্মবিশ্বাসের সাথে সংবিধানে আসন্ন পরিবর্তনের কথা ছাপে এবং এমন কি এটাও ছাপে যে নতুন রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রীসভায় এম. মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। মুজিব নিজেই রাষ্ট্রপতি হতে যাচ্ছিলেন। উপরাষ্ট্রপতির পদ নিয়ে কোন দ্বিধা ছিল না- সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছিলেন।

১৭ নভেম্বরে বাংলাদেশের কম্যুনিস্ট পার্টি (সিপিবি) সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন এবং পুরো প্রশাসনিক ব্যবস্থা আমূল সংস্কার দাবি করেছিল। সিপিবি'র সভাপতি

মণি সিংহ মত প্রকাশ করেন বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে এবং তিনি আরেকটি বিপ্লবের দাবি জানান।

নভেম্বরে গণভবনে সংবিধানে প্রস্তাবিত পরিবর্তনসমূহ নিয়ে আলোচনার জন্য আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল তিন দিন ব্যাপী আলোচনা শুরু করে । দলের দশ জন সদস্য এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছিলেন এবং আলোচনার দ্বিতীয় দিনে ওবায়দুর রহমান নামে একজন প্রতিমন্ত্রীর বাড়িতে বৈঠক করেন। তারা ১৯ দফা দাবী প্রস্তুত করেন এবং নূর-এ আলম সিদ্দিকীকে তাদের মুখপাত্র নির্বাচন করেন।

মুজিব বলেছিলেন যদি তিনি যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন দলের ভিতরে তা নিয়ে কোন বিরোধ থাকলে তিনি নতুন নির্বাচন আহবান করবেন। তিনি নিশ্চিত ছিলেন জনগণ তার প্রস্তাবেই সমর্থন দিবে। দ্বিমত প্রকাশকারী দশজন সদস্য তখন চুপ করে যান। মুজিব বিহীন তাদের নির্বাচনের ফলাফল কখনোই খুব ভালো হতো না।

আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকের পর পাঁচদিন ব্যাপী সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যাশিত সাংবিধানিক পরিবর্তন হয়নি একজন কলামিস্ট ১৯৭৪ সালের ১ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক কাউন্টার পয়েন্ট এ লিখেছিলেন, 'এখনো এমন কিছু সরল সোজা ব্যক্তি আছেন যারা বিশ্বাস করেন আগামী জানুয়ারিতে যখন সংসদ অধিবেশন শুরু হবে তখন প্রত্যাশিত পরিবর্তন আসবে।' তিনি জানান যে এমন কোন নিশ্চয়তাই নেই যে জানুয়ারিতে আবার সংসদ অধিবেশন বসতে পারে। এর আগে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। এই কলামিস্টের কথা হাস্যকরভাবে ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

দুর্ভিক্ষের সময় ঘোড়াশাল সার কারখানার কন্ট্রোল রুমে বিস্ফোরণের পাশাপাশি আরও অনেক অগ্নি সংযোগ ও অন্যান্য অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল। ট্রেন, লঞ্চ ও বাসে হামলা করা হয়েছিল, রেল লাইন উপড়ে ফেলা হয়েছিল, যার ফলে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। শত শত আওয়ামী লীগারকে হত্যা করা হয়েছিল। এসব হত্যাকাণ্ডের মধ্যে কিছু নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত বিরোধের কারণে ঘটেছিল, কিন্তু এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের একটি ধারা লক্ষ করা যাচ্ছিল এবং এগুলোকে শুধু যুদ্ধ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে উপো করা আর সম্ভব ছিল না।

২৫ ডিসেম্বর ১৯৭৪ গোলাম কিবরিয়া নামে একজন এমপি এবং একজন ইউপি চেয়ারম্যানকে দুটি ঈদের জামাতে নামায আদায়রত অবস্থায় গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

ঈদের নামায আদায়রত থাকা অবস্থায় কাউকে হত্যা করার কথা এর আগে শোনা যায়নি। মুজিব ভয়ঙ্কর রেপে গিয়েছিলেন,তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে এর শেষ দেখতে হবে।'

২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪ সালে মুজিব সারাদেশে জরুরী অবস্থা জারি করেন।

জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রেসনোটে বলা হয়েছিল, 'একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেছিল এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথে বাধা সৃষ্টি করতে তাদের সর্বোচ্চ চেষ্ট করেছিলেন তারা শুরু থেকেই নানাবিধ অন্তর্ঘাতমূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং সাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যেতে পারেন নি এমন অনেকে এই গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছেন।'

মুজিব সমগ্র জাতিকে পুনঃএকত্রীকরণের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু পাকিস্তানীদের যারা সহযোগিতা করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই কোন অবস্থাতেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে প্রস্তুত ছিলেন না।

পাক বাহিনী যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তা নিয়ে ঢাকা থেকে প্রকাশিত পূর্বদেশ নামের একটি দৈনিকে যে ধারাবাহিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল তার শিরোনাম ছিল 'কেউ ভুলে যাবে, কেউ ভুলবেনা।'

পাকিস্তানীদের চালানো ধ্বংসযজ্ঞ ভুলে যাওয়াটাও ছিল একটি অপরাধ।

২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে একটি জনসভায় মুজিব বলেছিলেন তিনি চেষ্টা করেও একটি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন নি। 'আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মুখোমুখি করবো। আমি সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছি। আমি তাদের বিচারের মুখোমুখি করিনি। আমি তাদের ছেড়ে দিয়েছি, কারণ আমি এশিয়ায় এবং বিশ্বে বন্ধু তৈরি করতে চেয়েছি' এ কথা বলে তিনি চুপ হয়ে যান, যেন এ বিষয়টি তার জন্য প্রচণ্ড বেদনাদায়ক ছিল।

মুজিব বার বার নিশ্চিত করেছিলেন, 'যদি শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকেন তাহলে এই বাংলাদেশের মাটিতেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হবে।' তিনি স্বীকার করেছিলেন এটি শুধু বাংলাদেশের মানুষের কাছে তার ঋণ নয় বরং মানবতার কাছেও তাই এবং পৃথিবীর কোন শক্তিই এটি করা থেকে তাকে বিরত করতে পারবে না। ২৫ এপ্রিল ১৯৭২ যখন মুড়িতে পাক-ভারত আলোচনা শুরু হয় তখন মুজিব কুলদীপ নায়ারকে বলেছিলেন বাংলাদেশের সাথে ঐক্যমত্য ছাড়া ভারত যুদ্ধ বন্দীদের বিষয়ে কোন ধরণের সমঝোতায় আসতে পারে না। তিনি এটা কোন ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন না কিভাবে যারা বাংলাদেশে গণহত্যা চালিয়েছে তারা কোন সাজাভোগ না পেয়ে থাকতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা কি জবাব দেব? খুন, ধর্ষণ ও লুটপাটকারীদের আমরা বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় আমাদের ক্ষমা করবে না।'

কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল– অন্তত কিছু সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন ছিল।

জানুয়ারি ১৯৭৩ এ ওয়াশিংটন পোস্টের লুইস এম. সাইমনস প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন মুজিবকে উপদেশ দিয়েছে ৭৩ হাজার সামরিক অথবা ২০ হাজার বেসামরিক ব্যক্তিত্বের যুদ্ধাপরাধের বিচারের মুখোমুখি করা হলে তা ভুট্টোকে তার দেশ পাকিস্তানের হতাশা আক্রান্ত মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে বিপদে ফেলে দিবে এবং এর ফলে উপমহাদেশে শান্তি আলোচনা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।'

বাংলাদেশের উপর যে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করার জন্য আন্তর্জাতিক চাপ রয়েছে তার ইঙ্গিত রয়েছে এমন সংবাদ প্রতিবেদন এটিই প্রথম ছিল না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন ছাড়াও আরও অনেক দেশ এই বিচার না করার পরামর্শ বাংলাদেশকে দিয়েছিল। যেসব মুসলিম দেশ ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো এবং ভয়ঙ্কর সব অপরাধ সংগঠনের সময়ে দুর্বল কণ্ঠেও প্রতিবাদ করেনি, সেই দেশ গুলোই বাংলাদেশে আটক ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর ভাগ্য নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ছিল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পাকিস্তানে আটকে থাকা বাঙালীদের ভাগ্যও এসব যুদ্ধবন্দীদের সাথে জড়িয়ে ছিল। ১৯৭২ সালে ভুট্টো বলেছিলেন কয়েক শত যুদ্ধবন্দীর বিচার বাংলাদেশে হলে সে বিষয়ে তার কোন আপত্তি থাকবে না, যদি অবশিষ্টদের মুক্তি দেয়া হয়- ওয়াশিংটন পোস্টের ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২-এর খবর অনুযায়ী সংখ্যাটি ১০ হাজার। কিন্তু ১৯৭৩ সালেই ভুট্টো তার অবস্থান বদলে ফেলেন, এবং হুমকি দেন প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাকিস্তানও সেখানে আটকে থাকা বাঙালীদের বিচার করবে।

ভারত যুদ্ধবন্দীদের আটকে রেখে উপমহাদেশে একটি সমঝোতায় পৌছানোর চেষ্টা করছে বলে পাকিস্তান অভিযোগ করে। যুদ্ধবন্দীদের বিষয়ে বাংলাদেশের মতামতের গুরুত্ব রয়েছে এটি মানতে পাকিস্তান কখনো প্রস্তুত ছিল না। পাকিস্তানের বক্তব্য ছিল তার সেনাবাহিনী ভারতের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী নজরুল ইসলাম এটি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন যে পাকিস্তানী সেনা বাহিনী যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, এবং বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর উপপ্রধান এয়ার কমডোর খন্দকার আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন। ব্যাখ্যায় তিনি বলেন বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল ওসমানী তখন বিশেষ কাজে সিলেটে ছিলেন।

ভারত বাংলাদেশকে মানবিক ইস্যুগুলোকে রাজনৈতিক ইস্যু থেকে আলাদা করে দেখতে রাজি করাতে পেরেছিল এবং এর ফলে ১৯৭৩-এর এপ্রিলে ভারত-

বাংলাদেশ যৌথ ঘোষণা আসে, যার ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত ১০ মে ১৯৭৪ ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ত্রিপীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

দিল্লীর একজন সাংবাদিক মন্তব্য করেছিলেন, 'যুদ্ধবন্দীরা যে রকম খাবার পেতেন তা পেলে অনেক ভারতীয় নাগরিক ধন্য হয়ে যেতেন।' ভারতে অনেকেই এভাবে পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীদের আটকে রাখা নিয়ে প্রশ্ন তুলছিলেন এবং এর বিরুদ্ধে একটি প্রচারাভিযান শুরু হয়ে গিয়েছিল। দুই একজন সাংবাদিক এমনও লিখেছিলেন আরও আগে এসব যুদ্ধবন্দীদের মুক্তি দিয়ে ভারত পাকিস্তানের বিশ্বস্ততা অর্জন করতে পারতো।

১৯৭৩ সালে দিল্লী সফর করছিলেন এমন একজন ঢাকার সাংবাদিক বলেছিলেন, 'এই যুদ্ধবন্দীরা ভারতের ওপর একটি বোঝা হয়ে গিয়েছিল এবং ভারতীয়রা দ্রুত এদের হাত থেকে রেহাই চাইছিলেন। আমরা যদি এসব যুদ্ধবন্দীদের বিচার করতে চাই তাহলে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব নেয়ার জন্যও আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।'

যখন ভারতের নিজেরই অনেক সমস্যা ছিল, সে অবস্থায় এসব যুদ্ধবন্দীরা সত্যিই ভারতের ওপর বোঝা হয়ে যাচ্ছিল। ১৯৭২ সালের ভয়ঙ্কর খরার কারণে ভারতে ১৫ মিলিয়ন টন খরিপ শস্যের ঘাটতি দেখা দিয়েছিল এবং জ্বালানী সংকটের কারণে উৎপাদনও অনেক কমে এসেছিল। বিশ্ব বাজারে তেলের অভূতপূর্ব মূল্যবৃদ্ধির কারণে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের মতোই ভারতও একটি ভয়াবহ অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলা করছিল।

১৫ হাজার যুদ্ধবন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলেও, বাংলাদেশ পরবর্তীতে সংখ্যাটি কমিয়ে ১৯৫-এ নিয়ে আসে এবং বলা হয় ১৯৭৩-এর মে মাস নাগাদ তাদের বিচারের মুখোমুখি করা হবে। বাংলাদেশের একটি সংবাদ সংস্থার প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে বিচার করা হবে না বলে যে প্রচারণা চালু ছিল তার পেছনে ছিল ভারতে ভুট্টোপন্থী লবি। ঢাকার সংবাদ মাধ্যমের একটি অংশ ১৯৭৩ সালে এমন খবর প্রচার করে যে ভারত যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ রয়েছে এমন যুদ্ধবন্দীদের হস্তান্তর করতে অস্বীকার করছে। এই প্রতিবেদনটিকে কর্তৃপক্ষ প্রত্যাখান করেছিল।

হলিডে নামের একটি চীনপন্থী সাপ্তাহিকে ছাপা হয়, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি একদম শুরু থেকেই ভারতের পরামর্শক্রমে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।' অন্যদিকে কিছু বাঙালী অভিযোগ করতে থাকেন পাকিস্তানি স্বীকৃতি পাওয়াকে ভারত বাধাগ্রস্ত করছে।

বাংলাদেশ যদি সত্যিই বিচার করতে চেয়ে থাকে তবে তাদের তা অনেক আগেই করা উচিৎ ছিল। পাকিস্তানীদের চালানো ধ্বংসযজ্ঞের স্মৃতি যখন মানুষের মনে

তখনো সদ্য অতীত সে সময় খুব অল্প দেশই বাংলাদেশকে এই বিচার না করার পরামর্শ দিত। হয়তো ঐ ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করা হলেও, রায় কার্যকর করা সম্ভব হতো না। অনেক বাঙালীর মতে জেনারেল টিক্কা খান ছিলেন প্রধান আসামী, কিন্তু তিনি ছিলেন পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ক্ষমা করতে হলেও তাদের কৃত ঘৃণ্য অপকর্ম সম্পর্কে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারতো। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো বাংলাদেশের মানুষ জানতে পারতো যা জানার অধিকার তাদের ছিল।

বাংলাদেশের উচিৎ ছিল অন্তত যুদ্ধাপরাধের একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করা।

এমন কি হতে পারে উচ্চ পদে থাকা বাঙালীরা ভয় পাচ্ছিলেন বিচার প্রক্রিয়া অগ্রসর হলে তাদের ভূমিকাও জনগণের সামনে চলে আসতে পারে, আর সে কারণেই তারা বিচার প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করছিলেন? ঢাকার একজন হতাশ হয়ে লক্ষ করছিলেন তার ভাইয়ের হত্যার সাথে জড়িত দুজন পাকবাহিনীর সহায়তাকারীর প্রতি কিছু কর্মকর্তা সমব্যথী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছিল যেন আমিই অপরাধী।'

দ্বিতীয় বিপ্লব

সবচেয়ে সফল বিপ্লবও অসমাপ্ত থেকে যায়, কারণ বাস্তবতা খুব বড় জোর স্বপ্নের কাছাকাছি হয়। বিপ্লবীরা কখনোই তারা যা করবে বলে শুরু করে থাকে তার সব অর্জন করতে সক্ষম হন না।

২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সংবিধানে বহু প্রতিক্ষীত সংশোধন আনা হয়; বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। সংবিধানের এই সংশোধনীতে মুজিবকে পাঁচ বছর মেয়াদের জন্য রাষ্ট্রপতি করা হয়েছিল। সংসদের মেয়াদ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত করা হয়- দুই বছরের বর্ধিত মেয়াদ পায় নির্বাচিত সংসদ।

সংসদে মুজিবের শেষ ভাষণটি ছিল কঠোর। তিনি দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা ও দেশ-বিরোধী অপশক্তিগুলোর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জন্য উর্বর ভূমি হয়ে উঠেছে। এদেশে টাকা ভেসে আসছে এবং মানুষকে সে টাকার প্রস্তাব দেয়া হচ্ছে।' একটি বিশেষ দলের সদস্যরা এদেশে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার প্রতিবাদ করেননি এবং এখনও বাংলাদেশকে অন্য নামে ডেকে থাকেন। যারা বাংলাদেশে কখনো বিশ্বাস করেননি, এদেশে থাকার কোন অধিকার তাদের নেই। মুজিব বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজগুলোকে বেড়ে উঠতে দেয়া হবে না।' তিনি দুর্নীতিকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। তাই বলেছিলেন, 'আমরা পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ।' প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতরাই দুর্নীতির সাথে জড়িয়ে ছিলেন, তারা খুব বেশি হলে মোট জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগ ছিলেন; কিন্তু তারাই ছিলেন নষ্টের গোড়া। জনগণ সৎ ছিল। এর চেয়ে চমৎকার জনতা পৃথিবীর আর কোথাও ছিল না।

১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি মুজিব ঢাকায় ফেরার দুই দিন পরই তার রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সে সময় লন্ডনের টাইমস পত্রিকা পরামর্শ দিয়েছিল বাংলাদেশে 'নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নির্বাচিত যথেষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাষ্ট্রপতির শাসন দরকার, যাকে সংসদ চাইলেই বরখাস্ত করতে পারবে না।' আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের উগ্রপন্থী অংশটি মুজিবের নেতৃত্বে সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল থেকে প্রতিনিধি নিয়ে একটি বিপ্লবী কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশ পরিচালনার দাবি করেছিল। মুজিব এসব দাবির প্রতি কর্ণপাত করেন নি।

কিন্তু তাহলে তিন বছর পর কেন মুজিব রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের দিকে গেলেন?

এর উত্তর পাওয়া যাবে ১৯৭৪ সালের শেষভাগে বাংলাদেশ যে দুর্যোগে পতিত হয়েছিল সেটির দিকে দেখলে।

উন্নয়নশীল দেশগুলোর, 'বিশ্ব বাজারে নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ হওয়া এবং কালেভদ্রে নিজেদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার' সম্ভাবনা থাকে খুবই ক্ষীণ। এই ক্ষীণ সম্ভাবনার কারণেই, জন ডান বলেন, 'বিপ্লব পরবর্তী কর্তৃপক্ষগুলোর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এবং ততোধিক দৃঢ় মনোবলের দরকার হয়ে পড়ে।'

অনেকেই মুজিবের মধ্যে স্বৈরশাসকসুলভ প্রবণতা দেখেছিলেন। কিন্তু চাইলেও মুজিব একজন স্বৈরশাসক হতে পারতেন না; স্বৈরশাসক হতে হলে যতোটা নৃশংস হওয়া প্রয়োজন তা তার মধ্যে ছিল না। তিনি তার দেশের মানুষের ভালোবাসা পেতে আকুল হয়ে থাকতেন এবং এজন্য তাকে তাদের সাথে মিশে যেতে হতো। তিনি একটি জাতীয় ঐক্য চাইতেন, এবং মাঝে মাঝে এটি অর্জনের জন্য অতিরিক্ত উদ্যোগ নিয়ে ফেলতেন। প্রায়ই যখন কঠোর হওয়া দরকার সে সময় তিনি নরম হয়ে যেতেন; এবং তার জাতিকে পুনঃএকত্রীকরণের নীতিকে স্বাধীনতা-বিরোধী চক্র তার দুর্বলতা হিসেবে বিবেচনা করেছিল।

যতোটুকু ক্ষমতা তিনি চাইতে পারতেন তার সবই মুজিবের ছিল। তার কথাই দেশের জন্য এক রকম আইন হিসেবে বিবেচিত ছিল। কিন্তু দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং এটি ঠেকাতে তাকে কিছু করতেই হতো। দেশের একটি পরিবর্তন দরকার ছিল। 'প্রথম বিপ্লব' তার ভরবেগ হারিয়ে ফেলেছিল। তিনি একটি 'দ্বিতীয় বিপ্লব' সূচিত করতে চাইছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন জনতা তার নতুন আন্দোলনে সাড়া দিবে। 'এখন নতুন জীবন আর নতুন অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে হবে। জনগণকে সজাগ করতে হবে।' ১৯৭৫ এর ২৫ জানুয়ারি এ কথাই মুজিব বলেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ সময়ের মধ্যে একটি কক্ষে দুই বা তিনজন লোককে সাথে নিয়েই তিনি একটি গণআন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। তখন স্বেচ্ছাসেবকরা তার সাথে কাজ করছিলেন এবং একটিও ডাকাতির ঘটনা ঘটেনি সে সময়ে। তাই তার প্রশ্ন ছিল 'তাহলে এখন আমরা কেন আবার সেটা করতে পারবো না?'

তখন সবার একটি সাধারণ শত্রু ছিল- পাকিস্তানি সামরিক জান্তা; কিন্তু ১৯৭৫ এ সহজে চিহ্নিত করা যায় এমন কোন শত্রু ছিল না। ১৯৭১ সালের চেতনাকে আবার জাগিয়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ ছিল।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাবলে ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫ বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হয়েছিল। মুজিব বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটি ও ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির নাম ঘোষণা করেছিলেন।

বাকশালের প্রধান সংগঠন নির্বাহী কমিটিতে ছিলেন সভাপতি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান নিজে, তার সাথে ছিলেন উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রীরা এবং শেখ ফজলুল হক মণি।

এই পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানরা, ছিলেন আধাসামরিক বাহিনী বাংলাদেশ রাইফেলস ও পুলিশ বাহিনীর প্রধানদ্বয়ও।

পার্টির পাঁচটি ফ্রন্ট ছিল– কৃষক, শ্রমিক, নারী, যুব ও ছাত্র।

আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকাকেই বাকশালের প্রতীক হিসেবে বেছে নেয়া হয়েছিল । এর পতাকার দুই-তৃতীয়াংশ সবুজ ও একতৃতীয়াংশ লাল ছিল, এবং সবুজ অংশের উপর ছিল চারটি তারকা।

তখন দেশে একমাত্র দল ছিল বাকশাল। অন্যান্য পার্টির কার্যক্রম বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। বাকশালের সদস্য নন এমন ব্যক্তিদের আর সংসদ সদস্য থাকার কোন সুযোগ ছিল না। অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানী এবং মইনুল হোসেন তাদের সংসদ সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন।

একদলীয় ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটি ছিল মসৃণ। অন্তত বাইরে থেকে তেমন কোন বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়নি।

কেউ কেউ বলে থাকেন মুজিব ১৯৭৪ সালে চিকিৎসার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরকালে একদলীয় শাসনব্যবস্থার কথা তার ভাবনায় আসে। আবার অন্য অনেকে বলে থাকেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে খুশি হতে না পেরেই তিনি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন। কিন্তু এগুলো সবই কেবল ধারণাই ছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত শামসুর রহমান মুজিবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কোথা থেকে আপনার মাথায় একদলীয় শাসন ব্যবস্থার কথা এলো?' জবাবে মুজিব বলেছিলেন, 'কোন রাশিয়ান কি এর বিপক্ষে?' শামসুর রহমান তখন বলেছিলেন, 'সেটা আমি জানি না?'

সমাজবাদের আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে রাজনৈতিক ক্যাডারদের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সেটির উপর প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৭৩-৭৮ এ বিশেষ জোর দেয়া হয়েছিল। সরকারী দপ্তরের লোকদের পক্ষে 'নতুন কিছু করার মতো লোক হওয়া বা সমাজে পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে প্রভাবক কোনটিই হওয়া সম্ভব নয়'। পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছিল, 'জনগণের সাথে গভীর যোগাযোগ রয়েছে এবং নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং জনগণের পাশে থাকতে ও তাদের সাথে নিয়ে কাজ করতে আগ্রহী এমন রাজনৈতিক ক্যাডারদের জনগণকে সক্রিয় করে তুলে তাদের ধ্যান ধারণায় পরিবর্তন আনা সম্ভব।' রাজনৈতিক ক্যাডারদের 'সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তনের অপরিহার্য উপাদান' হিসেবে চিহ্নিত করে পরিকল্পনাটিতে 'উন্নয়নের উদ্যোগের প্রথম ধাপেই রাজনৈতিক ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের জন্য' কর্মসূচি গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনাটিতে সমাজবাদ এবং ক্যাডারদের উপর যে জোর দেয়া হয়েছিল তা দেখে অনেক বিদেশী সংবাদকর্মী ধারণা

করেছিলেন যে পরিকল্পনা কমিশন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার পক্ষে। কিন্তু, পরিকল্পনাটিতে বলা হয়েছিল, 'বাংলাদেশের সংবিধানে আগে থেকেই একদলীয় শাসন ব্যবস্থাকে বাতিল করে দেয়া হয়েছে। একটি বহুদলীয় রাষ্ট্রে প্রশাসনের কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকে এটি নিজেকে শাসক দল থেকে আলাদা করে রাখবে যাতে পার্টি ক্যাডাররা সমস্ত কার্যক্রমের তদারকি প্রক্রিয়াতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঢুকে পড়তে না পারে।'

মুজিব একদলীয় ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছিলেন অন্তত ১৯৭৩ সালের শুরুর সময় থেকে। আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিশাল বিজয় লাভ করার পর ১৭ মার্চ ১৯৭৩ লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় ওয়াল্টার শোয়ার্জ লিখেছিলেন, 'হয়তো মুজিব মনে করছেন বাংলাদেশের জন্য একটি এক দলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থা দরকার। নির্বাচনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে মুজিবের একজন জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা তাকে এমন উপদেশই একটি বস্তুনিষ্ঠ গবেষণা পত্রে দিয়েছিলেন।'

ওটাওয়াতে কমনওয়েলথ রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলনে ২ আগস্ট ১৯৭৩ মুজিব বলেছিলেন: সাড়ে সাত কোটির বিশাল জনসংখ্যা নিয়ে দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অশিক্ষা, রোগ-ব্যাধি এবং বেকারত্ব মোকাবেলা করতে আমাদের যে সব প্রতিবন্ধক অতিক্রম করতে হবে সেগুলো বিশাল তা আমরা জানি। একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে থেকে মোকাবেলা করতে হলে এই চ্যালেঞ্জ আরো কঠিনতর হবে, কারণ সেক্ষেত্রে মানুষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিঘ্নিত না করে তাদের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করতে হবে, এবং সামাজিক ন্যায়বিচারকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে হবে।'

১৯৭৪ সালের শেষ নাগাদ এসব সংকট প্রায় অসহনীয় পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছিল।

সিপিবি নেতারা বাকশাল নিয়ে এতটাই খুশি ছিলেন যে তাদের মনে হচ্ছিল এই একদলীয় ব্যবস্থার ধারণাটি যেন তাদেরই। কিন্তু তারা ছিলেন কেবল মুজিবের আদর্শিক সহযোগী মাত্র। সিপিবি বা ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে এমন কি একজনকেও বাকশালের নির্বাহী কমিটিতে রাখা হয়নি এবং ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতেও এই দুটি দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল খুব সামান্যই। সত্য হল, বাকশালে সকল গুরুত্বপূর্ণ পদেই আওয়ামী লীগাররা ছিলেন। কিন্তু যেহেতু আওয়ামী লীগ কোন ক্যাডার নির্ভর দল ছিল না, আশা করা হয়েছিল সিপিবি ও ন্যাপ (মোজাফফর) বহুমুখী সমবায় সমিতিগুলোর জন্য ক্যাডার সরবরাহ করবে। ক্যাডার সরবরাহের জন্য বাকশালকে সিপিবি'র উপর নির্ভর করতে হবে বলেই সম্ভবত সিপিবি আশা করেছিল সকল গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে আওয়ামী লীগাররা থাকা সত্তেও বাকশালের শ্রেণী চরিত্র আওয়ামী লীগের চেয়ে আলাদা হবে। কিন্তু দুটি দলেরই তরুণ সদস্যরা বাকশালে যথেষ্ট পদ না পাওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন।

নতুন দলের নামকরণ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল অন্যান্য দলগুলো এখানে আওয়ামী লীগের সহযোগীর ভূমিকাটুকুই পালন করবে শুধু। ফজলুল হক যখন ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে লড়াই করার জন্য দল গঠন করেছিলেন তখন সেটির নাম ছিল কৃষক শ্রমিক পার্টি। মুজিব সেই 'কৃষক শ্রমিক' নিয়ে তা আওয়ামী লীগের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। এবং ফলে দাড়িয়েছিল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগ একটি বহু মতবিশিষ্ট রাজনৈতিক দল ছিল, যেটিকে মুজিব ধরে রেখেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানি বাহিনীকে সহায়তাকারী অনেক ব্যক্তি আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগের মনোনয়নে এমপি হয়েছিলেন। বাকশালের সদস্যপদ সবার জন্য খোলা ছিল। সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে আসা এবং পারস্পরিক বিপরীতমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকদের কারণে একটি প্রচণ্ড গোলমেলে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। দলে কাদের ভূমিকা প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তার উপর অনেক কিছুই নির্ভর করছিল।

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তার প্রথম সংবাদ সম্মেলনে ১৪ জানুয়ারি ১৯৭২ মুজিব বলেছিলেন, একটি 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি'র পরিকল্পনা করার জন্য 'কৃষি, শিল্প এবং আর্থিক খাতে প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন প্রয়োজন হবে'। এই সংবাদ সম্মেলনেই মুজিব প্রথম সমবায় সমিতির কথা উল্লেখ করেছিলেন।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জোর দিয়ে বলা হয়েছিল, 'কৃষিকাজের সামাজিকীকরণ ছাড়া যে অর্থনীতির ৮০ ভাগেরও বেশি কর্মকাণ্ড কৃষি নির্ভর সেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যায় না।' এতে বলা হয় যে সমাজকে মৌলিক পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, বিশেষত 'জমির মালিকানা' সংক্রান্ত বিষয়ে। এই পরিকল্পনায় সর্বোচ্চ জমির মালিকানার সীমা কমিয়ে আনার কথা বলা হয়েছিল।

বাংলাদেশে হয়তো জমির বণ্টন অন্যান্য এশীয় দেশগুলোর মতো অসম ছিল না। কিন্তু যে দেশে শতকরা ৫২ ভাগ ভূমি মালিকানার আকার ২.৫ একরের নিচে এবং মাত্র শতকরা তিন ভাগ ভূমি মালিকানা ১২.৫ একরের উপরে সেখানে ৩৩.৩৩ একর ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে উচ্চ বলতে হবে। উদার কৃষি ভর্তুকির সুফল পাচ্ছিলেন কেবল উদ্বৃত্ত কৃষিজীবীরা। এসব ভর্তুকি তুলে নেয়ার সুযোগ ছিল এবং শাসক দলের ভেতর থেকেই সম্পন্ন কৃষকদের কৃষি আয়ের উপর করারোপের বিরোধিতা ছিল। ব্যাপক খাদ্য ঘাটতি বিদ্যমান থাকা অবস্থায় সরকার এমন কোন পদক্ষেপ নিতে চাচ্ছিল না যার ফলে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু স্বাধীনতার আগেই নেয়া হয়েছিল এমন কিছু নীতির কথা আওয়ামী লীগের পুনর্বিবেচনা করা উচিৎ ছিল। পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে ৩৩.৩৩ একর ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করাটা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত হলেও, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এটি ছিল অতি উচ্চ।

কিছু বিদেশী অর্থনীতিবিদ ১৯৭৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক এসোসিয়েশানের সম্মেলনে ১০ একরের চেয়ে বেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না দিয়েই অধিগ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই পরামর্শ যদি যথার্থভাবে বাস্তবায়িত করা হতো তাহলে প্রতিটি ভূমিহীন পরিবার পেত মাত্র ০.৪ একর জমি। এর চেয়েও সাহসী হয়ে যদি ৪ একরকে ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা হিসেবে নির্ধারণ করা হতো তাহলেও ভূমিহীন পরিবারগুলো গড়ে ০.৮ একর জমি পেত।

এটিও একটি ৬ সদস্যবিশিষ্ট পরিবার চালানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না।

বেটসি হার্টম্যান এবং জেমস বয়েস বলেন, 'এ থেকে প্রমানিত হয় ভূমি সংস্কার প্রয়োজনীয় হলেও, বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য যথেষ্ট নয়। জমির অধিকার পাওয়ার ফলে এদেশের দরিদ্র মানুষের সংকটের কেবল অর্ধেকই সমাধান হবে; সমস্যার বাকি অংশের সমাধান সম্ভব হবে সমবায় ভিত্তিতে ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে।' (ইন্টারন্যাশনাল পলিসি রিপোর্ট, সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল পলিসি, ওয়াশিংটন ডিসি)

বাংলাদেশের মোট চাষকৃত জমির পরিমাণ ছিল মাত্র ২২.৫ মিলিয়ন একর। এ দিয়ে ৭৫ মিলিয়ন লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হতো। মুজিব মার্ক্সবাদী না হলেও বিশ্বাস করতেন জাতি হিসেবে টিকতে হলে বাংলাদেশে সমবায় সমিতি দরকার ছিল। বাংলাদেশের একজন চলচ্চিত্র পরিচালক এভাবে বলেছিলেন: 'তিনি বুঝতে পেরেছিলেন একটি পিংপং টেবিলে ফুটবল খেলা সম্ভব না।'

হার্ভার্ডের একটি গবেষক দল ১৯৭৪-এ দাবি করেছিল সঠিক চাষ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন চারগুণ বাড়ানো সম্ভব। এটি করা সম্ভব ছিল কেবল সমবায় পদ্ধতিতেই।

বেটসি হার্টম্যান এবং জেমস বয়েস বলেন, 'কৃষি খাতে সমবায়ের ফলে বাংলাদেশের কৃষকরা আত্মনির্ভর উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নিতে পারবে, যা বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। অধিক শ্রম নির্ভর পদ্ধতিতে কৃষকরা যৌথভাবে সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ, নিষ্কাশন খাল খনন এবং বাধ নির্মাণ করতে সক্ষম হবে এবং এগুলোর ফলে তারা প্রাকৃতিক শক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে যা একা একা তাদের কেউই মোকাবেলা করতে সক্ষম হতো না। ঠিক যেমনটি আমাদের গ্রামের লোকেরা বলতেন, 'একা একটি বাঁশ ভঙ্গুর, কিন্তু একটি বাঁশের আঁটি কোন ক্রমেই ভাঙ্গা যায় না।' সমবায়ের ফলে গ্রামের ভূ-স্বামীর পরিবর্তে কৃষকরা নিজেরাই তাদের কাজের ফল ভোগ করবে- এমন ধারণা খুবই জনপ্রিয় ও অনুপ্রেরণাদায়ী হবে।'

২৬ মার্চ ১৯৭৫ সালে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জনসভায় মুজিব দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী আর্থ-সামাজিক এবং প্রশাসনিক নীতির ঘোষণা দিয়েছিলেন: এই কর্মসূচি অনুসারে, পরবর্তী পাঁচ বছরে বাধ্যতামূলকভাবে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। প্রতিটি সমবায় সমিতিতে ৫০০ থেকে ৫০০০টি পরিবার থাকবে। জমি চাষ করার কাজটি সমবায় ভিত্তিতে করা হলেও জমির মালিকানা ঠিকই বহাল থাকবে। সমবায়ের ফলে বেকার ও ভূমিহীনদের কাজের সুযোগ তৈরি হবে। জমির ফসল জমির মালিক, কৃষি শ্রমিক এবং সমবায় সমিতির মধ্যে বণ্টন করে দেয়ার পরিকল্পনা ছিল। সকল কৃষি তৎপরতা এবং ওয়ার্ক প্রোগ্রাম ও টেস্ট রিলিফের মতো সকল কর্মসূচি পরিচালিত হবে সমবায় সমিতিগুলোর মাধ্যমে। এর ফলে সে সময় গ্রাম পর্যায়ে যে স্থানীয় সরকার ছিল সেগুলোর স্থান নিয়ে নিত সমবায় সমিতিগুলো।

দেশের সকল উপবিভাগগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করার কথা ছিল। বিদ্যমান জেলাগুলোকে বিলুপ্ত ঘোষণা করার পরিকল্পনা ছিল। প্রতিটি নতুন জেলার জন্য একটি করে প্রশাসনিক কাউন্সিল গঠনের কথাও ছিল। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক দল ও সরকারী কর্মকর্তাদের থেকে প্রতিনিধিদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

একইভাবে দেশের সবচেয়ে ক্ষুদ্র প্রশাসনিক ইউনিট অর্থাৎ থানাসমুহের জন্যও একটি থানা কাউন্সিল গঠন করার কথাও বলা হয়েছিল।

জমির মালিক জমিতে যে ফসল হতো তার একটি অংশ পাবেন, তবে যার জমি যতখানি অল্প সে ততখানি বেশি ফসলের দাবিদার হবেন। এমনকি ভূমিহীন কৃষকরাও উৎপাদিত ফসলের একটি অংশ পাবেন।

সর্বজনের রান্নাঘর ও শিশুলালন কেন্দ্রও এই কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল। কর্মসূচিতে বৃদ্ধ ভাতার কথাও উল্লেখিত ছিল।

ক্ষুদ্র জমির মালিক যাদের ভূমি চাষ করা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক না হলেও, তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তারা ভূ-স্বামী ছিলেন, এমন কৃষকরা এই কর্মসূচির ফলে সুফল ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু, এসব কৃষককে উৎসাহিত করার জন্য, এই কর্মসূচির সুফল তাদের বুঝিয়ে কর্মসূচিতে তাদের সমর্থন আদায়ের জন্য কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। বরং তারা ভয় পাচ্ছিলেন যে এই কর্মসূচির ফলে তাদের সর্বশেষ আশ্রয় যে সামান্য ভূমি সেটিও হয়তো তাদের থেকে কেড়ে নেয়া হতে পারে, আর তাদের এই ভীতিকেই কাজে লাগিয়েছিলেন যারা যে কোন পরিবর্তনের বিপক্ষে থাকেন এমন গোষ্ঠীগুলো।

একজন বাংলাদেশী কর্মকর্তা বলেছিলেন, 'বহুমুখী কর্মসূচিটি অনেকে যতটা ভেবেছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি বৈপ্লবিক ও সর্বাত্মক ছিল। মুজিব যথেষ্ট

প্রস্তুতি ছাড়াই এটি শুরু করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি এটি স্বার্থক করতে সক্ষম হতেন। যদি তিনি তা করতে সক্ষম হতেন তবে এর প্রভাব প্রতিবেশি দেশগুলোর উপরও পড়তো।'

বাংলাদেশের উপবিভাগগুলোকে জেলায় পরিণত করার ধারণাটি নতুন ছিল না। আইয়ুব খান ক্ষমতায় থাকা কালে এমন একটি পরিকল্পনা পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে বাংলাদেশ) এর জন্য নেয়া হলেও পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার গভর্নর মোনেম খানের সেটি পছন্দ না হওয়ায় এই পরিকল্পনা নিয়ে আর এগোনো হয়নি। এই একই পরিকল্পনা আবার সামনে এসেছিল ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগে আগে। নতুন জেলার প্রধানদের কি বলা হবে? গভর্নর মোনেম খানকে অপছন্দ করতেন এমন একজন প্রস্তাব করেছিলেন এসব নতুন জেলার প্রধানদেরকে গভর্নর পদবী দেয়ার জন্য। এই প্রস্তাব মেনেই মুজিব ১৯৭৪ সালে তার কর্মসূচির আওতায় যে নতুন জেলা তৈরি হবে সেগুলোর প্রধানদের গভর্নর পদবী দেন।

১৯৭৪ সালের সংকটের পর মুজিব একজন বদলে যাওয়া মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। যে সব কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি নিতে দেরী করছিলেন এ সময়ে এসে তিনি সেগুলো নিতে শুরু করেছিলেন। তিনি এ সময় বার বার বলতেন, 'আমাকে একটা কিছু করতেই হবে।'

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে তিনি কিছু ঋণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেন। ঋণ আদায়ও এ সময় শুরু হয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত হয় যে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ ঐ বছরের এপ্রিলের মধ্যে তাদের সম্পদের হিসাব দাখিল করবেন। এপ্রিলে মুজিব দেশে ১০০ টাকা মূল্যমানের নোটগুলোর মুদ্রামূল্য প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দেশে এর চেয়ে বড় মূল্যমানের ব্যাংকনোটের মুদ্রামূল্য রহিত করার ঘটনা এর আগে ঘটেনি। এ বিষয়ে মুজিব তখনকার অর্থমন্ত্রী এ. আর. মল্লিকের সাথে পরামর্শ কালে, মল্লিক তাকে বলেছিলেন, 'আপনি হয়তো পরে আপনার সহকর্মীদের চাপে পড়ে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে পারেন।' মুজিব তখন দৃঢ়তার সাথে বলেছিলেন, 'না! সে জন্যই আমি আপনাকে দিল্লী থেকে নিয়ে এসেছি। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কেবল আপনি একাই থাকবেন। আমাকে একটি কিছু করতেই হবে। এদেশকে রক্ষা করতেই হবে।'

মুদ্রামূল্য রহিত হওয়া নোটগুলোর বিপরীতে অর্থ প্রদান প্রক্রিয়াটি পর্যায়ক্রমিক হওয়ার কথা ছিল, এবং বিনিময় মূল্য শুরু হওয়ার কথা ৬০০ টাকা থেকে।

১০০ টাকার নোটের মুদ্রামূল্য রহিত করার এ সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলেছিল। দ্রব্যমূল্য কমতে শুরু করেছিল। মুদ্রা সরবরাহ সূচক ২৫ মার্চ ১৯৭৫-এ ২৩০ থেকে ৩৮ পয়েন্ট কমে ২৫ এপ্রিল ১৯৭৫-এ ১৯২-এ এসে দাঁড়ায়। এর আগে সংকুচিত মুদ্রা নীতির কারণে অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৯৭৩-৭৪

অর্থবছরের ৩৩০২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৭৪-৭৫-এ ১৫০১ মিলিয়ন টাকায় নেমে আসে, এবং ব্যাংকগুলোর আউটস্ট্যান্ডিং এডভান্স ডিসেম্বর ১৯৭৪-এর ৮৫৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে কমে জুন ১৯৭৫-এ ৮১২৩ মিলিয়ন টাকা হয়।

মুজিব হত্যার পর তার এই প্রগতিশীল উদ্যোগগুলোর বিপরীতমুখী যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। মোস্তাক রাষ্ট্রের প্রধান চারটি আদর্শ- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা তখনো অপরিবর্তিত ছিল এমন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন কর্তৃপক্ষ কেবল নামেই অসাম্প্রদায়িক ছিল। ১৯৭৪ সালের জুনে বিদেশী দাতা সংস্থা, বিদেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং যেসব বাঙালী বাণিজ্য, ফটকাবাজারী এবং নির্মাণ খাত থেকে অর্থ উপার্জন করছিলেন তারা মুজিবকে বিনিয়োগের সীমা ২.৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ মিলিয়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এসব বাঙালী ব্যবসায়ী আর তাদের বিদেশী বন্ধুরা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিনিয়োগের সীমা আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মোস্তাক।

যাদের এতো টাকা ছিল যে তার হিসাব তারা নিজেরাই জানতেন না এমন ব্যক্তিরা ১০০ টাকার নোটের মুদ্রামূল্য রহিত করার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মোস্তাক চাওয়া মাত্রই প্রদেয় বিনিময় মূল্য ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করেছিলেন।

পরবর্তীতে জানা গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় মোস্তাক ঢাকার একটি ব্যাংকে যে ৬৮,০০০ টাকা জমা রেখেছিলেন তার পুরোটুকুর বিনিময় মূল্যই তিনি তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আদায় করে নিয়েছিলেন।

বিভৎস

প্রাথমিক বিহবলতা কাটিয়ে ওঠার পর আবারও মানুষজন ভালোবেসে শ্রদ্ধা ভরে মুজিবের কথা বলতে শুরু করে। অনেক রাজনৈতিক নেতাই প্রকাশ্যে মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলতে শুরু করেছিলেন। এমন কি সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও তাকে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন। একজন মন্ত্রী সতর্কভাবে একজন মেজর-জেনারেলকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনিও কি তাকে বঙ্গবন্ধু বলেন?' তখন মেজর-জেনারেল উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন নয়? আমি তার ছবি সরিয়ে ফেলিনি। আমার অফিসে এখনো সেটা রয়েছে।'

মোস্তাকের অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হচ্ছিল, তিনি নানা উপঢৌকন দিয়ে সেনাবাহিনীর মন জয় করতে চাইছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতির এক নির্দেশে বলা হয়েছিল, 'বিগত সাড়ে তিন বছর (মুজিবে আমলে) সময়কালে দেশের সেনাবাহিনীকে যে উপেক্ষা ও অসম্মান দেখানো হয়েছে সেই ভুল' সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে 'জাতীয় জীবনে একটি সম্মানের স্থান দেয়ার' সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।

মোস্তাক সেনাবাহিনীকে তোষণ করছিলেন।

মুজিবের মৃত্যুর চল্লিশতম দিনটি ১৯৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলাদেশে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়েছিল। এটি প্রকাশ্যে মোস্তাক সরকারের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করা ছিল, এটি ছিল মুজিবকে সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদ।

মোস্তাক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তার দিন ফুরিয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি মুজিব হত্যাকারীদের তার মানে তার নিজেকেও বাঁচানোর একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খুনীদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা দেয়া হয়, কিন্তু এটি কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়নি।

মোস্তাক সরকারের বিরোধিতা ক্রমেই বাড়ছিল। জনরোষ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল। ৩ অক্টোবর ১৯৭৫ একটি সম্প্রচারে মোস্তাক '১৮ মাস সময়ের মধ্যে' সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতার মন গলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে নিয়ে এসে তিনি দেশের গণতন্ত্রের এতোটাই ক্ষতি করেছিলেন যে তা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন ছিল।

২/৩ নভেম্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে নিজে সেনাবাহিনীর প্রধানের আসনে বসেন। হত্যাকারী মেজররা প্রথমে লড়াই করার কথা ভাবলেও পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিচক্ষণতা সাহসের উন্নততর অংশ।

অর্থবছরের ৩৩০২ মিলিয়ন টাকা থেকে ১৯৭৪-৭৫-এ ১৫০১ মিলিয়ন টাকায় নেমে আসে, এবং ব্যাংকগুলোর আউটস্ট্যান্ডিং এডভান্স ডিসেম্বর ১৯৭৪-এর ৮৫৭০ মিলিয়ন টাকা থেকে কমে জুন ১৯৭৫-এ ৮১২৩ মিলিয়ন টাকা হয়।

মুজিব হত্যার পর তার এই প্রগতিশীল উদ্যোগগুলোর বিপরীতমুখী যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল। মোস্তাক রাষ্ট্রের প্রধান চারটি আদর্শ- জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িকতা তখনো অপরিবর্তিত ছিল এমন বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু নতুন কর্তৃপক্ষ কেবল নামেই অসাম্প্রদায়িক ছিল। ১৯৭৪ সালের জুনে বিদেশী দাতা সংস্থা, বিদেশি ব্যক্তি মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং যেসব বাঙালী বাণিজ্য, ফটকাবাজারী এবং নির্মাণ খাত থেকে অর্থ উপার্জন করছিলেন তারা মুজিবকে বিনিয়োগের সীমা ২.৫ মিলিয়ন থেকে বৃদ্ধি করে ৩০ মিলিয়ন করতে বাধ্য করেছিলেন। কিন্তু এসব বাঙালী ব্যবসায়ী আর তাদের বিদেশী বন্ধুরা এতেও সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। বিনিয়োগের সীমা আরো বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন মোস্তাক।

যাদের এতো টাকা ছিল যে তার হিসাব তারা নিজেরাই জানতেন না এমন ব্যক্তিরা ১০০ টাকার নোটের মুদ্রামূল্য রহিত করার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ক্ষমতা গ্রহণের ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মোস্তাক চাওয়া মাত্রই প্রদেয় বিনিময় মূল্য ৬০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করেছিলেন।

পরবর্তীতে জানা গিয়েছিল রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় মোস্তাক ঢাকার একটি ব্যাংকে যে ৬৮,০০০ টাকা জমা রেখেছিলেন তার পুরোটুকুর বিনিময় মূল্যই তিনি তার ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে আদায় করে নিয়েছিলেন।

বিভৎস

প্রাথমিক বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠার পর আবারও মানুষজন ভালোবেসে শ্রদ্ধা ভরে মুজিবের কথা বলতে শুরু করে। অনেক রাজনৈতিক নেতাই প্রকাশ্যে মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলতে শুরু করেছিলেন। এমন কি সেনাবাহিনীর কিছু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাও তাকে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন। একজন মন্ত্রী সতর্কভাবে একজন মেজর-জেনারেলকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনিও কি তাকে বঙ্গবন্ধু বলেন?' তখন মেজর-জেনারেল উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন নয়? আমি তার ছবি সরিয়ে ফেলিনি। আমার অফিসে এখনো সেটা রয়েছে।'

মোস্তাকের অবস্থা ক্রমেই জটিলতর হচ্ছিল, তিনি নানা উপঢৌকন দিয়ে সেনাবাহিনীর মন জয় করতে চাইছিলেন। ১১ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ রাষ্ট্রপতির এক নির্দেশে বলা হয়েছিল, 'বিগত সাড়ে তিন বছর (মুজিবে আমলে) সময়কালে দেশের সেনাবাহিনীকে যে উপেক্ষা ও অসম্মান দেখানো হয়েছে সেই ভুল' সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে 'জাতীয় জীবনে একটি সম্মানের স্থান দেয়ার' সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চলছে।

মোস্তাক সেনাবাহিনীকে তোষণ করছিলেন।

মুজিবের মৃত্যুর চল্লিশতম দিনটি ১৯৭৫ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর সারা বাংলাদেশে ভাব-গাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়েছিল। এটি প্রকাশ্যে মোস্তাক সরকারের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করা ছিল, এটি ছিল মুজিবকে সপরিবারে হত্যার প্রতিবাদ।

মোস্তাক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তার দিন ফুরিয়ে আসছে বুঝতে পেরে তিনি মুজিব হত্যাকারীদের তার মানে তার নিজেকেও বাঁচানোর একটি উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭৫ খুনীদের রাষ্ট্রপতির ক্ষমা দেয়া হয়, কিন্তু এটি কোন আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে জানানো হয়নি।

মোস্তাক সরকারের বিরোধিতা ক্রমেই বাড়ছিল। জনরোষ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছিল। ৩ অক্টোবর ১৯৭৫ একটি সম্প্রচারে মোস্তাক '১৮ মাস সময়ের মধ্যে' সংসদীয় গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে জনতার মন গলানোর চেষ্টা করেছিলেন।

সেনাবাহিনীকে রাজনীতিতে নিয়ে এসে তিনি দেশের গণতন্ত্রের এতোটাই ক্ষতি করেছিলেন যে তা পুনরুদ্ধার করা খুবই কঠিন ছিল।

২/৩ নভেম্বরে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ একটি রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মেজর-জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সরিয়ে নিজে সেনাবাহিনীর প্রধানের আসনে বসেন। হত্যাকারী মেজররা প্রথমে লড়াই করার কথা ভাবলেও পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিচক্ষণতা সাহসের উন্নততর অংশ।

লেফটেনেন্ট কর্নেলরা তার পরিবার এবং সতীর্থ চক্রান্তকারীদের নিয়ে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ ব্যাংককে পাড়ি জমান। কিন্তু ঢাকা ছাড়ার আগে তারা এটা নিশ্চিত করেছিলেন যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চার জন রাজনৈতিক নেতা এবং বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ চারজন সহযোগী যাতে জীবিত না থাকেন।

মুজিব হত্যার ৮ দিন পর ২৩ আগস্ট ১৯৭৫ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, এম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান এই চার নেতাকে সেনা আইনের আওতায় গ্রেফতার করা হয়েছিল এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছিল। ৩ নভেম্বর রাতে কিছু সেনা সদস্য কেন্দ্রীয় কারাগারে প্রবেশ করে এবং ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করে এই চার নেতাকে হত্যা করে। খুনীরা দাবি করেছিল, তারা রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করছিল, মোস্তাক সে সময় রাষ্ট্রপতি ছিলেন।

সামরিক শাসনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন এমন যে চারজন মাত্র নেতা ছিলেন তাদের সরিয়ে দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত শুরু হয়েছিল তা শেষ হয়েছিল।

ব্যাংককে পৌছেই ফারুক দ্রুত পাকিস্তান ও মার্কিন দুতাবাসের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন। মুজিবকে হত্যা করার জন্য তিনি কোন অনুতাপ দেখাননি, 'না, তার জন্য কখনো নয়।' তিনি বলেছিলেন। তার মতে মোস্তাক মুজিবকে উৎখাত করার চক্রান্তের উদ্যোক্তা হলেও পরিকল্পনার বিস্তারিত জানতেন না।

কিসিং এর কনটেম্পোরারি আর্কাইভে উল্লিখিত রয়েছে যে, যারা মুজিবকে হত্যায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তারাই 'সেনা সরকারকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন এমন' চার নেতাকে হত্যা করেছিল বলে ফারুক স্বীকার করেছিলেন।

১২ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর রেডিও বাংলাদেশ জেল হত্যার খবর প্রচার করেছিল। সারা দেশে আতঙ্ক আর ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিল।

রেডিওতে বলা হয় রাষ্ট্রপতি মোস্তাক জেলের ভেতর 'চারজন প্রখ্যাত ব্যক্তি'র হত্যার সাথে কারা জড়িত তা খুঁজে বের করার জন্য এবং কি উপায়ে ঐ অপরাধীরা নিরাপদে পালিয়ে যেতে পেরেছিল তা তদন্ত করার জন্য তিন জন বিচারককে নিয়ে গঠিত একটি কমিশনকে নিয়োগ করেছেন।

৫ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকায় সাধারণ ধর্মঘট ডাকা হয়েছিল; ছাত্ররা মোস্তাকের পদত্যাগ এবং মুজিব ও চার নেতার হত্যাকারীদের শাস্তির দাবিতে রাস্তায় মিছিল বের করেছিল।

জঘন্য চক্রান্তের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের ৮০ দিন পর মোস্তাককে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম মোস্তাকের পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তিনি ৬ নভেম্বর শপথ গ্রহণ করেন। ঐ একই দিনে এক সম্প্রচারে তিনি বলেছিলেন–

'১৫ আগস্টে সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়া এবং এখনো বাহিনীতে আছেন এমন কিছু সেনা কর্মকর্তা একটি উত্থান মঞ্চস্থ করেন যাতে রাষ্ট্রপতি সপরিবারে নিহত হন। খোন্দকার মোস্তাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন এবং দেশে সামরিক আইন জারি করেন। প্রকৃত ঘটনা হলো কোনভাবেই সেনা বাহিনী যা ঘটেছে তার সাথে যুক্ত ছিল না।' (এখানে জোর দেয়া হয়েছিল)

'জনগণ আশা করেছিল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আমরা সবাই হতাশ হয়েছি। দেশে নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর উপরে সাম্প্রতিক অতীতে কয়েকজন বরেণ্য রাজনৈতিক নেতাকে কারাবন্দী অবস্থায় নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।'

সায়েম সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন ১৯৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি বা 'সম্ভব হলে তার আগেই' নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

চার জন নেতার হত্যার নিন্দা জানিয়ে ৬ নভেম্বর একজন ভারতীয় মুখপাত্র বলেছিলেন, বাংলাদেশে নৃশংসভাবে চারজন রাজনৈতিক নেতাকে হত্যা করার খবরে ভারত সরকার ও সারাদেশের মানুষ আতঙ্কিত ও গভীর শোকাহত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করার পর আবার এমন হত্যাকাণ্ড বাংলাদেশের বন্ধুসুলভ জনগণের দুর্দশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।

আমরা এসব রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জানাই এবং আমাদের বন্ধুসুলভ প্রতিবেশী দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব হারানোর শোকের সাথে সমব্যথী। আমাদের মনের গভীরে বিশ্বাস রয়েছে এত সব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার পরও বাংলাদেশের মানুষ তাদের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে সম হবে, সে লক্ষ্যে এইসব নেতারা যারা বেঁচেছেন, কাজ করেছেন এবং জীবন দিয়েছেন জাতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য, তারা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবেন।'

এই রক্তাক্ত ঘটনা প্রবাহে আরও একটি মোচড় ছিল। কর্নেল তাহেরের নেতৃত্বে একটি সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে খালেদ মোশাররফকে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ উৎখাত করা হয়েছিল। খালেদ মোশাররফ এবং আরও ৪০ জনেরও বেশি সেনা কর্মকর্তা এই বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন।

পরিশিষ্ট

৩০ মে ১৯৮১ সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নিহত হওয়ার খবর প্রচারিত হয়। সাত ঘণ্টা পরে রেডিওতে চট্টগ্রাম ব্রিগেডের প্রধান মেজর-জেনারেল মঞ্জুর এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছেন বলে প্রচারিত হয়। মঞ্জুর ছিলেন জিয়ার একজন সাবেক বন্ধু। সব কিছুই ঠিক জায়গামতো বসে যাচ্ছিল। এটিকে একটি গ্রীক ট্র্যাজেডির মতোই অপরিহার্য মনে হচ্ছিল।

জিয়া ও মঞ্জুর এক সময় ভালো বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ১৯৭৭-এ তারা একে অপরের থেকে দূরে সরে যান। ১৯৭৭ সালে দুটি বিদ্রোহ ঘটেছিল- প্রথমটি ৩০ সেপ্টেম্বরে বগুড়ায় এবং দ্বিতীয়টি ২ অক্টোবরে ঢাকায়। ২০০ জনেরও বেশি ২ অক্টোবরের বিদ্রোহে নিহত হয়েছিলেন, এবং সেনা ও বিমান বাহিনীর ৩৭ জনেরও বেশি সদস্যকে এই বিদ্রোহে সম্পৃক্ততার অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ সরকার তিনটি রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে–মোস্তাকের নেতৃত্বাধীন ডানপন্থী গণতান্ত্রিক লীগ, মস্কোপন্থী কম্যুনিস্ট পার্টি এবং জাতীয় সমাজবাদী দল (জাসদ নামে পরিচিত)।

এই অভ্যুত্থানের চেষ্টা, যা প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল 'আগের যে কোন কিছুর চেয়ে বেশি পরিমাণে জিয়া সরকারের আত্মবিশ্বাসকে নাড়িয়ে দিয়েছিল।' ঢাকায় থাকা সেনা কর্মকর্তাদের অন্যত্র বদলি করে দেয়া হয়। ঢাকা ব্রিগেডের কমান্ডারকে যশোরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল, মেজর-জেনারেল দস্তগীরকে পদচ্যুত করে রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের পদ দেয়া হয়েছিল। চীফ অফ জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল মঞ্জুরকেও একটি কূটনৈতিক দায়িত্ব নেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল, কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখান করেছিলেন। তাকে চট্টগ্রাম ব্রিগেডের কমান্ডারের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। মঞ্জুর প্রতিশোধ নেয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

তার জন্য হুমকি হতে পারেন এমন যে কোন ব্যক্তিকেই জিয়া সতর্কভাবে সরিয়ে দিতেন। এবং তিনি অন্যান্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও নিয়েছিলেন। সেনাবাহিনী থেকে অবসর নেয়ার পরও তিনি ঢাকা সেনানিবাসেই থাকতেন। তিনি সব সময়েই প্রায় সফরে থাকতেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অথবা বিদেশের মাটিতে। একজন সমালোচক মন্তব্য করেছিলেন, 'এতে করে হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা কমে।'

তার প্রতি মঞ্জুরের ঘৃণার তীব্রতার কথা জিয়ার অজানা থাকার কথা নয়। কিন্তু চট্টগ্রামে বিএনপির মধ্যে যে গুরুতর বিভেদ দেখা দিয়েছিল তা মেটানো জরুরি ছিল। তিনি ইতিমধ্যেই বিএনপি থেকে কিছু সদস্যকে বহিষ্কার করেছিলেন এবং আরও কিছু সদস্যকে বহিস্কার করতে যাচ্ছিলেন।

চট্টগ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে একটি বৈঠক শেষ করে রাতের জন্য বিশ্রাম নিতে তিনি চট্টগ্রাম রেস্ট হাউসে ছিলেন। ঢাকায় তার স্ত্রীর কাছ থেকে তার কাছে একটি ফোন এসেছিল। তিনি স্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে সব ঠিক আছে এবং পরদিনই তিনি ঢাকা ফিরছেন। কিন্তু ছায়ায় তখন মৃত্যু ঘোরাফেরা করছিল।

১৯৭১-এর মার্চে যখন পাক বাহিনী বাঙালীর ওপর হামলা চালায় তখন মঞ্জুর শিয়ালকোটে দায়িত্বরত ছিলেন। প্রথমে মঞ্জুর তাহের ও জিয়াউদ্দীন নামে আরও দুজন বাঙালী সেনা কর্মকর্তা যারা শিয়ালকোট হয়ে ভারতে পালাচ্ছিলেন তাদের সাথে যোগ দিতে আগ্রহী ছিলেন না, কিন্তু তার স্ত্রী শিয়ালকোট থেকে পালানোর জন্য তাকে জোর করেছিলেন। তিনি স্ত্রীকে নিয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

এরপরও চীন তার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঠেকাতে যত তৎপরতা চালিয়েছে তা জেনেও মঞ্জুর চীনের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। এবং আর সব চীনপন্থী বাঙালীর মতোই মঞ্জুরও ছিলেন মুজিব-বিরোধী। তিনি তার শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রায়ই বলতেন, 'আমরা যখন লড়াই করছিলাম মুজিব তখন পাকিস্তানের জেলে আরাম আয়েসে ছিলেন।' পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সম্ভ্রান্ত সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত মঞ্জুর কখনোই গণ বাহিনীতে বিশ্বাস করতে পারেননি। তার মতে কেবল অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত একটি সশস্ত্র বাহিনীই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে পারে এবং সেনা বাহিনীর প্রতি মুজিবের অবজ্ঞার কারণে মুজিবের প্রতি তিনি বিক্ষুব্ধ ছিলেন।

১৯৭৪ সালের শেষের দিকে মঞ্জুর দিল্লীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনের প্রতিরা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ পান। ১৯৭৫-এর জুনে তাকে ব্রিগেডিয়ার পদ দেয়া হয়- এখনো বয়স ৩৫ পেরোয়নি এমন একজন ব্যক্তির জন্য এটি ছিল একটি অতি উচ্চ পদ। কিন্তু এরপরও তার মনে হয়েছিল কূটনৈতিক পদে নিয়োগটি এক ধরণের শাস্তি ছিল।

দিল্লীতে থাকার সময়টা মঞ্জুর পড়ালেখার কাজে লাগিয়েছিলেন। তিনি মূলত রাজনৈতিক গ্রন্থগুলোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন; তিনি ভারতসহ অন্যান্য দেশের সংবিধান পড়েছিলেন। কেউ কেউ ভেবেছিলেন তার মনের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু আসলে তিনি সেই দিনটির অপেক্ষা করছিলেন যেদিন তিনিও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবেন। তিনি একজন উচ্চকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি ছিলেন।

মুজিবের নিহত হওয়ার দিনে যখন মঞ্জুরের কিছু ভারতীয় বন্ধু তার সাথে দেখা করতে যান তখন তারা মঞ্জুরকে মুজিবের মৃত্যু উপলক্ষে উৎসব করতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সব সময়ই মুজিবের সমালোচনা করতেন, কিন্তু মঞ্জুর এতোটাই অমানবিক ছিলেন যে নারী ও শিশুরা মুজিবের সাথে নিহত হয়েছিলেন তাদের জন্যও তার মনে কোন করুণা হয়নি।

মঞ্জুর আকাশ পথে দ্রুত দিল্লী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন তার বন্ধু জিয়াউর রহমান তখন সেনা প্রধান হওয়ার ফলে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জিয়া নিজে তখনো পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলেন এবং মঞ্জুরকে অপেক্ষা করতে বলেন। এই উপদেশটি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ মোস্তাক সরকারকে উৎখাত করেন এবং জিয়াকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ঘোষণা করেন। মঞ্জুর ভীত হয়েছিলেন, কারণ খালেদ মোশাররফের সাথে তার শত্রুতা ছিল। কিন্তু দ্রুতই তার ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তাহেরের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতি-অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হন। তাহের জিয়াকে মুক্ত করেন এবং জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেন।

খালেদ মোশাররফ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে মোস্তাকের স্থলে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। সংবিধানকে কোন মাত্রায় সমুন্নত রাখতে সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখা হয়। সায়েম তখন প্রধান সেনা আইন প্রশাসকও ছিলেন এবং তিন বাহিনীর প্রধানকে উপ প্রধান সেনা আইন প্রশাসক করা হয়েছিল। জিয়াও সে সময় তিনজন উপপ্রধান সেনা আইন প্রশাসকদের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা রেডিওতে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ একটি আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল; কৃতজ্ঞ জিয়া তাহেরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তাহের জিয়াকে উদ্ধার করেছিলেন। এর পরদিন তাহেরের দল জাসদের সভাপতি ও মহাসচিবকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু সৈনিকরা যারা কিছু সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিল, তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ছিল; তারা কোন সেনা কর্মকর্তাবিহীন একটি সেনা বাহিনী চাইছিল। জাসদ নেতারা যে সিপাহী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেটিকে তারা নিজেরা একটি বিপ্লব বলছিলেন। হয়তো তাদের নিজস্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে তাদের মনে হচ্ছিল তখন সৈনিকদের কমিটি গঠন করার সময় এসে গিয়েছিল।

সেনা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারানোর আগেই আঘাত হেনেছিল। যে সমস্ত জাসদ নেতাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল তাদের ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ আবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর পরদিন তাহেরকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এমন কিছু ঘটতে পারে জাসদ এমনটি ভাবতেও পারেনি। জাসদকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছিল, অন্তত অস্থায়ীভাবে।

জিয়ার এ সময় তার বন্ধু মঞ্জুরের কথা মনে পড়েছিল, মঞ্জুর সিপাহীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মঞ্জুরকে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং তাকে চীফ অফ জেনারেল স্টাফ করেন।

জিয়ার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মঞ্জুর প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং সুখী ছিলেন। তিনি জিয়াকে একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী যিনি চেতনায় অসাম্প্রদায়িক-এ হিসেবেই সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি. তওয়াব এবং রিয়ার এডমিরাল মোশাররফের তুলনায় জিয়াকে অনেকের কাছেই মধ্যমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণকারী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সায়েমের সহযোগিতায় তওয়াবকে সরিয়ে দিয়ে প্রধান সেনা আইন প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, জিয়া সায়েমকেও আর অংশীদার রাখেননি।

জিয়া কাউকেই বিশ্বাস করতেন না এবং কাউকে প্রয়োজনীয় মনে না হলে তাকে দূর করে দিতে কোন দ্বিধা করতেন না। যে তাহের তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই তাহেরই ছিলেন জিয়ার প্রথম শিকার। ২১ জুলাই ১৯৭৬ একটি গোপন সেনা আদালত যা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, সেটিতেই তাহেরের ফাঁসীর রায় কার্যকর করা হয়। এই বিচার ছিল প্রহসন।

জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার পর একটি গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। দাবি করা হয় ঐ গণভোটে শতকরা আশি ভাগ ভোটার অংশ নিয়েছিলেন এবং শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট জিয়ার পক্ষে পড়েছিল। ৩১ মে ১৯৭৭ লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সাইমন উইনচেস্টার বলেছিলেন, 'জেনারেলের প্রতি আগ্রহ ভোটারদের চেয়ে পোলিং অফিসারদের মধ্যেই বেশি দেখা যাচ্ছিল।'

জিয়া বহু দিনের প্রতিশ্রুত এবং প্রায়ই ভঙ্গ করা সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পূরণের আগে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'জাগদল' নামে একটি দল শুরু করার প্রক্রিয়াকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া।

৩ জুন ১৯৭৯ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া জয়ী হবেন এটি সবাই আগে থেকে জানলেও যে ব্যবধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেনাপ্রধানের দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর দলকে হারিয়ে জিয়া জয়লাভ করেছিলেন তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল।

যদিও 'জাগদল' গঠনে জিয়াই ছিলেন মূল অনুপ্রেরণা তারপরও, তিনি নিজে এটিতে কখনো যোগ দেন নি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়া এ দলটি ধ্বংস হতে দিয়েছিলেন। দলটির কবর দেয়ার দায়িত্ব তিনি উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন।

মঞ্জুর আকাশ পথে দ্রুত দিল্লী থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, তিনি ভেবেছিলেন তার বন্ধু জিয়াউর রহমান তখন সেনা প্রধান হওয়ার ফলে তাকে ঢাকায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু জিয়া নিজে তখনো পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছিলেন এবং মঞ্জুরকে অপেক্ষা করতে বলেন। এই উপদেশটি যথার্থ প্রমাণিত হয়েছিল। ১৯৭৫ এর ৩ নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ মোস্তাক সরকারকে উৎখাত করেন এবং জিয়াকে গৃহবন্দী করেন এবং নিজেকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান ঘোষণা করেন। মঞ্জুর ভীত হয়েছিলেন, কারণ খালেদ মোশাররফের সাথে তার শত্রুতা ছিল। কিন্তু দ্রুতই তার ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ তাহেরের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতি-অভ্যুত্থানে খালেদ মোশাররফ নিহত হন। তাহের জিয়াকে মুক্ত করেন এবং জিয়াকে সশস্ত্র বাহিনীর প্রধানের পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করেন।

খালেদ মোশাররফ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে মোস্তাকের স্থলে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। সংবিধানকে কোন মাত্রায় সমুন্নত রাখতে সায়েমকেই রাষ্ট্রপতি পদে বহাল রাখা হয়। সায়েম তখন প্রধান সেনা আইন প্রশাসকও ছিলেন এবং তিন বাহিনীর প্রধানকে উপ প্রধান সেনা আইন প্রশাসক করা হয়েছিল। জিয়াও সে সময় তিনজন উপপ্রধান সেনা আইন প্রশাসকদের একজন ছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন তিন জনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

ঢাকা রেডিওতে ৭ নভেম্বর ১৯৭৫ একটি আবেগঘন দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল; কৃতজ্ঞ জিয়া তাহেরকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তাহের জিয়াকে উদ্ধার করেছিলেন। এর পরদিন তাহেরের দল জাসদের সভাপতি ও মহাসচিবকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল।

কিন্তু সৈনিকরা যারা কিছু সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করেছিল, তারা বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে ছিল; তারা কোন সেনা কর্মকর্তাবিহীন একটি সেনা বাহিনী চাইছিল। জাসদ নেতারা যে সিপাহী বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন সেটিকে তারা নিজেরা একটি বিপ্লব বলছিলেন। হয়তো তাদের নিজস্ব তত্ত্বের ভিত্তিতে তাদের মনে হচ্ছিল তখন সৈনিকদের কমিটি গঠন করার সময় এসে গিয়েছিল।

সেনা কর্তৃপক্ষ নিয়ন্ত্রণ হারানোর আগেই আঘাত হেনেছিল। যে সমস্ত জাসদ নেতাকে মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল তাদের ২৩ নভেম্বর ১৯৭৫ আবার গ্রেফতার করা হয়েছিল। এর পরদিন তাহেরকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল।

এমন কিছু ঘটতে পারে জাসদ এমনটি ভাবতেও পারেনি। জাসদকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়া হয়েছিল, অন্তত অস্থায়ীভাবে।

জিয়ার এ সময় তার বন্ধু মঞ্জুরের কথা মনে পড়েছিল, মঞ্জুর সিপাহীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি মঞ্জুরকে ঢাকায় ডেকে পাঠান এবং তাকে চীফ অফ জেনারেল স্টাফ করেন।

জিয়ার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে মঞ্জুর প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিলেন এবং সুখী ছিলেন। তিনি জিয়াকে একজন সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী যিনি চেতনায় অসাম্প্রদায়িক-এ হিসেবেই সবার সামনে উপস্থাপন করেছিলেন। এয়ার ভাইস মার্শাল এম. জি. তওয়াব এবং রিয়ার এডমিরাল মোশাররফের তুলনায় জিয়াকে অনেকের কাছেই মধ্যমপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণকারী বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু সায়েমের সহযোগিতায় তওয়াবকে সরিয়ে দিয়ে প্রধান সেনা আইন প্রশাসক হিসেবে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর, জিয়া সায়েমকেও আর অংশীদার রাখেননি।

জিয়া কাউকেই বিশ্বাস করতেন না এবং কাউকে প্রয়োজনীয় মনে না হলে তাকে দূর করে দিতে কোন দ্বিধা করতেন না। যে তাহের তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করেছিলেন সেই তাহেরই ছিলেন জিয়ার প্রথম শিকার। ২১ জুলাই ১৯৭৬ একটি গোপন সেনা আদালত যা ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল, সেটিতেই তাহেরের ফাঁসীর রায় কার্যকর করা হয়। এই বিচার ছিল প্রহসন।

জিয়া নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করার পর একটি গণভোটের আয়োজন করেছিলেন। দাবি করা হয় ঐ গণভোটে শতকরা আশি ভাগ ভোটার অংশ নিয়েছিলেন এবং শতকরা ৯৭ ভাগ ভোট জিয়ার পক্ষে পড়েছিল। ৩১ মে ১৯৭৭ লন্ডনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সাইমন উইনচেস্টার বলেছিলেন, 'জেনারেলের প্রতি আগ্রহ ভোটারদের চেয়ে পোলিং অফিসারদের মধ্যেই বেশি দেখা যাচ্ছিল।'

জিয়া বহু দিনের প্রতিশ্রুত এবং প্রায়ই ভঙ্গ করা সাধারণ নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পূরণের আগে নিজেকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল 'জাগদল' নামে একটি দল শুরু করার প্রক্রিয়াকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয়া।

৩ জুন ১৯৭৯ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া জয়ী হবেন এটি সবাই আগে থেকে জানলেও যে ব্যবধানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেনাপ্রধানের দায়িত্বে থাকা অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল এম. এ. জি. ওসমানীর দলকে হারিয়ে জিয়া জয়লাভ করেছিলেন তা অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল।

যদিও 'জাগদল' গঠনে জিয়াই ছিলেন মূল অনুপ্রেরণা তারপরও, তিনি নিজে এটিতে কখনো যোগ দেন নি। রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর জিয়া এ দলটি ধ্বংস হতে দিয়েছিলেন। দলটির কবর দেয়ার দায়িত্ব তিনি উপরাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারের হাতে ন্যস্ত করেছিলেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) নামে জিয়া আরেকটি দল গঠন করেছিলেন, যে দলটির তিনিই ছিলেন সভাপতি। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে ৩০০ আসনের ২০৯ টিতে বিএনপি জয়লাভ করেছিল।

জাতীয় সংসদে বিএনপি নেতা কে হবে তা বিএনপির আইন প্রণেতারা নন, বরং জিয়া নিজেই ঠিক করেছিলেন। জিয়া শাহ আজিজুর রহমানকে এ জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, এই শাহ আজিজুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর পরই পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সহযোগিতা করার অভিযোগে আটক হয়েছিলেন।

জিয়াকে মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবেই দেখানো হয়েছে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে তার ভূমিকা ছিল প্রশ্নবিদ্ধ। এখানে আমরা সেই আলোচনায় যাবো না। কিন্তু, কেন এই মুক্তিযুদ্ধের নায়ক স্বাধীনতা-বিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন?

জিয়া একটি গোষ্ঠীকে অন্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিলেন। এই ভারসাম্য রক্ষার খেলা তিনি দীর্ঘ দিন ধরে খেলতে পারলেও এই প্রক্রিয়ায় এক কালে যারা তাকে শ্রদ্ধা করতো তাদের সাথে দূরত্ব তৈরি করেছিলেন। তার অসংখ্য সমর্থক ছিল এবং হয়তো প্রকৃত ভক্তও ছিল কিছু; কিন্তু তার কোন বন্ধু ছিল না।

সংসদে বিএনপির নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু বিএনপি প্রকৃত অর্থে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। বিএনপির ভাঙ্গন ঠেকানো জিয়ার জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছিল। এটা বলা যায় যে, জিয়ার মৃত্যুর পর বিএনপি দ্রুতই বিভাজিত হয়ে পড়বে।

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তার মূলত পশ্চিমবঙ্গের লোক এবং বাংলাদেশে তার কোন ভিত্তি নেই। সত্যি কথা হলো তিনি কোন রাজনীতিকই নন। তার একমাত্র যোগ্যতা হলো তিনি মানিয়ে নিতে পারেন। তিনি কেবল একজন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিই হতে পারেন।

শাহ আজিজুর রহমানও পশ্চিমবঙ্গের লোক, তিনি অভিজ্ঞ রাজনীতিক হলেও এখন খুবই ক্লান্ত প্রবীণ মাত্র।

১৫ আগস্ট যারা বিভৎস নাটক মঞ্চস্থ করেছিল তারা কোথায়?

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর খন্দকার মোস্তাক আহমদ ঐ একই দিনে জাতির উদ্দেশে সম্প্রচারিত ভাষণে বলেছিলেন, 'আমি দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করতে চাই এই সরকার কোন ধরণের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি এবং অসামাজিক কার্যক্রমের সাথে আপোষ করবে না।' পরিহাসের বিষয় হলো পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল এবং তাকে পাঁচ বছরের কারাবাসের সাজা দেয়া হয়েছিল।

১৯৮০ সালের মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহে মুক্তি পাওয়ার পর মোস্তাক রাজনৈতিকভাবে অনেক সক্রিয় হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কোন অগ্রগতি করতে পারেননি।

এখন মোস্তাকের দাড়ি হয়েছে এবং তিনি একটি লম্বা কোর্তা পড়ায় তাকে একজন মোল্লার মতো দেখায়। তার দল- গণতান্ত্রিক লীগকে প্রায় কোনভাবেই মুসলিম লীগ থেকে আলাদা করা যায় না। তার কোন জনপ্রিয়তা নেই এবং তার বয়সও তার বিরুদ্ধে; তবুও তিনি চক্রান্তের রাজনীতির একজন পুরোনো খেলোয়াড়।

সংক্ষিপ্ত কারাবাসের পর তাহেরউদ্দীন ঠাকুর রাজনীতি ছেড়ে দাড়ি রেখে এখন ধর্মের মধ্যে শান্তি খুঁজছেন। এখন তিনি বেশ খানিকটা সময় মাজারে ব্যয় করেন, পাশাপাশি ব্যবসাও করে থাকেন।

মাহবুবুল আলম চাষী ব্যস্ত থাকেন সমবায় সমিতি কার্যক্রম উৎসাহিত করা নিয়ে।

১৯৭৯ সালের জুনে ব্রিটিশ সরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আব্দুর রশিদের লন্ডনে আশ্রয় প্রার্থনা খারিজ করে দেয় এবং বেলজিয়ান মেরিন সেনাদের মাধ্যমে ওস্টেন্ড থেকে ২৭ জুন ১৯৭৯ সন্ধ্যা ৬ টা ২০ মিনিটে তাকে সরিয়ে দেয়। ঐ নির্দেশে বলা হয়, 'আমার কাছে মুজিব হত্যায় আপনার জড়িত থাকার যে তথ্য আছে তার ভিত্তিতে আমি মনে করছি আপনাকে সরিয়ে দেয়া জনস্বার্থের জন্য মঙ্গলজনক।'

অথচ যে সেনা কর্মকর্তরা ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ হত্যাকাণ্ডগুলো কার্যকর করেছিলেন তাদের সবাইকেই বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী মিশনগুলোতে কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে: লেফটেনেন্ট কর্নেল শরিফুল হক (ডালিম), ফার্স্ট সেক্রেটারি (চীন); লেফটেনেন্ট কর্নেল আজিজ পাশা, ফার্স্ট সেক্রেটারি (আর্জেন্টিনা); মেজর শাহরিয়ার, সেকেন্ড সেক্রেটারি (ইন্দোনেশিয়া); মেজর বজলুল হুদা, সেকেন্ড সেক্রেটারি (পাকিস্তান); মেজর রাশেদ চৌধুরি, সেকেন্ড সেক্রেটারি (সৌদি আরব); মেজর নূর, সেকেন্ড সেক্রেটারি (ইরান); মেজর শরিফুল হুসাইন, থার্ড সেক্রেটারি (কুয়েত); ক্যাপ্টেন কিসমত হুসাইন, থার্ড সেক্রেটারি (আবুধাবি); লেফটেনেন্ট খায়রুজ্জামান, থার্ড সেক্রেটারি (কানাডা); লেফটেনেন্ট আব্দুল মজিদ, থার্ড সেক্রেটারি (সেনেগাল)।

কেবল লেফটেনেন্ট কর্নেল ফারুক রহমান এবং লেফটেনেন্ট কর্নেল আবদুর রশিদকেই কোন কূটনৈতিক দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেয়া হয়নি। অবশ্য প্রস্তাব দিলেও তারা কোন কূটনৈতিক দায়িত্ব নিতেন না। তারা এতোটাই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন যে সর্বোচ্চ পদের কমে কোন কিছুর প্রস্তাব তারা গ্রহণ করতেন না। তার ওপর, তারা প্রকাশ্যে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমালোচনা করেছিলেন।

ফারুক লিবিয়ায় বসবাস করছিলেন, ১৯৭৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন। তাকে বিনা অনুমতিতে বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের

চেষ্টা করায় আটক করা হয়েছিল। তার কারা জীবন শেষ করার পর ১৯৮০ সালের ১ মার্চ তাকে ময়মনসিংহ কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। ৭ মার্চ ১৯৮০ তিনি পরিবারের সদস্যদের সাথে নিয়ে লিবিয়ায় পাড়ি জমান। তার বোনের স্বামী রশিদও লিবিয়ায় বসবাস করছিলেন।

২ নভেম্বর ১৯৭৫ ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগারে নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দন আহমদ, ম. মনসুর আলী এবং এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামানকে হত্যা করা হয়েছিল। এই চারজনই মুক্তিযুদ্ধকালীন পাঁচ সদস্যের প্রবাসী সরকারের সদস্য ছিলেন এবং মুজিবের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন।

২ নভেম্বরের এই হত্যাকাণ্ডের খবর রেডিওতে প্রচারিত হয় ৪ নভেম্বর হত্যাকারী মেজররা পালিয়ে যাবার পর এবং রাষ্ট্রপতি মোস্তাক তিন জন বিচারককে সদস্য হিসেবে নিয়ে একটি তদন্ত কমিশনকে নিয়োগ দিয়েছেন যারা 'এই ঘটনা' তদন্ত করবেন এবং 'যে পরিস্থিতিতে দুর্বৃত্তরা (মেজররা) পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে' তা খতিয়ে দেখবে।

কিন্তু পাঁচ বছর কেটে যাওয়ার পরও ঐ কমিশন যদি কিছু পেয়ে থাকে তা জানানো হয়নি।

যে কনিষ্ঠ সেনা কর্মকর্তাদের বিভিন্ন কূটনৈতিক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা তাদের যে সমস্ত রাষ্ট্রদূতদের অধীনে কাজ করার কথা তাদের চেয়েও ক্ষমতাধর। তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আতঙ্কের মধ্যে আছেন। এরকম খবর আছে যে তাদের মধ্যে দুজন– লেফটেনেন্ট কর্নেল শরিফুল হক (ডালিম) এবং মেজর হুদা সরকারী দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছেন এবং পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। এই দুজন জিয়াউর রহমানকে উৎখাতের চক্রান্তে জড়িত সেনা কর্মকর্তাদের অন্যতম বলে জানা গেছে।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ ভোরে যে আক্রমণকারী দলটি মুজিবের বাড়িতে হামলা করেছিল হুদা সে দলটির নেতৃত্বদানকারী কর্মকর্তা ছিলেন।

ডালিমই ঢাকা রেডিওতে মুজিবের নিহত হওয়ার ঘোষণা পাঠ করেছিলেন।

হাসিনা এবং তার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া তাদের দুই সন্তানকে নিয়ে দিল্লীতে বসবাস করেন। রেহানা ও তার স্বামী লন্ডনে বাস করেন। তাদের একটি পুত্র আছে : রিদওয়ান মুজিব সিদ্দীক।

হাসিনা খুবই উষ্ণ এবং অতিথিপরায়ণ, কিন্তু তিনি খুব কমই বাইরে বের হন। তার পুত্র সজীব ওয়াজেদ (জয়) এবং কন্যা সায়মা শারমিন (পুতুলি), স্কুলে যাওয়ার সময় বাদে অধিকাংশ সময় তাদের সাধারণ ফ্যাটেই খেলাধুলা করে। অন্য সব বাচ্চাদের মতো তারাও মাঝে মাঝে বালি দিয়ে ঘরবাড়ি বানানোর খেলা খেলে। তবে অন্যদের সাথে তাদের একটু পার্থক্য আছে: তারা সব সময়ই বাড়ির সাথে একটি কবরও তৈরি করে।

কোন এক শীতের সকালে জয় যখন আমাকে প্রথমবার তাদের ফ্ল্যাটের টেরাসে সে যা তৈরি করেছে তা দেখাচ্ছিল তখন আমি তার কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এগুলো কি?' জয় উত্তর দিয়েছিল 'কবর' তখন সে কবরগুলো ঠিকঠাক করছিল।

পুতুলি বলেছিল, 'আমরা তো অনেকজন ছিলাম, কিন্তু সবাই এখন মৃত। ওদের কেন খুন করা হয়েছিল?'

এমন কি আট বছর বয়সী পুতুলির মনেও ঘুরে ফিরে মৃত্যু এসে হানা দেয়।

হাসিনা প্রায়ই বলেন, 'একজন প্রকৃত মুসলিম তার শত্রুকেও ঠিকমতো কবর পাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে না। কিন্তু আমার মা, ভাইয়েরা, ভাইদের স্ত্রীদের এবং অন্যান্য আত্মীয়দের তাদের রক্তাক্ত জামা কাপড় পরিহিত অবস্থাতেই বনানীর কবরস্থানে কবর দেয়া হয়েছিল। অথচ যারা এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছিল তারা দাবি করে যে তারা মুসলিম'

পাঁচ বছরেরও বেশি সময় ছায়ায় বসবাস করার পর, হাসিনা হঠাৎ আবিষ্কার করেন পাদপ্রদীপের আলো এখন তার উপর। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৮১তে হাসিনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি মনোনীত করা হয়। হাসিনা সব সময়ই আশা রাখতেন একদিন তিনি নিজ দেশে ফিরে যেতে পারবেন এবং এই আশাটুকুই তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এবার তার দেশে ফেরার সময় হয়েছিল।

বাংলাদেশে ফেরার দুই দিন আগে ১৫ মে ১৯৮১ তে একটি বিবৃতিতে হাসিনা ভারত সরকার ও সেদেশের জনগণের প্রতি তারা যে সমব্যথিতা ও আতিথেয়তা দেখিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তার বাবার আদর্শ ধরে রাখবেন এবং তার বাবার অসমাপ্ত কাজ এগিয়ে নেবেন। দেশের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম থেকে যে প্রধান আদর্শগুলো উৎসরিত হয়েছিল সেই জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্রের প্রশ্নে কোন আপোষই করা হবে না।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫ যে হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছিল তার দিকে নির্দেশ করে হাসিনা বলেছিলেন :

'আগস্ট ১৫, ১৯৭৫ অল্প সময়ের মধ্যে আমার বাবা, মা, তিন ভাই, দুই ভাইয়ের স্ত্রী এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। ২ নভেম্বর ১৯৭৫ আমার বাবার চারজন ঘনিষ্ঠতম রাজনৈতিক সহযোগীকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করা হয়েছিল। এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডগুলো আমাদের জাতীয় সম্মানের জন্য কলঙ্ক। ন্যায়বিচারের স্বার্থে এবং জাতির আত্মসম্মান রক্ষার্থে এসব আত্মঘোষিত খুনিদের বিচার হওয়া প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত এসব খুনিদের বিচার না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি সত্যিকারের বাঙালীর হৃদয়ে এ ক্ষত থেকে যাবে।

এখনো পর্যন্ত যে এসব হত্যাকাণ্ডের জন্য কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়নি তা মানবতার জন্যই একটি অপমান।

যে সব রাজনৈতিক নেতাকে তাদের প্রতি জনগণের প্রতি ভালোবাসার কারণে আইন সম্মতভাবে ক্ষমতা থেকে সরানো যায় না তাদেরকি হত্যা করার মাধ্যমে সরানো হবে? খুনকে কি রাজনৈতিক জীবনের অংশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে? সভ্য দেশগুলো কি নিজেদের ক্ষয় ক্ষতি না করে এসব আত্মস্বীকৃত খুনিদের আশ্রয় দিতে পারবে? এসব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হবে। সারা বিশ্বের জনমতের প্রতিনিধিত্বকারীদের কাছে আমি আবেদন জানাতে চাই এই প্রশ্নগুলো বিবেচনায় নেয়ার জন্য।'

১৭ মে তারিখে শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাতে সারা ঢাকা শহর কুর্মিটোলা বিমান বন্দরগামী মিছিলের শহরে পরিণত হয়েছিল। দূরের এবং কাছের স্থান থেকে ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে আসা হাজারো মানুষ শেখ হাসিনা কোলকাতা থেকে ঢাকায় পৌছানোর পর তাকে এক অভাবনীয় সংবর্ধনা দিয়েছিল।

যখন শেখ হাসিনাকে বহন কারী ভারতীয় বোয়িং বিমানটি ঢাকায় অবতরণ করে তখন হাজার হাজার মানুষ পুলিশ প্রহরা ভেঙ্গে এগিয়ে গিয়ে বিমানটি ঘিরে ধরেছিল। কিছু আওয়ামী লীগার শেখ হাসিনাকে বিমান থেকে নেমে ট্রাকে উঠতে সহায়তা করেছিলেন।

যখন হাসিনা কথা বলছিলেন তখন চারিদিকে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে 'জয় বাংলা', 'বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ', 'শেখ হাসিনা' এসব স্লোগান হচ্ছিল। তিনি বলেছিলেন তিনি তার বাবার আদর্শ বাস্তবায়নে কাজ করবেন। জনগণের পক্ষ থেকে জবাব আসছিল 'আপনি এগিয়ে যান–আমরা আপনার সাথে আছি।' তার চোখে পানি এসেছিল, জনতার চোখেও পানি ছিল।

এ দৃশ্যগুলোর সাথে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ মুজিবের বিজয়ীর বেশে দেশে ফেরার দৃশ্যগুলোর অনেক মিল ছিল।

হাসিনা একটি খোলা ট্রাকে করে বনানী কবরস্থানে যান, যেখানে তার মা, তিন ভাই, আত্মীয় স্বজনসহ ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এর হত্যাযজ্ঞের অন্যান্য শিকারদের কবর হয়েছিল।

১৮ মে ১৯৮১ হাসিনা তার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরের টুঙ্গিপাড়ার উদ্দেশে লঞ্চযোগে যাত্রা করেন। মুজিবের দেশে ফেরা কন্যাকে সম্ভাষণ জানাতে হাজারো মানুষ নদীর দুধারে ভীড় জমিয়েছিল।

ঢাকায় থাকা অবস্থাতেই হাসিনা অসুস্থ ছিলেন, ১৯ মে বিকেলে টুঙ্গিপাড়ায় পৌছাতে পৌছাতে তার প্রচণ্ড জ্বর আসে। তার বাবার কবরের সামনে 'ফাতেহা' পাঠ করার সময় তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েন।